কিশোর থ্রিলার
তিন গোয়েন্দা
ভলিউম
৭
রকিব হাসান
সেবা
প্রকাশনী

ভলিউম ৭

তিন গোয়েন্দা

৩১, ৩২, ৩৩

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী
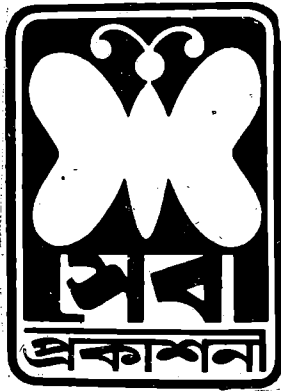
ISBN 984-16-1236-4
প্রকাশক:
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯২
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: আসাদুজ্জামান
মুদ্রাকর:
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগা া প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০
দূরালাপন: ৮৩৪১৮৪
শো-রুম:
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
Volume-7
TIN GOYENDA SERIES
By: Rakib Hassan

সেবা প্রকাশনী

পঁয়ত্রিশ টাকা

তিন গোয়েন্দা
ভলিউম
৭

পুরনো শত্রু
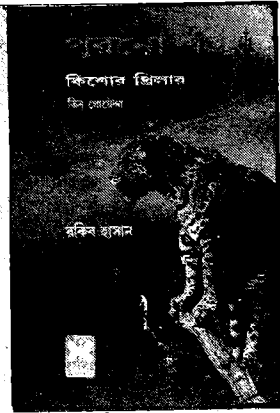
প্রথম প্রকাশঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯

সবে থেমেছে স্যালভিজ ইয়ার্ডের ট্রাকটা, চেঁচিয়ে উঠলো কিশোর পাশা, 'চাচা, দেখো, দেখো!'

বাড়িটা রকি বীচের কাছেই, রেমুডা ক্যানিয়নে। পুরনো মাল কিনতে এসেছেন রাশেদ পাশা। সঙ্গে এসেছে কিশোর আর তার বন্ধু মুসা আমান।

'কী?' অবাক হয়ে তাকালেন রাশেদ পাশা। 'কোথায়?'

'ওই যে, ওই তো বাড়িটার ধারে!'

শেষ গোধূলি, দিনের আলো প্রায় শেষ।

'কই, কি দেখেছিস, কিশোর?'

'খাইছে! আমিও তো কিছু দেখছি না,' মুসা বললো।

চেয়ে রয়েছে কিশোর। কালো মূর্তিটা নেই। চোখের পলকে যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে। নাকি ছিলোই না ওখানে? চোখের ভুল? বিড়বিড় করলো, 'দেখেছি! কালো পোশাক পরা একটা মূর্তি!'

বিরাট কাঠামোর বাড়িটার দিকে তাকালেন রাশেদ পাশা।পাহাড়ী অঞ্চল। গিরিসঙ্কটের দেয়ালের ছায়ায় কেমন নিঃসঙ্গ লাগছে বাড়িটাকে। কাছেই ছোট কটেজ। শান্ত, নীরব।

'ছায়াটায়া দেখেছিস আর কি,' বললেন চাচা।

'আলোছায়ার খেলা,' বললো মুসা।

'আলো কোথায় দেখলে? আমি বলছি, আমি দেখেছি। মনে হলো ওই বাড়ির জানালার ভেতরে ঢুকে গেল।'

দ্বিধা করলেন রাশেদ পাশা। সাধারণতঃ ভুল করে না তাঁর ভাতিজা। বললেন, 'বেশ, চল, বাড়িতে ঢুকেই দেখি। প্রফেসরকে জিজ্ঞেস করলে হয়তো জানা যাবে।'

রাশেদ পাশার পিছু পিছু এগোলো দুই গোয়েন্দা।

অনেক পুরনো বাড়ি। একশো বছর হতে পারে, দু'শো হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। কাঠের টাওয়ার, ছড়ানো কার্নিশ। গাড়িবারান্দার ঢেউখেলানো ছাতটা ধরে রেখেছে মোটা মোটা থাম। আর বিশাল সদর দরজা।

দরজায় ধাক্কা দিলেন রাশেদ পাশা।

সাড়া দিয়ে বেরোলেন লম্বা, রোগাটে একজন মানুষ। প্রৌঢ়, কিন্তু মনে হয় বয়েস আরও বেশি, বৃদ্ধ। চোখের নিচে গভীর ছায়া। এই জুলাই মাসের গরমেও টুইডের একটা জ্যাকেট পরে রয়েছেন, কতোকাল ধোয়া হয়নি কে জানে, দোমড়ানো। হাতে বিদেশী ভাষায় লেখা মোটা এক বই।

'প্রফেসর হোফার?' জিজ্ঞেস করলেন রাশেদ পাশা।

হাসলেন প্রফেসর। 'আপনি নিশ্চয়ই রাশেদ পাশা? আসুন আসুন…'

বাধা দিয়ে বললেন রাশেদ পাশা, 'প্রফেসর সাহেব, এ-আমার ভাতিজা। একটু আগে নাকি কালো পোশাক পরা একটা লোককে আপনার জানালা দিয়ে ঢুকতে দেখেছে।'

'আমার বাড়িতে?' চোখ মিটমিট করলেন প্রফেসর। 'নিশ্চয় ভুল করেছো।'

'না, স্যার,' জবাব দিলো কিশোর। 'আমি শিওর। দামী কোনো জিনিস আছে আপনার বাড়িতে? চোরে চুরি করবে, এমন কিছু?'

'নাহ্। কিচ্ছু নেই।…তবু তুমি যখন বলছো…ওহ্হো, বুঝেছি, আমার ছেলে রিকি। কালো কাউবয় পোশাক আছে তার। আর কতোবার বুঝিয়েছি, জানালা দিয়ে ঢোকার চেয়ে দরজা দিয়ে ঢোকা অনেক ভালো।' প্রফেসর হাসলেন।

মাথা ঝাঁকালেন রাশেদ পাশা। 'তাই বলুন।'

'আপনার ছেলের বয়েস কতো, স্যার?' জানতে চাইলো কিশোর।

'কতো আর, এই তোমাদের মতোই। তোমার মতোই লম্বা।'

'আমি যাকে দেখেছি, সে আরও লম্বা।'

'তাই?' সংশয় দেখা দিলো প্রফেসরের চোখে। 'বেশ, এসো, দেখি কোথায় লুকিয়ে আছে তোমার চোর।'

বিরাট বাড়িটার নিচতলার ঘরগুলো ঘুরিয়ে দেখালেন প্রফেসর। বেশির ভাগই খালি, বন্ধ করে রাখা হয়েছে। 'করি ভাষা নিয়ে গবেষণা,' বিষণ্ন শোনালো তাঁর কণ্ঠ। 'টাকা নেই। এতো বড় বাড়ি আর রাখার ক্ষমতা নেই আমার।' এক মুহূর্ত থেমে বললেন, 'বাপ-দাদারা ছিলো জাহাজী, ক্যাপ্টেন। ভালো টাকা আয় করতো। কতো যে জিনিস আনতো পুব-দেশ থেকে। তারাই বানিয়েছে এই বাড়ি, টিকিয়ে রেখেছে অনেক দিন। নাবিক হলে হয়তো আমিও পারতাম। হইনি। এখন এখানে থাকি শুধু আমি আর আমার ছেলে। এক চাচাতো ভাই ছিলো আমার,

সে-ও অনেকদিন হলো এ-বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। এতো বড় বাড়িতে থাকার লোক কোথায়? বন্ধই করে রাখি ঘরগুলো। কটেজটা যে দেখলেন, কেয়ারটেকার থাকতো আগে। এখন ওটা ভাড়া দিয়েই সংসারের খরচ চালাই।'

নিচতলায় চোরকে পাওয়া গেল না। ওপর তলায় উঠলো সবাই। ওপরেও নিচের মতোই অবস্থা।

ভালোমতো ঘরগুলো দেখে কিশোর স্বীকার করলো, 'না, চুরি করার মতো কিছু নেই।'

'হতাশ মনে হচ্ছে তোমাকে?' বললেন প্রফেসর।

'হবেই,' বললো মুসা। 'ভেবেছিলো কি জানি একটা রহস্য পেয়ে গেছে। পায়নি তো, তাই।'

'আপনার ছেলেকে দেখছি না?' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো কিশোর। 'কাউকে দেখেছি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আচ্ছা, পুরনো জিনিস বিক্রি করবেন বলে ডেকেছেন আমাদের। তার মধ্যে মূল্যবান কিছু নেই তো?'

'থাকলে তো খুশিই হতাম। আছে শুধু বুড়ো ডেনবারের কিছু পুরনো জিনিস। কটেজে থাকতো। কয়েক মাস আগে মারা গেছে। থাকার মধ্যে আছে গোটা দুই সুটকেস, আর কয়েকটা ছবি, তার আঁকা। লোকটার বোধহয় দুনিয়ায় কেউ ছিলো না, অনেকটা সন্ন্যাসীর মতোই থাকতো। টাকাপয়সা ছিলো না। শেষ ক'মাসের ভাড়াও মিটিয়ে যেতে পারেনি। সে-জন্যেই তার জিনিস বিক্রি করতে চাইছি, ক'টা ডলারও যদি আসে মন্দ কি?'

'সন্ন্যাসীদের কাছে অনেক সময় মূল্যবান জিনিস থাকে,' বললো কিশোর।

'কি ব্যাপার, গোয়েন্দার মতো কথা বলছো?'

'গোয়েন্দাই তো আমরা,' মুসা বললো। 'কিশোর, দেখাও না।'

পকেট থেকে তিন গোয়েন্দার কার্ড বের করে দিলো কিশোর।

'হুঁম্,' মাথা দোলালেন প্রফেসর। 'কিন্তু এখানে তদন্ত করার কিছু পাবে না। যা দেখেছো, ওটা ছায়া ছাড়া কিছু না।'

ঠিক এই সময় চিৎকার শোনা গেল, 'চোর! চোর! বাবা, জলদি এসো!'

স্থির হয়ে গেল সবাই। কান পেতে শুনলেন প্রফেসর। 'আরে, রিকি!' সিঁড়ির দিকে দৌড় দিলেন তিনি। পেছনে ছুটলো অন্য তিনজন।

'বাবা, তাড়াতাড়ি!' আবার শোনা গেল চিৎকার, বাঁয়ে কটেজের দিক থেকে।

দুই

লন মাড়িয়ে ছুটলেন প্রফেসর হোফার। ঠিক পেছনেই রাশেদ পাশা আর মুসা। তাদের পেছনে কিশোর।

কটেজের সামনের ছোট ছাউনির নিচে পৌঁছলো ওরা। এক ধাক্কায় দরজা খুলে ছোট একটা লিভিংরুমে ঢুকলেন প্রফেসর। হাঁপাচ্ছেন। চেঁচিয়ে ডাকলেন, 'রিকবার!…রিকি!'

'এই যে এখানে, বাবা,' জবাব এলো কটেজের খুদে বেডরুম থেকে।

প্রফেসর ঢুকলেন। পেছনে ঢুকলেন রাশেদ পাশা আর মুসা। লিভিংরুমের মতোই এ-ঘরেও আসবাব তেমন নেই। একটা সিঙ্গল খাট, একটা চেয়ার, আর একটা ভারি টেবিল—উল্টে পড়ে আছে। টেবিলের ওপাশে দাঁড়িয়ে গায়ের ধুলো ঝাড়ছে একটা ছেলে। রোগা টিনটিনে শরীর।

তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন প্রফেসর।

'আমি ঠিকই আছি, বাবা,' বললো রিকি। 'নড়াচড়ার শব্দ শুনে ঢুকে দেখি কালো পোশাক আর কালো মুখোশ পরা একটা লোক। আমি চেঁচিয়ে উঠতেই টেবিলটা উল্টে আমার গায়ের ওপর ফেললো। ধাক্কা লেগে মাটিতে পড়ে গেলাম। এই সুযোগে পেছনের দরজা দিয়ে পালালো ব্যাটা।'

'কিশোরের কথাই ঠিক!' বলে উঠলো মুসা। 'তবে একটা ভুল করেছো। লোকটাকে ঢুকতে নয়, বেরোতে…আরি, কিশোর গেল কই?'

ফিরে এসে লিভিংরুমে ঢুকলো মুসা। ওখানেও নেই কিশোর। গেল কোথায়?

'কিশোর?' চিৎকার করে ডাকলেন রাশেদ পাশা।

'আমাদের পেছনেই তো ছিলো,' ঢোক গিললো মুসা।

ছেলের দিকে তাকালেন প্রফেসর। 'লোকটার হাতে কিছু ছিলো? ছুরি, পিস্তল…'

'দেখিনি।'

হঠাৎ আরেকটা তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল কটেজের পেছন দিক থেকে।

পাক খেয়ে ঘুরলেন প্রফেসর। 'নালার ওদিক থেকে! হয়তো কেউ পড়ে গেছে!'

'নালাটা কি খুব গভীর?' শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন রাশেদ পাশা।

'মোটামুটি। পড়লে হাত-পা ভাঙতে পারে। আসুন আমার সঙ্গে।'

ওদেরকে কটেজের পেছনে নিয়ে এলেন প্রফেসর। ছোট ঝোপঝাড়, মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ। ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটলো ওরা। নালাটার প্রান্তে এসে থমকে দাঁড়ালো। দশ ফুট মতো গভীর নালাটার দুই মাথা, বাঁক নিয়ে চোখের আড়াল হয়ে গেছে। নিচে আলগা পাথরের ছড়াছড়ি, হালকা গাছপালাও আছে।

কিশোরের চিহ্নও নেই।

'দেখুন!' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা।

নিচে, ডানের কয়েকটা পাথরের ওপর কালচেমতো কি যেন লেগে রয়েছে। আলো নেই। ওপর থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

প্রায় খাড়া ঢাল বেয়ে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে নামলো ওরা।

হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখলো মুসা। ভেজা। 'রক্ত!' আঁতকে উঠলো সে।

কালো মূর্তিটা আবার চোখে পড়লো কিশোরের। কটেজের পেছন থেকে বেরিয়ে জঙ্গলের দিকে ছুটে যাচ্ছে।

কিশোর বুঝলো, লোকটাকে সে একাই দেখেছে। অন্যেরা ঢুকে গেছে কটেজে। তাদেরকে ডেকে বের করে আনতে সময় লাগবে, ততোক্ষণে বনে ঢুকে হারিয়ে যাবে লোকটা। এক মুহূর্ত দ্বিধা করলো গোয়েন্দাপ্রধান, তারপর মোড় নিয়ে ধাওয়া করলো মূর্তিটাকে।

কিন্তু তা-ও দেরি হয়ে গেল। লোকটার চেহারা দেখতে পেলো না সে, তার আগেই ঢুকে গেল জঙ্গলে। ঝোপ মাড়ানোর শব্দ কানে আসছে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই কি যেন গড়িয়ে পড়তে লাগলো, ধ্যাপ করে পাথরের ওপর পড়লো ভারি কিছু। যেন একটা বস্তা পড়েছে। পরক্ষণেই শোনা গেল তীক্ষ্ণ চিৎকার।

নালাটার কিনারে এসে দাঁড়ালো কিশোর। নিচে উঁকি দিলো। কোনোমতে উঠে দাঁড়িয়েছে কালো মূর্তিটা। খোঁড়াতে খোঁড়াতে দৌড় দিলো ডান দিকে, বাঁ পায়ে চোট লেগেছে। হারিয়ে গেল মোড়ের ওপাশে।

বসে পড়লো কিশোর। পার্কের স্লীপারে বাচ্চারা যেমন করে স্লীপ করে, তেমনিভাবে পিছলে নামলো নালায়। পাথরে রক্ত দেখতে পেলো। এগিয়ে গেছে রক্তের দাগ। সাবধানে চিহ্ন ধরে ধরে এগোলো সে। বৃষ্টির সময় পাহাড় থেকে নেমে আসা পানির তীব্র স্রোতের কারণে সৃষ্টি হয়েছে এই নালা। পানি গিয়ে পড়ে ডানের একটা গর্তে, তৈরি করেছে একটা ছোট গিরিখাত, ঘন ঝোপঝাড়ে ভরা। ওটার মধ্যে কেউ লুকিয়ে বসে থাকলে ওপর থেকে দেখা যাবে না।

কিশোর ভাবলো লোকটা ওটার ভেতরেই লুকিয়েছে।

ভুল করেছে। সামনে দড়াম করে বন্ধ হলো একটা গাড়ির দরজা। এঞ্জিন গর্জে উঠলো।

ছুটতে শুরু করলো কিশোর। গিরিখাতের পাশ দিয়ে সরু পথ, সেটা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যায় মেইন রোডে।

কিশোর যখন রাস্তার ধারে পৌঁছুলো, গাড়িটা তখন আঁকাবাঁকা পথটার একটা মোড়ের কাছে চলে গেছে। হারিয়ে গেল লাল টেললাইট। শহরের দিকে চলে গেল।

রক্তের দিকে চেয়ে রয়েছে মুসা, চোখে আতঙ্ক। কানে এলো পদশব্দ, কে যেন আসছে।

রাশেদ পাশাও শুনতে পাচ্ছেন। 'মুসা, শুয়ে পড়ো, জলদি! সবাই...'

ছায়ায় লুকিয়ে পড়তে যাবে ওরা, এই সময় দেখতে পেলো, মোড়ের ওপাশ থেকে বেরিয়ে আসছে কিশোর।

'কিশোর?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো মুসা, 'কি হয়েছে?'

'ব্যাটাকে তাড়া করেছিলাম। ধরতে পারলাম না। পালালো।'

'কাজটা ভালো করোনি!' গম্ভীর হয়ে বললেন রাশেদ পাশা। 'ছুরিটুরি যদি মেরে বসতো?'

'ধরতে যাইনি ওকে, চাচা। চেহারা দেখার চেষ্টা করেছি। অন্ধকারে পারলাম না। গাড়ি নিয়ে এসেছিলো, পালালো।'

আনমনে মাথা নাড়লেন প্রফেসর। 'বুঝতে পারছি না, কি নিতে এসেছিলো! আমার মনে হয়, ভুল করেছে। আশপাশে বড়লোকের বাড়ি আছে, আমাকেও বড় লোক মনে করেছে আরকি। তাই ঢুকে পড়েছে।...চলুন, মিস্টার পাশা, কাজ শেষ করি।'

কটেজে ফিরে এলো ওরা।

সুইচ টিপে আলো জ্বাললেন প্রফেসর। বেডরুমের দেয়াল-আলমারি থেকে বের করলেন চামড়ার দুটো পুরনো সুটকেস। একটার ভেতরে শুধু কাপড়-চোপড়—পুরনো ফ্যাশনের একটা ড্রেস সুট, ধূসর রঙের একটা ফ্লানেল কাপড়ের সুট, কয়েকটা শার্ট, টাই, আর কয়েক জোড়া মোজা। আরেকটা সুটকেসে রয়েছে ছবি আঁকার কিছু রঙ, স্টাফ করা একটা পেঁচা, গ্রীক পুরাণের দেবি ভেনাসের ছোট একটা মূর্তি, বড় একটা বিনকিউলার, আর এক বাক্স রূপার ছুরি, কাঁটাচামচ, চামচ।

'সারাক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকতো ডেনবার,' বললেন প্রফেসর। 'পুরনো একটা

প্যান্ট আর শার্ট ছাড়া আর কিছুই পরতো না। তবে লোকটা শিক্ষিত ছিলো। আর খাওয়ার সময় এই ছুরি-চামচ ব্যবহার করতো। সাত মাস ছিলো এখানে। লনে একটা ক্যানভাসের চেয়ারে বসে থাকতো, আর ছবি আঁকতো, সর্বক্ষণ। রাতেও। বুঝলেন কিছু?'

ঘরের কোণ থেকে ক্যানভাসের আবরণ সরিয়ে বিশটা ছবি বের করে আনলেন প্রফেসর। এই কটেজ আর তার আশপাশের এলাকার দৃশ্য আঁকা হয়েছে। কোনোটা খুব কাছে থেকে-ক্লোজআপ, আর কোনোটা এতো দূরে, ঘরটা ভালোমতো বোঝাই যায় না।

'মন্দ না,' একবার দেখেই নজর ফেরালেন রাশেদ পাশা। সুটকেস দুটো, বিশেষ করে রূপার জিনিসগুলো দেখে চোখ চকচক করছে তাঁর। ঠিকমতো দরদাম করে কিনতে পারলে পুরনো জিনিসে বেশ ভালো লাভ। তবে কাউকে ঠকাতে চান না তিনি, ন্যায্য দাম দেন। 'এগুলো বিক্রি করবেন?'

'হ্যাঁ। মৃত্যুর আগে আমাকে একটা ঠিকানা দিয়ে বললো ডেনবার, ওখানে চিঠি লিখলেই আমার পাওনা টাকা পেয়ে যাবো। লিখেছি, ভাড়া বাকি আছে সে-কথাও জানিয়েছি, কোনো জবাব আসেনি। কেউ খোঁজ নিতেও আসেনি। আর কতো অপেক্ষা করবো? আমার টাকার খুব দরকার?'

দাম নিয়ে দর কষাকষি শুরু করলেন রাশেদ পাশা আর প্রফেসর।

রিগ ডেনবারের জিনিসগুলো দেখতে চাইলো কিশোর। একটাও দামী জিনিস নেই, যার জন্যে গাড়িওয়ালা চোর আসতে পারে।

'রিকি,' জিজ্ঞেস করলো গোয়েন্দাপ্রধান। 'মিস্টার ডেনবারের কি হয়েছিলো?

'অসুখ হয়েছিলো,' জানালো রিকি। 'ভীষণ জ্বর উঠলো। প্রলাপ বকতো, খালি ক্যানভাস আর আঁকাবাঁকা রেখা, না পথ, কি কি সব বলতো। ওর দেখাশোনা তখন আমিই করতাম। শেষে অসুখ এতো বেড়ে গেল, ডাক্তারকে খবর না দিয়ে আর পারলাম না। ডাক্তার আসার আগেই মারা গেল বেচারা। বয়েস হয়েছিলো, হাসপাতালে নিয়ে গেলেও বোধহয় বাঁচতো না।'

'চোরটা ভুলই করেছে, কি বলো, কিশোর?' মুসা বললো। 'দামী কিছুই নেই এখানে।'

আস্তে মাথা ঝোঁকালো শুধু কিশোর।

রিগ ডেনবারের জিনিসগুলো কিনে নিয়ে ট্রাকে তোলা হলো। পাহাড়ী পথ ধরে ছুটে চললো গাড়ি। একটা গিরিপথের ভেতর থেকে বেরোতেই বিড়বিড় করলো কিশোর, 'চোরেরা সাধারণতঃ ভুল করে না,' ঘনঘন নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে সে।

'কি চুরি করতে এসেছিলো সে, কোনোদিনই জানতে পারবো না আমরা,' বললো মুসা।

'তাই তো দেখছি,' দীর্ঘশ্বাস ফেললো কিশোর।

তিন

ওই ঘটনার এক হপ্তা পর, এক বিকেলে পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে কাজে ব্যস্ত দুই গোয়েন্দা। রবিনই প্রথমে গাড়িটা ঢুকতে দেখলো। হলুদ রঙের একটা মার্সিডিজ গিয়ে থামলো অফিসের সামনে।

চকচকে গাড়িটা থেকে বেরিয়ে এলো মার্জিত পোশাক পরা মাঝারি উচ্চতার একজন মানুষ। বিকেলের রোদে তার ধূসর চুল রূপালি দেখাচ্ছে। পরনে শাদা সামার সুট, সিল্কের নীল শার্ট। হাতে সরু কালো একটা বেত, আর একটা কি যেন ঝিক করে উঠলো। এক মুহূর্ত দেখলো ছেলেদের, তারপর ঘুরে রওনা হলো অফিসের দিকে।

চেয়ে রয়েছে ছেলেরা। হঠাৎ বলে উঠলো কিশোর, 'ওহ্‌হো, ভুলেই গিয়েছিলাম, চাচা-চাচী কেউ নেই অফিসে। চলো, চলো।'

গাড়িটার কাছাকাছি এসেছে, এই সময় খুলে গেল পেছনের দরজা। বেরিয়ে এলেন এক লম্বা মহিলা। নীলচে-ধূসর চুল। শাদা সিল্কের পোশাক পরনে। তাতে লাগানো একটা হীরার ব্রোচ। রাজকীয় ভঙ্গিতে তাকালেন ছেলেদের দিকে। 'মিস্টার রাশেদ পাশা আছেন?'

'না, ম্যাডাম,' জবাব দিলো কিশোর। 'উনি আমার চাচা। ইয়ার্ডের ভার আমার ওপর দিয়ে গেছেন।'

'তাই? বয়েস তো বেশি লাগছে না। কাস্টোমার সামলাতে পারো?'

'পারি।'

'গুড,' হাসলেন মহিলা। 'কনফিডেন্স থাকা ভালো।'

'আসলে,' হেসে বললো রবিন। 'পাঁচটার পরে কাস্টোমার বেশি আসেই না।'

আবার হাসলেন মহিলা। 'আমি একজন কাস্টোমার। আর ওই যে অফিসে ঢুকলো, ও আমার এস্টেট ম্যানেজার, ফ্রেড ব্রাউন। চলো ওখানে।'

ডেস্কের ওপর ঝুঁকে কি দেখছিলো লোকটা, ছেলেদের ঢুকতে দেখে চট করে সরে গেল। তবে ইতিমধ্যেই দেখে ফেলেছে কিশোর। ইয়ার্ডের পার্চেজ বুকটা ঘাঁটছিলো ম্যানেজার।

'ফ্রেড,' মহিলা বললেন। 'এরাই এখন দায়িত্বে আছে।'

'ও,' ছেলেদের দিকে চেয়ে মাথা সামান্য নোয়ালো ম্যানেজার। ওরা দেখলো, ঝিক করে উঠেছিলো যে জিনিসটা, ওটা বেতের রূপার হাতল—মুঠো করে ধরার জন্যে। 'তাহলে তোমাদেরকেই বলি। প্রফেসর হোফারের কাছ থেকে কিছু জিনিস কিনে এনেছো তোমরা, মিস্টার রিগ ডেনবারের জিনিস। ওগুলো ফেরত চাইছেন আমাদের কাউন্টেস,' মহিলাকে দেখালো সে। 'দাম অবশ্যই দেবো। যা দিয়ে কিনেছো, তার ডাবল।'

'দামী কিছু আছে নাকি ওগুলোর মধ্যে?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'দামী? তা তো আছেই। যতো ফালতু জিনিসই হোক না কেন, মৃত ভাইয়ের জিনিস, বোনের কাছে তার দাম অসাধারণ। ও হ্যাঁ, কাউন্টেস মিস্টার ডেনবারের বোন।'

ভুরু কোঁচকালো রবিন। 'আপনি সত্যি কাউন্টেস?'

'আমার মরহুম স্বামী কাউন্ট ছিলেন,' হেসে বললেন মহিলা। 'আর ডেনবার আমার বড় ভাই, বিশ বছরের বড়। আমাদের মধ্যে মিল ছিলো না খুব একটা। তাছাড়া ভাই ছিলো একটু অন্য রকম, খামখেয়ালী, শামুকের মতো কেমন যেন গুটিয়ে রাখতো নিজেকে। এই দেখো না, অসুখে ভুগে বিনা চিকিৎসায় মারা গেল, একবার জানালো না পর্যন্ত আমাকে।'

'আফ্রিকায় ছিলাম আমরা, বুঝেছো?' কাউন্টেস থামতেই বলে উঠলো তার ম্যানেজার। 'কাউন্টের বাড়িতে পৌঁছলো প্রফেসরের চিঠি, সেখান থেকে পাঠিয়ে দেয়া হলো আফ্রিকায়। সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম। তা-ও দেরি হয়ে গেল। এসে দেখি, বেচারা মানুষটার শেষ স্মৃতিগুলোও বিক্রি করে দিয়েছেন প্রফেসর। ওগুলো ফেরত পেলে খুবই খুশি হবেন কাউন্টেস।'

'বসুন, নিয়ে আসছি,' রবিনকে নিয়ে বেরিয়ে এলো কিশোর।

একধারে কাজ করছে ইয়ার্ডের কর্মচারী দুই ব্যাভারিয়ান ভাই বোরিস আর রোভার। জিনিসগুলো খুঁজে না পেয়ে, কোথায় রাখা হয়েছে—ওদেরকে জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

কয়েক মিনিট পর অফিসে ফিরে এলো দুই গোয়েন্দা।

'সরি,' বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো কিশোর। 'কাপড়গুলো ছাড়া আর সব বিক্রি হয়ে গেছে।'

'ওগুলো রেখে দাও,' বললো ম্যানেজার। 'আর কিছুই নেই? ছবিগুলোও না?'

'এটাই অদ্ভুত লাগছে আমার কাছে,' বললো কিশোর। 'কতো ভালো ভালো ছবি কিনে এনে ফেলে রাখি, পড়ে থেকে নষ্ট হয়, আর এই ছবিগুলো আনতে না

আনতেই বিক্রি হয়ে গেল!'

'কে নিলো?'

মাথা নাড়লো কিশোর। 'শুধু কেনার রেকর্ড রাখি আমরা, মিস্টার ব্রাউন, বিক্রির রাখি না। লোকে আসে, পছন্দ করে কিনে নিয়ে যায়। পুরনো জিনিস, গ্যারান্টি তো আর দিতে হয় না, তাই রশিদও লাগে না। আমাদের কর্মচারী বোরিস এক লোকের কাছে সবগুলো ছবি বেচে দিয়েছে। কার কাছে, কিছুতেই মনে করতে পারছে না। পারার কথাও নয় অবশ্য।'

'আমার কপালই বোধহয় খারাপ,' হাসি চলে গেছে কাউন্টেসের মুখ থেকে।

'কোনো ভাবেই কি খোঁজ বের করা যাবে না?' জিজ্ঞেস করলো ম্যানেজার।

উজ্জ্বল হলো কিশোরের চোখ। 'চেষ্টা করে দেখতে পারি, যদি…,' দ্বিধা করতে লাগলো সে।

ভ্রূকুটি করলেন মহিলা। 'যদি কি, ইয়াং ম্যান? বলো, বলে ফেলো।'

'যদি আমাদেরকে ভাড়া করেন আপনারা। আমরা গোয়েন্দা। …এই যে, আমাদের কার্ড। পুলিশ চীফের সার্টিফিকেটও আছে আমাদের কাছে, চাইলে দেখাতে পারি।'

আবার হাসি ফুটলো কাউন্টেসের মুখে। 'কিন্তু…'

'কোনো কিন্তু নেই, কাউন্টেস,' বাধা দিয়ে বললো ম্যানেজার। 'আমরা এখানে নতুন। আর ওরা এখানে থাকে, জায়গা-টায়গা চেনে। তাছাড়া গোয়েন্দা। পুলিশ চীফ সার্টিফিকেট দিয়েছে বলছে যখন, নিশ্চয় যোগ্যতা আছে ওদের। খুঁজুক না। খুঁজে বের করতে পারলে তো ভালোই।'

'বেশ,' মাথা কাত করলেন মহিলা। 'তুমি যখন বলছো… ভাইয়ের আঁকা জিনিস, ওগুলো আমার চাই। দেখে তাকে মনে তো করতে পারবো।'

'বের করে দেবো আমরা, ম্যাডাম,' কিশোর বললো।

'পারবে তো?'

'পারবো।'

'গুড। তা কার্ডে তো দেখলাম তিনজনের নাম, আরেকজন কোথায়?'

'নেই এখন। বাড়িতে কাজটাজ করছে হয়তো। ওর নাম মুসা আমান। আমি কিশোর পাশা, আর ও রবিন মিলফোর্ড।'

'ঠিক আছে, ভাড়া করলাম তোমাদেরকে,' বললো ম্যানেজার। 'উপকূলের কাছে সী বীচ মোটেলটা চেনো তো? ওখানেই উঠেছি আমরা। দরকার হলে যোগাযোগ কোরো। এক হপ্তা থাকবো। তারপর ইউরোপে ফিরে যাবো। গুড লাক, বয়েজ।'

গাড়িতে উঠে চলে গেল দু'জনে।

'কিশোর, বলে তো দিলে খুঁজে দেবে, কিন্তু কিভাবে...'

থেমে গেল রবিন। কিশোর চেয়ে রয়েছে গেটের দিকে। ছোট নীল একটা সেডান ইয়ার্ডের বাইরে দাঁড়িয়েছিলো, মার্সিডিজটা বেরোতেই ওটার পিছু নিয়েছে।

'আশ্চর্য!' বললো গোয়েন্দাপ্রধান।

'কী?'

'নিশ্চয় রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলো।'

'অনুসরণ করছে বলছো?'

কিশোর জবাব দেয়ার আগেই দেখা গেল, সাইকেল চালিয়ে গেট দিয়ে ঢুকছে রোগাটে এক কিশোর। মাথায় কালো চুল। প্রফেসর হোফারের ছেলে রিকি।

অফিসের বাইরে বেরোলো দুই গোয়েন্দা।

ওদের দেখেই চেঁচিয়ে উঠলো রিকি, 'এই যে! কাউন্টেস এসেছিলো?'

'হ্যাঁ। এইমাত্র গেল,' জবাব দিলো রবিন।

'ডেনবারের জিনিসগুলো দিয়ে দিয়েছো?'

'না,' বললো কিশোর। 'প্রায় সবই বিক্রি হয়ে গেছে। তবে ওদেরকে কথা দিয়েছি, খুঁজে বের করে দেবো।'

'হুউফ! বাঁচা যাবে তাহলে। বিকেলে আমাদের ওখানে গিয়েছিলো। বাবা বিক্রি করে দিয়েছে শুনে কাউন্টেস যা রাগ করলো না। বাবাকে ধমকাতে শুরু করলো। বললো, চিঠি যখন দিয়েছো, আরও কিছুদিন দেখা উচিত ছিলো। মহিলাকে শান্ত করলো তার ম্যানেজার। বুঝিয়ে বললো, প্রফেসরের জানার কথা নয় যে ডেনবারের এক বোন আছেন। যাই হোক, শান্ত হলো মহিলা। তবে বাবা চিন্তায় পড়ে গেছে। তার ধারণা, জিনিসগুলো না পেলে গোলমাল করবে কাউন্টেস।'

'আচ্ছা, রিকি, ওরা যখন তোমাদের বাড়ি গেল, একটা নীল সেডান দেখেছো?'

'নীল সেডান...?' ভাবলো রিকি। 'হ্যাঁ, দেখেছি। মার্সিডিজটা চলা শুরু করতেই ক্যানিয়ন রোডের মোড় থেকে বেরোলো নীল গাড়িটা। ওরকম গাড়ি ওখানে কারও নেই। প্রতিবেশী যারা আছে, সবার গাড়ি চিনি আমি। থাকেই তো অল্প কয়েকজন। কেন?'

'আমিও দেখলাম গাড়িটা। মার্সিডিজকে ফলো করছে।'

'কাউন্টেসের ওপর নজর রাখছে? মানে স্পাইইং?'

'তাই তো মনে হলো,' চিন্তিত দেখাচ্ছে কিশোরকে। 'প্রথমে একটা রহস্যময় লোক চুরি করে ঢুকলো তোমাদের ঘরে। এখন কাউন্টেসকে ফলো করছে কে জানি। এর কারণ নিশ্চয় রিগ ডেনবারের জিনিসগুলো। কোথায় যেন একটা রহস্য আছে।'

'দামী কিছু ছিলো নাকি ডেনবারের কাছে?' প্রশ্ন করলো রবিন।

'কি জানি, নথি, এখনও বুঝতে পারছি না। আগে ডেনবারের জিনিসগুলো খুঁজে বের করতে হবে, তারপর বুঝতে পারবো।'

'কে কিনেছে?' জিজ্ঞেস করলো রিকি। 'জানো?'

'না।'

'তাহলে,' অবাক হলো রিকি, 'কি করে বের করবে?'

'ভূত-থেকে-ভূতে।'

চার

'ভূত-থেকে-ভূতে!' হাঁ হয়ে গেল রিকি। 'তোমাদের পোষা নাকি? ভূত তাহলে সত্যি আছে?'

'আজকাল অনেক বিজ্ঞানীও বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছেন, ভূত আছে,' বললো কিশোর। 'তবে আমাদের ভূত সেই ভূত নয়।'

'তাহলে কোন্ ভূত?'

'বাচ্চা ছেলেমেয়ের দল,' হেসে বললো রবিন।

তবুও কিছুই বুঝতে পারলো না রিকি।

গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। ফিরে এসেছেন কিশোরের চাচা-চাচী। এবার তার ছুটি। রিকি আর রবিনকে নিয়ে হেডকোয়ার্টারে ঢুকতে চললো।

তিন্ গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টার দেখে দ্বিতীয়বার হাঁ হলো রিকি। আর তৃতীয়বার হলো ভূত-থেকে-ভূতে কি, সেটা জেনে। বললো, 'সব্বোনাশ! কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তো দুনিয়ার সমস্ত ছেলেমেয়ে জেনে যাবে!'

'না, তা জানবে না,' হেসে বললো কিশোর। 'যেতো, যদি ভাষা সমস্যার সমাধান করা যেতো। যদি দুনিয়াময় একটা সাধারণ ভাষা চালু থাকতো। যাই হোক, রকি বীচ আর আশপাশের এলাকার ওরা খুব শীঘ্রি জেনে যাবে।'

'আনুমানিক কতোক্ষণ? রাতে ডিনারের পর লস অ্যাঞ্জেলেসে যাবে বাবা। আমাকেও নিয়ে যাবে। খবর পাওয়া যাবে কখন?'

'সকালের আগে না। ডিনারের পরই বেশির ভাগ ছেলেমেয়ে বাড়ি থাকে।

ফোন শুরু করবে ওরা তখনই। রাতেই জানাজানি হয়ে যাবে। খবর আসতে আসতে সকাল।'

'পুরস্কারের ব্যবস্থা করবো নাকি?' জিজ্ঞেস করলো রবিন।

'তা তো করতেই হবে,' কিশোর বললো। 'আগে বলবো না, কি দেবো। আনুক আগে, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবো।'

রিকি চলে গেল।

প্রথমেই মুসাকে ফোন করলো কিশোর। সব কথা জানালো। বললো, মুসাও যেন তার পাঁচ বন্ধুকে ফোন করে দেয়।

সন্ধ্যা আটটার মধ্যেই রকি বীচের সমস্ত ছেলেমেয়ের জানা হয়ে গেল খবরটা।

পরদিন সকাল ন'টায়, হেডকোয়ার্টারে অপেক্ষা করছে তিন গোয়েন্দা। বার বার তাকাচ্ছে টেলিফোনের দিকে, কখন বেজে ওঠে!

'অনেক আজেবাজে জিনিসের খোঁজ দেবে,' বললো কিশোর। 'তবে আসলগুলোও পাওয়া যেতে পারে।'

দশটা বাজলো।

ফোন বাজলো না।

কিশোরের বিশ্বাসে চিড় ধরতে শুরু করলো। মুসা উসখুস করছে। রবিন স্থির চোখে ফোনের দিকে চেয়ে আছে তো আছেই।

ঠোঁট কামড়ালো গোয়েন্দাপ্রধান। 'এতোক্ষণে ফোন আসা উচিত ছিলো।'

দুই সুড়ঙ্গের ঢাকনায় টোকার শব্দ হলো, চমকে উঠলো তিনজনেই। একে অন্যের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করলো ওরা। শেষে রবিন উঠে গিয়ে ঢাকনার হুক খুলে দিলো। উঠে এলো হোফার।

'তোমরা এখনও এখানে বসে আছো?' ভুরু কুঁচকে বললো সে। 'ওদিকে যে ইয়ার্ড ভরে গেছে…'

'ইয়ার্ড ভরে গেছে!' কিশোর অবাক।

'কেন, জানো না? ওদের আসতে বলোনি?'

'এখানে চলে এসেছে নাকি? সর্বনাশ হয়েছে! কিন্তু ওদের তো ফোন করার কথা…'

'কিশোর,' লজ্জিত কণ্ঠে বললো মুসা, 'আমাদের ফোন নম্বর দিতে ভুলে গেছি। শুধু বলেছি, পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে যেন যোগাযোগ করে।'

'আমিও তাই করেছি,' মুসার কথার প্রতিধ্বনি করলো যেন রবিন।

কিশোরের মুখও লাল হয়ে গেল। পেপারওয়েট সরিয়ে মেসেজটা টেনে নিলো, আগের দিন সন্ধ্যায় যেটা লিখেছিলো। ফোন নম্বর লেখেনি। মেসেজটা দেয়ার সময় রবিন আর মুসাও ভুলটা ধরতে পারেনি।

'ভুল হয়েছে, কি আর করা?' হাত নাড়লো কিশোর। 'চলো, বেরোই।'

'রিকি,' ভয় ফুটেছে মুসার চোখে, 'অফিসে মেরিচাচী আছে?'

'দেখলাম না তো। রাশেদ আংকেলকেও না। শুধু বোরিস আর রোভার।'

'কিশোর,' করুণ হয়ে উঠেছে মুসার চেহারা : 'আমার না গেলে হয় না?'

এমন ভাবে দম নিলো কিশোর, যেন গভীর পানিতে অনেকক্ষণের জন্যে ডুব দেবে। 'চারজনেও সামলাতে পারবো কিনা সন্দেহ আছে। চলো।'

'বাইরে প্রচণ্ড কোলাহল।'

'আল্লাহ্‌রে আল্লাহ্‌!' গুঙিয়ে উঠলো মুসা। 'তুমিই জানো!'

'আরে, এ-তো খালি আসতেই আছে!' চোখ বড় বড় হয়ে গেছে রিকির।

স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর।

রবিন নীরব।

বাচ্চা ছেলেমেয়েতে ভরে গেছে ইয়ার্ডের চত্বর। কেউ দাঁড়িয়ে আছে, কেউ ছুটছে, কেউ কেউ আবার জঞ্জালের ওপর উঠে বসে আছে। চেঁচাচ্ছে সবাই। শ'য়ে শ'য়ে, যেন পিঁপড়ের দল। ওদের মাঝখানে পড়ে যেন হাবুডুবু খাচ্ছে বিশালদেহী দুই ব্যাভারিয়ান। ইয়ার্ডের জিনিস যার যেটা খুশি তুলে নিচ্ছে বাচ্চারা, তাদের হাত থেকে কেড়ে নিতে নিতে ক্লান্ত হয়ে গেছে দুই বেচারা! ছেলেমেয়েরা কেউ এসেছে সাইকেলে, কেউ স্কুটারে। বেশি বয়েসী কিছু ছেলেকেও দেখা গেল, ওরা এসেছে মোটর সাইকেল নিয়ে। গোটা দুই গাড়িও আছে। রঙ মেখে সঙ সাজে যে সার্কাসের ভাঁড়—গাড়িদুটোরও করা হয়েছে ঠিক সেই অবস্থা। আসল রঙ আর চেনার জো নেই এখন।

'কি চাও তোমরা!' আর সহ্য করতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠলো রোভার।

'কে বলেছে আসতে?' চেঁচালো বোরিস।

শুরু হলো তারস্বরে চিৎকার। কারও কথা কিছু বোঝা গেল না। তাড়াতাড়ি কানে আঙুল দিলো দুই ভাই।

হঠাৎ তিন গোয়েন্দার ওপর চোখ পড়লো একটা ছেলের। চেঁচিয়ে বললো, 'ওই তো, ওই যে এসে গেছে!'

এক মুহূর্ত দেরি করলো না আর মুসা। পাঁই করে ঘুরলো, ছুটে পালানোর জন্যে। পারলো না। চোখের পলকে ঘিরে ফেলা হলো তাদেরকে। ধাক্কা খেয়ে

আরেকটু হলেই মাটিতে পড়ে যাচ্ছিলো কিশোর। ফ্যাকাশে হয়ে গেছে চেহারা।

'কিশোর!' ভিড়ের ভেতর থেকে শোনা গেল রবিনের চিৎকার। 'কিছু একটা করো!...ভর্তা করে ফেললো...'

ওদেরকে বাঁচালো রিকি। তাড়াতাড়ি একটা তেলের ড্রামের ওপর উঠে জংলী নাচ জুড়ে দিলো। সেই সঙ্গে বিচিত্র ভাষায় গান। বাচ্চাদের নজর সরে গেল তার দিকে।

এই সুযোগে ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে কয়েকজনকে সরিয়ে কিশোরের কাছে চলে এলো মুসা। বললো, 'জলদি! পুরস্কারের কথা বলো হাতে কিছু ধরিয়ে দিয়ে বিদেয় করতে না পারলে মারা পড়বো।'

'কি...কি দেবো...' এই হৈ-চৈয়ে কিশোরের মাথায়ও কিছু ঢুকছে না। 'একটা পিপার মধ্যে আর্মিদের ব্যাজ আছে অনেকগুলো, অনেক পুরনো। টেক্সাসে লড়াই করেছিলো যারা...'

'জলদি আনো গিয়ে...' বলতে বলতেই কোনোমতে এসে ড্রামের ওপর উঠলো মুসা, রিকির পাশে। হাত তুলে চেঁচিয়ে বললো, 'শোনো তোমরা! এই চুপ! আমার কথা শোনো!' থেমে গেল কোলাহল। 'দারুণ একেকখান ব্যাজ পুরস্কার পাবে। সেই ওল্ড ওয়েস্টের জিনিস। আমি শিওর, তোমাদের কারও কাছে নেই একটাও। ওরকম হট্টগোল করলে কাউকে দেয়া হবে না। এদিকে মুখ করে লাইনে দাঁড়াও। পাঁচ লাইন। যারা সুটকেস এনেছো, তারা এক লাইন করো। পেঁচা আর মূর্তিওয়ালারা আরেক লাইন। বিনকিউলারদের তিন নম্বর লাইন। চার নম্বর লাইনে দাঁড়াবে ছুরি-চামচওয়ালারা। আর শেষ লাইনটা হবে ছবিওয়ালাদের। কোনো হৈ-চৈ নয়, ঠেলাঠেলি নয়। হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে যাও। তারপর আমরা দেখবো, কে কি এনেছো।'

কথা শুনলো ছেলেমেয়েরা। দ্রুত কিভাবে লাইনে দাঁড়াতে হয়, স্কুলের ট্রেনিং আছে। দেখতে দেখতে তৈরি হয়ে গেল পাঁচটা লাইন। এমনকি বেশি বয়েসী ছেলেগুলোও দাঁড়িয়ে গেল সারির পেছনে।

ব্যাজের পিপেটা নিয়ে আসতে বললো কিশোর বোরিসকে।

প্রথম লাইন থেকে শুরু করলো তিন গোয়েন্দা, তাদেরকে সাহায্য করলো রিকি। পিপেটা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রইলো বোরিস আর রোভার।

কে কি এনেছে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো তিন গোয়েন্দা।

যে যা এনেছে, রেখে দিলো, তারপর একটা করে ব্যাজ ধরিয়ে দিলো একেকজনের হাতে।

এক ঘন্টা পর খালি হয়ে গেল ইয়ার্ডের চত্বর। স্টাফ করা পেঁচা, পুরনো

সুটকেস দুটো, আর রূপার চামচ, কাঁটা চামচ, ছুরি, সবই পাওয়া গেল। পাওয়া গেল না শুধু ভেন্যাসের মূর্তিটা আর ছবিগুলো।

'মূর্তিটা কোথায় আছে, একটা মেয়ে বলেছে আমাকে,' রবিন বললো। 'ঠিকানাও বলেছে। এক মহিলার কাছে আছে ওটা। বিক্রি করবে না।'

'তুমি গিয়ে একবার বলে দেখো,' কিশোর বললো। 'বুঝিয়ে বললে হয়তো বিক্রি করতেও পারে।...আর মুসা, তুমি কাউন্টেসকে ফোন করো। বলবে, কোন্‌টা কোন্‌টা পাওয়া গেছে।'

চলে গেল দুই সহকারী গোয়েন্দা।

'আরেকটু হলেই মাথা খারাপ করে দিয়েছিলো,' ঘাসের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়েছে রিকি। 'আরিব্বাপরে, কি কাণ্ড! তবে কাজ হয়েছে। এখন মূর্তিটা আর ছবিগুলো পেলেই...'

'ছবিগুলো মনে হয় শহরের বাইরে চলে গেছে,' বললো কিশোর। 'রকি বীচে থাকলে...' থেমে গেল সে। চকচকে একটা গাড়ি ঢুকছে গেট দিয়ে।

ওদের কাছে এসে ঘ্যাঁচ করে থামলো গাড়িটা।

দরজা খুলে বেরোলো লম্বা, লিকলিকে একটা ছেলে, তাল পাতার সেপাই। কিশোরের দিকে চেয়ে দাঁত বের করে হাসলো, হাতে একটা ছবি।

পাঁচ

'এটাই খুঁজছো, তাই না শার্লক পাশা?' ছবিটা তুলে দেখালো ছেলেটা।

'শুঁটকি!' চেঁচিয়ে উঠলো কিশোর। 'তোমার এখানে কি?'

খিকখিক করে হাসলো তিন গোয়েন্দার পুরনো শত্রু টেরিয়ার ডয়েল, ওরফে শুঁটকি টেরি। 'আমার প্রশ্নের জবাব দাও।'

ছবিটা চিনতে পেরেছে রিকি, মুখ খুলতে যাচ্ছিলো, তার আগেই তাড়াতাড়ি বলে ফেললো কিশোর, 'না, বোধহয় না। কোথায় পেলে এটা, শুঁটকি?'

'সেটা আমার ব্যাপার।'

'কোথায় পেয়েছো, আমাদেরও জানা দরকার,' বললো রিকি। 'বেচতে পারবে কিনা বুঝতে চাই।'

'মানে?' ফ্যাকাশে হয়ে গেল টেরিয়ার।

'আমাদের এখান থেকে কেনোনি...' শুরু করলো কিশোর। শেষ করলো রিকি, 'তারমানে কোনোখান থেকে চুরি করে এনেছো।'

'না!' সরু হয়ে এলো টেরিয়ারের চোখের পাতা। 'যাক বোঝা গেল, এটাই

খুঁজছিলে। আমিও তাই ভেবেছি।'

'হ্যাঁ, এটাই খুঁজছি,' শান্তকণ্ঠে বললো কিশোর। 'কিনতে চাই।'

'কিন্তু আমি তো বেচবো না,' কুৎসিত হাসি হেসে গাড়ির দিকে এগোলো টেরিয়ার।

ওকে থামানোর আগেই গাড়িতে ঢুকে গেল। স্টার্ট নিয়ে বেরিয়ে চলে গেল ইয়ার্ড থেকে।

অফিস থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এলো মুসা। 'শুঁটকির গাড়ি না?'

'হ্যাঁ। ডেনবারের একটা ছবি দেখাতে এসেছিলো,' বললো রিকি।

'জিজ্ঞেস করলাম বেচবে কিনা, রাজি হলো না,' কিশোর জানালো।

'খাইছে! মিস্টার ব্রাউনকে তো আসতে বলে দিলাম। আসছে।'

'আসুক। যা পেয়েছি সেগুলোই নিয়ে যাবে।'

ব্রাউনের আসার অপেক্ষায় রইলো ওরা। ইতিমধ্যে ফিরে এলো রবিন। বললো, 'অনেক চেষ্টা করলাম। মূর্তিটা বেচবেই না মহিলা।'

মার্সিডিজ নিয়ে এলো ফ্রেড ব্রাউন। যা যা পাওয়া গেছে, ওগুলো দেখেই হাসি ছড়িয়ে পড়লো মুখে। 'বাহ্, ভালো ডিটেকটিভ তো তোমরা। এতো তাড়াতাড়ি কাজ করে ফেলেছো।'

'কিন্তু মূর্তিটা আনতে পারিনি,' রবিন বললো। 'মিসেস ওয়াগনার নামে এক মহিলার কাছে আছে, বেচতে রাজি নয়। ঠিকানা, একশো তিন নম্বর রোজাস স্ট্রীট।'

টেরিয়ার ডয়েলের কথা বললো কিশোর। ছবি নিয়ে এসেছিলো, সে-কথাও জানালো।

'ঠিক আছে, ঠিকানা তো পেলাম,' বললো ব্রাউন। 'মিসেস ওযাগনারের সঙ্গে কথা বলে দেখবো। আর ছেলেটার নাম যেন কি বললে…ও, টেরিয়ার ডয়েল। রকি বীচেই থাকে। বড়লোকের ছেলে। এই তো?'

'হ্যাঁ, স্যার,' মাথা ঝাঁকালো মুসা। 'সৈকতের কাছে বিরাট এক বাড়ি আছে।'

'তাহলে, আশা আছে ছবিগুলো জোগাড় করবে তোমরা। কাউন্টেস খুব খুশি হবেন। হাজার হোক, ভাইয়ের শেষ স্মৃতি…। হ্যাঁ, এই জিনিসগুলোর দামটা দিয়ে দিই। আর প্রত্যেকটা জিনিসের জন্যে পাঁচ ডলার করে পুরস্…না না, চার্জই বলি, গোয়েন্দাগিরির ফিস, হলো গিয়ে পঁচিশ ডলার। খুশি তো?'

'হ্যাঁ, খুব খুশি,' দাঁত বের করে হাসলো মুসা।

'বেশ,' ব্রাউনও হাসলো। 'তাহলে ধরে নিচ্ছি ছবিটাও শীঘ্রি পাবো।'

জিনিসগুলোর জন্যে রশিদ লিখে দিলো কিশোর। সবাই মিলে ওগুলো তুলে

দিলো গাড়িতে। ছেলেদের দিকে চেয়ে সামান্য মাথা নুইয়ে, হাতের বেতটা দোলাতে দোলাতে গিয়ে গাড়িতে উঠলো ব্রাউন। চলে গেল।

রিকি বললো, 'আমিও যাই। বাবাকে শান্ত করি গিয়ে।'

লাঞ্চের পর হেডকোয়ার্টারে মিলিত হলো তিন গোয়েন্দা। চিন্তিত দেখাচ্ছে কিশোরকে। বললো, 'শোনো, শুঁটকি ছবিটা বেচার জন্যে আনেনি। আমাদের দেখিয়ে শিওর হয়ে গেল।'

'কেন?' রবিনের প্রশ্ন।

'জানি না। হয়তো, সে জানে অন্য ছবিগুলো কোথায় আছে। একটা ছবি দেখিয়ে শিওর হয়ে গেল। বাকিগুলোও আনবে আমাদের কাছে, একসঙ্গে বিক্রি করতে, চড়া দাম হাঁকবে। কিংবা অন্য কারো কাছে বেচবে। হতে পারে, সেই নীল সেডান গাড়িওয়ালার কাছে।'

'গাড়িটা কার, জানতে পারলে হতো,' বিড়বিড় করলো মুসা।

'সেকথা এখন ভাবছি না,' বললো কিশোর। 'আগে কুড়িটা ছবি খুঁজে বের করা দরকার। আর সেটা করতে হলে শুঁটকির মাধ্যমেই করতে হবে।'

'বেশি টাকার লোভ দেখিয়ে দেখবো নাকি?' পরামর্শ দিলো রবিন।

'ঠিক বলেছো। তাহলেই বেচে দেবে,' মুসারও তা-ই ধারণা।

টেলিফোন লাইনের সঙ্গে লাগানো স্পীকারের সুইচ অন করলো কিশোর। রিসিভার তুলে ডায়াল করলো। শুঁটকিই ধরলো ওপাশ থেকে। তুলেই কড়া গলায় বললো, 'দেখো, শার্লকের বাচ্চা, আমাকে জ্বালিও না। আমি ব্যস্ত।'

'শুঁটকি, শোনো,' শান্ত রইলো কিশোর। 'ডাবল টাকা দেবো তোমাকে। ছবিটা দিয়ে দাও।'

'ছবি? কিসের ছবি?' আকাশ থেকে পড়লো যেন টেরিয়ার, পিত্তি জ্বালানো হাসি হাসলো।

'জানো না কোনটা?' রাগে চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। 'একটু আগে যেটা দেখিয়ে গেছো, পচা শুঁটকি কোথাকার!'

'তাই? দেখিয়ে গেছি নাকি?' হি হি করে হাসলো টেরিয়ার। 'কই, আমার তো মনে পড়ে না। ওহ্হো, বুঝেছি, স্বপ্নে দেখেছো। রাখি, অ্যাঁ? গুড বাই।'

কেটে গেল লাইন।

একে অন্যের দিকে তাকালো তিন গোয়েন্দা।

'শয়তানটার ওপর নজর রাখতে হবে,' মুসা বললো। 'ছায়ার মতো লেগে থাকতে হবে পেছনে।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললো কিশোর। 'ওর গাড়ি আছে, সেকেণ্ড। আর আমাদের আছে শুধু সাইকেল। তবে, চাচার পিকআপটা নিতে পারি, বোরিসকেও ড্রাইভার বানাতে পারি। কিন্তু কোথায় যেতে বলবো? শুঁটকি কোত্থেকে ছবিগুলো এনেছে, তাই তো জানি না।'

'আমাদের হোমারগুলো কাজে লাগাতে পারি,' মনে করিয়ে দিলো রবিন। 'ওর গাড়িতে লাগিয়ে দেবো। তারপর পিছু নেয়া সোজা।'

'তা বটে,' একমত হলো কিশোর। 'চেষ্টা করা যেতে পারে। চলো, ওর বাড়িতে যাই। আরেকবার কথা বলে দেখি, রাজি করানো যায় কিনা। না পারলে...'

'কিশোর! এই কিশোর!' মেরিচাচীর ডাক শোনা গেল।

'খাইছে!' আঁতকে উঠলো মুসা। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে সর্বদর্শনে চোখ রাখলো। স্পষ্ট দেখতে পেলো মেরিচাচীকে। 'সাথে একটা লোক রয়েছে।'

'কে লোকটা?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'জিন্দেগীতে দেখিনি। বেঁটে, মোটা, কালো সুট, মাথায় হ্যাট...আর কিশোর, হাতে একটা ব্যাগের মতো। চ্যাপ্টা, বড়।'

এক লাফে উঠে এসে প্রায় ধাক্কা দিয়ে মুসাকে সরিয়ে পেরিস্কোপে চোখ রাখলো কিশোর। 'হুঁম্‌ম্‌! এরকম কেসেই ছবি রাখে লোকে! জলদি চলো।'

ছয়

'এই যে, এসেছিস,' কিশোরকে দেখে বললেন মেরিচাচী, 'ইনি মিস্টার জন ফেরেনটি। আর্ট ডিলার। হল্যাণ্ড থেকে এসেছেন। তোর সঙ্গে কথা বলতে চান। গত হপ্তায় কতগুলো ছবি কিনে আনলি না, ওগুলো সম্পর্কে।' লোকটার দিকে ফিরলেন। 'আপনারা কথা বলুন। আমি যাই।'

অফিসের দিকে রওনা হয়ে গেলেন মেরিচাচী।

আর্ট ডিলারের কালো চোখের দিকে তাকাতেই ভয় লাগে। 'অ্যামস্টারডাম থেকে এসেছি আমি,' ভোঁতা কণ্ঠস্বর, 'রিগ ডেনবারের সঙ্গে দেখা করতে। এসে শুনলাম মরে গেছে। তারপর শুনলাম, তার ছবিগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে তিন গোয়েন্দা। এখানে তোমরা খুবই পরিচিত, ঠিকানা বের করতে মোটেই অসুবিধে হলো না। ছবিগুলো কিনতে এসেছি। পেয়েছো?'

মাথা নাড়লো মুসা। 'না।'

'একটাও না?' গম্ভীর হয়ে বার দুই পায়চারি করলো ফেরেনটি, তারপর জ্বলন্ত

চোখে তাকালো ছেলেদের দিকে। 'ভালো দাম দেবো।'

'শুঁটকি টেরি একটা ছবি নিয়ে এসেছিলো,' বলে ফেললো রবিন। 'কিন্তু...'

'ওলন্দাজ লোকটার কাঁধের ওপর দিয়ে ইয়ার্ডের গেটের দিকে তাকিয়েছিলো কিশোর, ঝট করে মাথা ফেরালো, 'কিন্তু ওটা আসল না। মানে রিগ ডেনবারের ছবি না।'

'রিগ ডেনবারের নয়?'

'না।'

গোয়েন্দাপ্রধানের দিকে চেয়ে চোখ মিটমিট করছে রবিন আর মুসা। মিথ্যা কথা বলছে কেন? নিশ্চয় কোনো কারণ আছে। চুপ করে রইলো ওরা।

তিনজনের দিকেই একে একে তাকালো জন ফেরেনটি। 'মিছে কথা বলছো না তো?'

'নাহ্,' মাথা নাড়লো কিশোর।

'শুঁটকি টেরি না কি একটা নাম যেন বললে? ঢেঙা, পাতলা ছেলেটা?'

'আপনি চিনলেন কিভাবে?' অবাক হলো মুসা।

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে ফেরেনটি বললো, 'পরিবারটা ধনী, না? আর্ট কালেকশন আছে? ছবি কেনে?'

'কিছু তো বোধহয় আছেই,' রবিন শিওর না।

'আসলে, শুঁটকি টেরিকে আমরা ভালোমতো চিনিই না, স্যার। এখানকার ছেলেরা শুঁটকি শুঁটকি করে তো, তাই আমরাও বলছি। কোথায় থাকে, তা-ও জানি না।' নির্জলা মিথ্যেগুলো এমনভাবে বলে গেল কিশোর, মুসা আর রবিনেরই বিশ্বাস করে ফেলতে ইচ্ছে হলো।

'তারমানে আমাকে সাহায্য করবে না?' কড়া চোখে তাকালো ফেরেনটি।

'করতে পারলে তো খুশিই হতাম, স্যার।'

'হুঁ। বেশ, যদি ছবিগুলো তোমাদের হাতে আসে, আমাকে মোটেলে ফোন করো। প্যারাডাইজ মোটেল। ঠিক আছে? মনে রেখো, ভালো দাম দেবো।'

মাথা ঝোঁকালো কিশোর।

ঘুরে হাঁটতে শুরু করলো ফেরেনটি। অল্প অল্প খোঁড়াচ্ছে! চেয়ে রয়েছে রবিন আর মুসা।

'কিশোর!' লোকটা দূরে সরে গেলে বললো রবিন। 'দেখেছো...'

'হ্যাঁ, আগেই খেয়াল করেছি। পাথরের ওপর পড়ে লেগে থাকতে পারে।'

'ওকেই তাড়া করেছিলাম সেদিন?'

'এজন্যেই মিছে কথা বলেছো?' মুসা বললো।

'হ্যাঁ, সেটা একটা কারণ।'

'আরেকটা?' জানতে চাইলো রবিন।

'ওর গাড়ি। এখনও খেয়াল করোনি?'

জাঙ্কইয়ার্ডের বাইরে গেটের ধারে পার্ক করা ছোট নীল সেডানটাতে উঠছে ফেরেনটি। স্টার্ট নিয়ে চলে গেল।

'কাউন্টেসের গাড়ির পিছু নিয়েছিলো ওটাই!' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা।

'আর আমি কিনা শুঁটকির কথা সব বলে দিলাম! ছবির কথাও!' কপালে হাত রাখলো রবিন।

'না, তেমন কিছু বলোনি,' সান্ত্বনা দিলো কিশোর। 'আমার ধারণা, শুঁটকির ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েই এসেছে ফেরেনটি। কাজেই তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাদের। ওর আগেই গিয়ে শুঁটকিকে ধরতে হবে।'

'দেরি করছি কেন তাহলে? চলো চলো,' তাড়া দিলো মুসা।

'কিন্তু আমি তো এখন যেতে পারছি না,' রবিন বললো। 'বাড়িতে কাজ আছে। মা যেতে বলে দিয়েছে।'

খানিকক্ষণ চিন্তা করে কিশোর বললো, 'যাও। হোমিং ট্র্যান্সমিটার নিয়ে আমরা যাচ্ছি। তোমার কাজ শেষ হলে রিসিভারটা নিয়ে চলে যেও ওখানে। দেরি হবে?'

'না, তা হবে না।'

'বেশ, এসো তাহলে।'

সৈকতের ধারে অনেকগুলো বাড়ি। সরু একটা পথের ধারে রেডউডে তৈরি বিশাল বাড়িটা ডয়েলদের। রাস্তা থেকে সরু একটা গলি বেরিয়ে ওদেরটা, আর আরেকটা বাড়ির মাঝখান দিয়ে চলে গেছে। পথের ধারে, বাড়িগুলোর আশপাশে, সব জায়গায়ই পামের সারি আর হিবিসকাসের ঘন ঝাড়।

বড় একটা ঝাড়ের ধারে সাইকেল থেকে নামলো মুসা আর কিশোর। ওখান থেকে ডয়েলদের বাড়িতে ঢোকার দুটো গেট দেখা যায়—সামনের বড়টা, আর এক পাশের ছোট একটা। গ্যারেজের দরজাও দেখা যায়। টেরিয়ারের স্পোর্টস কারটা ভেতরেই রয়েছে।

'আগে ওর সঙ্গে কথা বলি।' সাইকেল ঠেলে নিয়ে এগোলো কিশোর। পাশে চললো মুসা।

ডাক শুনে দোতলার একটা জানালা খুলে মুখ বের করলো টেরিয়ার। 'আরে, শার্লকের বাচ্চারা যে! তা কি মনে করে?'

'ছবিটা কিনতে এসেছি, শুঁটকি,' বললো মুসা।

হেসে উঠলো টেরিয়ার। কান পাতলো। 'ভালো শুনি না। কি করতে এসেছো? নাচতে?'

'ছবিটা এখনও তোমার কাছেই আছে, শুঁটকি,' কিশোর বললো। 'আমি জানি।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি তো সবই জানো। জলদি বেরোও। নইলে পুলিশকে ফোন করবো। বলবো, চুরি করতে ঢুকেছো।'

গালিটা এসে গিয়েছিলো মুসার মুখে, অনেক কষ্টে সামলে নিলো।

ফিরে চললো দু'জনে। সেই ঘন ঝাড়টার কাছে এসে সাইকেল রেখে লুকিয়ে রইলো।

'সৈকতের ওদিক দিয়ে ঘুরে গিয়ে গ্যারেজে ঢুকবো,' বললো কিশোর। 'ওর গাড়িতে লাগিয়ে দেবো হোমারটা। তুমি চোখ রাখ। শুঁটকিকে বেরোতে দেখলেই শিস দিয়ে হুঁশিয়ার করবে আমাকে।'

'ঠিক আছে।'

ঝোপ থেকে বেরোনোর জন্যে ঘুরেই স্থির হয়ে গেল কিশোর। 'আরি! ওই লোকটা কে?'

মুসাও দেখলো। ডয়েলদের বাড়ির একধারে সরু একটা পথের মোড়ে লোকটা। পরনে ইউনিফর্ম। মাথার ক্যাপটা কপালের ওপর টেনে দেয়া। চোখ আড়াল করতে চাইছে বুঝি। হাতে ভারি একটা ব্যাগ—টুল কিট—ওটার ভারে কাত হয়ে হাঁটছে।

'টেলিফোন মিস্ত্রী,' চেপে রাখা নিঃশ্বাস আস্তে করে ছাড়লো মুসা।

ডয়েলদের বাড়িতে ঢুকে গেল লোকটা।

ভ্রূকুটি করে কিশোর বললো, 'লাগলো তো সেরকমই। কিন্তু...'

'কিন্তু কি?'

'না, কিছু না।' নির্জন, শূন্য পথের দিকে তাকালো কিশোর। 'কোথায় যেন একটা ঘাপলা হচ্ছে, ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'তুমি যাও। আমি কড়া নজর রাখবো।'

মাথা নেড়ে বেরিয়ে এলো কিশোর।

ডয়েল আর তাদের পাশের বাড়ির মাঝখান থেকে গভীর নালা নেমে এসেছে সৈকতে। গরমকালে এখন শুকনো। লুকিয়ে থাকার উপযুক্ত জায়গা। আর এটার ভেতর দিয়ে গ্যারেজে উঠে যাওয়াও সহজ, কারও চোখে পড়বে না।

উঠতে শুরু করলো কিশোর। টেরিয়ারকে কোথাও দেখা গেল না। হোমার ট্র্যান্সমিটারটা শেষবারের মতো চেক করলো সে। শক্তিশালী একটা চুম্বক লাগানো রয়েছে, গাড়ির বডিতে লাগিয়ে দিলে শত ঝাঁকুনিতেও খুলে পড়বে না।

আবার এগোতে শুরু করলো সে। কয়েক পা এগিয়েই দাঁড়িয়ে গেল। টেলিফোনের মিস্ত্রী বাড়ির চারপাশে এক চক্কর ঘুরে এখন এগিয়ে আসছে গ্যারেজের দিকে। তারটা খুঁজে বের করলো, যেখান দিয়ে মূল বাড়িতে ঢুকেছে। যন্ত্রপাতি বের করে ঝুঁকলো ওটার ওপর।

হঠাৎ বুঝে ফেললো কিশোর, গোলমালটা কোথায়। মিস্ত্রী এসেছে, কিন্তু ভ্যান গাড়ি নেই। কে কবে শুনেছে, ভ্যান ছাড়া টেলিফোন মিস্ত্রী কাজ করতে আসে? ব্যাটা ছদ্মবেশী! তারমানে হলো, হয় তার কাটছে, কিংবা তারের সঙ্গে চোরা লাইন লাগাচ্ছে, যাতে সব কথাবার্তা চুরি করে শুনতে পারে। এখান থেকে ভালো দেখা যাচ্ছে না। হেঁটে গেলে লোকটার চোখে পড়ে যেতে পারে, তাই হামাগুড়ি দিয়ে দ্রুত এগোলো কিশোর। কি করছে লোকটা, জানতে হবে।

চলে এলো একেবারে নালার মাথার কাছে। পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে পড়ে থেকে দম নিয়ে আস্তে মাথা তুললো।

চমকে উঠলো ভীষণ ভাবে! মিস্ত্রীর চোখে চোখ পড়ে গেছে। মাত্র ফুটখানেক তফাতে রয়েছে লোকটার মুখ। বুকের ভেতর কাঁপুনি তুলে দেয়া ভীষণ একজোড়া চোখ। কালো। জন ফেরেনটি!

হাতে মস্ত এক ছুরি!

ঝাড়ের ভেতরে ঘাপটি মেরে রয়েছে মুসা। টেরিয়ার কিংবা কিশোর, কারোরই দেখা নেই। রবিনও আসছে না এখনও।

'মুসাআ!'

সৈকতের দিক থেকে শোনা গেল চিৎকারটা।

'মুসাআ! বাঁচাও!'

হুড়মুড় করে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলো মুসা। ঘুরেই দৌড় দিলো শব্দ লক্ষ্য করে। সরু পথ ধরে ছুটে গিয়ে বাড়ির পেছনে মোড় নিতে যাবে, এলো প্রচণ্ড বাধা। খপ করে তার হাত চেপে ধরলো একটা শক্তিশালী থাবা, মুচড়ে নিয়ে গেল পেছনে পিঠের ওপর, আরেকটা হাত চেপে ধরলো তার মুখ। যাতে চিৎকার করতে না পারে। আটকা পড়লো সে-ও।

সাত

ঝাড়ের কাছে সাইকেল দুটো দেখতে পেলো রবিন। কিন্তু মুসা আর কিশোর কোথায়? মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলো, নির্জন পথ। কেউ নেই, কোনো নড়াচড়া নেই।

হঠাৎ একটা গাড়ি স্টার্ট নেয়ার শব্দ হলো ডয়েলদের বাড়ির ধারে। দুটো বাড়ির মাঝের সরু গলি থেকে শাঁ করে বেরিয়ে এলো নীল সেডানটা। তীক্ষ্ণ মোড় নিয়ে রাস্তায় ওঠার সময় কর্কশ আর্তনাদ তুললো টায়ার।

আর্ট ডিলারের গাড়ি! জন ফেরেনটি এখানে কি করছিলো?

বিপ বিপ বিপ বিপ! বেজে উঠলো রবিনের পকেটে রাখা রিসিভার। একটানে বের করে দেখলো কাঁটাটা পথের দিকে নির্দেশ করছে, ধীরে ধীরে কমে আসছে জোরালো বিপ বিপ। কি ঘটেছে, বুঝে ফেললো সে।

হোমারটা টেরিয়ারের গাড়িতে লাগাতে পারেনি কিশোর কিংবা মুসা। ধরা পড়েছে। তাদেরকে বন্দী করে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাচ্ছে ফেরেনটি।

চোখের আড়ালে চলে গেছে নীল গাড়িটা। বোঝার পর আর বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট করলো না রবিন, সাইকেল নিয়ে ছুটলো ওটার পেছনে। চলতে চলতে উঠে এলো উপকূলের প্রধান সড়কে।

বাঁয়ে মোড় নিলো বিপ বিপ। রকি বীচের উত্তর সীমানার দিকে চলেছে নীল সেডান। ইতিমধ্যে দুই বার সংযোগ হারিয়েছে রবিন, তারপর আবার খুঁজে পেয়েছে। প্রাণপণ চেষ্টা করেও সাইকেল নিয়ে পেরে উঠছে না গাড়িটার সাথে, পারার কথাও নয়। বোধহয় ট্রাফিক পোস্টের লাল আলো জ্বলায় থামতে বাধ্য হয়েছিলো ফেরেনটি, সেই সুযোগেই দু'বার কাছে চলে গিয়েছিলো রবিন।

মুহূর্তের জন্যে থামছে না সে, গতি কমাচ্ছে না।

তার পরেও তৃতীয়বার সংযোগ হারালো। নীরব হয়ে গেল রিসিভার।

উত্তেজনা আর পরিশ্রমে দরদর করে ঘামছে রবিন। বুকের খাঁচায় যেন পাগল হয়ে উঠেছে হৃৎপিণ্ডটা। কিন্তু থামলো না সে। দ্রুত প্যাডাল করে এগিয়ে চললো কোস্ট হাইওয়ে ধরে। সামনে পাতলা হয়ে আসছে শহর, খোলা অঞ্চল দেখা যাচ্ছে।

টেলিফোনের তার দিয়ে হাত-পা বেঁধে, মুখে রুমাল গুঁজে মুসা আর রবিনকে গাড়ির বুটে ঢুকিয়ে দিয়েছে ফেরেনটি। হাত বেঁধে ফেলার আগেই সেই সুযোগে হোমারের সুইচটা অন করে দিতে পেরেছে কিশোর। মনে মনে এখন লাথি মারতে

ইচ্ছে করছে নিজেকে, আগে আরও ভালোমতো খেয়াল করেনি বলে। টেরিয়ারদের বাড়িতে ঢোকার সময়ও খুঁড়িয়ে হাঁটছিলো ফেরেনটি। তবে দূর থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছিলো না। ভালো করে লক্ষ্য করলে অবশ্যই বুঝতে পারতো কিশোর। আর তাহলে এখন এই বিপদে পড়তে হতো না।

পথে বার দুই থেমেছে গাড়ি।

তৃতীয়বার থামলো। এঞ্জিন বন্ধ হলো। কিশোর আন্দাজ করলো, মিনিট দশেক পেরিয়েছে।

উঠে গেল বুটের ডালা। টেনে ছেলেদেরকে বুট থেকে বের করলো ফেরেনটি। তারপর একজন একজন করে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে ঢোকালো ছোট মোটেলের শেষ মাথার একটা ঘরে। ইতিমধ্যে ছেলেদের সঙ্গে একটা কথাও বলেনি আর্ট ডিলার।

পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসিয়ে ছেলেদের মুখের রুমাল খুলে দিলো ফেরেনটি। বড় ছুরিটা বের করে হাতে নিয়ে ছেলেদের মুখোমুখি বসলো। চোখের দৃষ্টি ভীষণ। 'তারপর? শুঁটকি টেরিকে চেনো না, না? ও আসল ছবি আনেনি? মিথ্যুক কোথাকার। তোমরা ওই ছবি চুরি করতে গিয়েছিলে।'

'চুরি বলছেন কেন?' গরম হয়ে বললো মুসা। 'ওই ছবির আসল মালিক কাউন্টেস। তাঁর জন্যেই কিনে আনতে গিয়েছিলাম।'

'তাই? কাউন্টেস আর ব্রাউনের হয়ে কাজ করছো তাহলে? কি কি বলেছে ওরা?'

'বলেছে কাউন্টেসের পারিবারিক জিনসগুলো উদ্ধার করতে চায়,' জবাব দিলো কিশোর। 'সবই পেয়েছি আমরা, ছবিগুলো ছাড়া।'

'আবার মিথ্যে কথা। আরও কিছু জানো তোমরা। ব্রাউনের প্ল্যান কি? ওরা আসলে কি খুঁজছে? ওদের কাছে কি মেসেজ পাঠিয়েছিলো রিগ ডেনবার?'

'আমরা শুধু জানি,' মেজাজ দেখিয়ে বললো মুসা। 'আপনি সারাক্ষণ কাউন্টেসকে ফলো করেছেন। হপ্তাখানেক আগে গিয়েছিলেন প্রফেসর এলউড হোফারের বাড়িতে…'

তাড়াতাড়ি মুসাকে থামিয়ে দিয়ে কিশোর বললো, 'কাউন্টেসকে মেসেজ পাঠিয়েছে ডেনবার, একথা কেন মনে হলো আপনার? আর…'

'দেখো, আমাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করো না,' ধমক দিয়ে বললো ফেরেনটি। মুসার দিকে তাকালো। 'এই, তুমি কি বলছিলে? প্রফেসর হোফারের বাড়িতে গিয়েছিলাম?'

ঢোক গিললো মুসা। বুঝতে পেরেছে, কিশোর চায় না, কথাটা ভাঙুক। হপ্তাখানেক আগে রেমুডা ক্যানিয়নে প্রফেসরের বাড়িতে চোর ঢুকেছিলো, একথা

ফেরেনটিকে জানাতে চায় না।

মুসাকে চুপ করে থাকতে দেখে ভয়াল ভঙ্গিতে ছুরিটা নাচালো ওলন্দাজ।

'ইয়ে···মানে,' ছুরিটার দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিলো মুসা, 'কাউন্টেস আর ফ্রেড ব্রাউন যেদিন প্রফেসরের বাড়িতে প্রথম গেছে, আপনিও সেদিন গিয়েছিলেন।'

জ্বলন্ত চোখে ছেলেদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ ফেরেনটি। 'না। সেকথা বলতে চাওনি। কাউন্টেস এখানে আসার আগেই কেউ একজন গিয়েছিলো প্রফেসরের বাড়িতে। তোমাদের ধারণা, সেই লোকটি আমি। কেন?'

চুপ করে রইলো দু'জনেই।

'তারমানে,' আবার বললো ফেরেনটি। 'বলবে না, ডেনবার কি মেসেজ পাঠিয়েছিলো? প্রফেসর হোফার আর তার ছেলের সঙ্গে অনেক কথা বলেছো তোমরা। ওরা কিছু জানায়নি? ওদেরকেও কোনো ইঙ্গিত দিয়ে যায়নি বুড়ো ডেনবার?'

'কিসের ইঙ্গিত, স্যার?' মোলায়েম কণ্ঠে প্রশ্ন করলো কিশোর।

আবার দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো ফেরেনটি। 'বাহ্! আমি ভেবেছিলাম, তোমরা বোকা। কি করছো, জানো না।' উঠে দাঁড়ালো সে। 'দেখে যা মনে হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি চালাক তোমরা। অনেক কিছু জানো, তাই না?'

ভুরু কুঁচকে তাকালো ফেরেনটি। শক্ত করে চেপে ধরলো ছুরির হাতল।

অনিশ্চয়তায় ভুগছে রবিন। এগিয়ে চলেছে কোস্ট রোড ধরে। ভাবছে, গাড়িটা কি খুঁজে পাবে? আরও এগিয়ে যাবে, নাকি কোথাও থেমে পুলিশের চীফ ইয়ান ফ্লেচারকে ফোন করবে?

অনেক ভেবে শেষে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তই নিলো সে।

চলে এলো শহরের উত্তর প্রান্তে। মোটেলগুলো শুরু হয়েছে এখান থেকে। গভীর আগ্রহে কান পেতে রেখেছে, যাতে রিসিভারের সামান্যতম বিপ শব্দও মিস না করে। নীল সেডানটাকে খুঁজছে দুই চোখ।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঘরের ভেতরে পায়চারি করছে ফেরেনটি। ছুরিটা হাতেই রয়েছে। মিনিট দশেক কাটলো। ভাবেসাবে মনে হয়, মনস্থির করতে পারছে না সে।

হঠাৎ ফিরলো। 'তোমাদেরকে কি করি, তোমরাই বলো? আমার কাজে বাধা দিয়েছো, ছেড়ে দিলে আরও দেবে।'

মিনমিন করে জিজ্ঞেস করলো কিশোর, 'রিগ ডেনবারের কাছে কি মূল্যবান কিছু…'

এই সময় বাজলো টেলিফোন। ঝটকা দিয়ে ঘুরলো আর্ট ডিলার। এমনভাবে তাকালো যন্ত্রটার দিকে যেন ওটা একটা বিষাক্ত সাপ। ছেলেদের দিকে একবার ফিরে চেয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল ফোনের কাছে। রিসিভার তুলে কানে ঠেকালো।

'হ্যাঁ হ্যাঁ,' উজ্জ্বল হলো ফেরেনটির চোখ। 'কি? একটা ছেলে?… টেরিয়ার?…হ্যাঁ, চিনি ওকে।…না না, এখানে পাঠানোর দরকার নেই। আমিই অফিসে আসছি।' রিসিভার রেখে ফিরে চাইলো। 'টেরিয়ার ডয়েল—"যাকে তোমরা চেনোই না"—দেখা করতে এসেছে আমার সঙ্গে! কি বুঝলে?'

গোঁ গোঁ করে উঠলো মুসা। 'তখনই বলেছি, শুঁটকি ব্যাটা কোনো তালে আছে!'

'ওকে বিশ্বাস করলে ভুল করবেন, মিস্টার ফেরেনটি,' বললো কিশোর।

'তোমাদেরকেও তো বিশ্বাস করতে পারছি না,' কাটা জবাব দিলো আর্ট ডিলার। আবার ছেলেদের মুখে রুমাল গুঁজে দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

বাঁধন খোলার আপ্রাণ চেষ্টা করলো দুই গোয়েন্দা। অযথা। খোলা তো দূরের কথা, ঢিলই করতে পারলো না, বরং আরও কেটে বসলো তার। হতাশ হয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে দিলো।

হঠাৎ আবার খুলে গেল দরজা।

হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে রবিন!

দ্রুত এসে দু'জনের বাঁধন খুলে দিলো সে। মুখের রুমাল নিজেরাই খুললো ওরা।

'রবিন!' বলে উঠলো মুসা। 'বাঁচালে ভাই। এলে কিভাবে…'

'হোমারটাকে ফলো করলাম কিছুক্ষণ। তারপর সিগন্যাল হারিয়ে গেল। না থেমে এগিয়ে এলাম কোস্ট রোড ধরে। কোনো সাড়া নেই রিসিভারে। প্রায় ফিরেই যাচ্ছিলাম, এই সময় মনে পড়লো, ফেরেনটি বলেছিলো সে প্যারাডাইজ মোটেলে উঠেছে। চলে এলাম।'

'খুব ভালো করেছো,' প্রশংসা করলো কিশোর। 'চলো, ভাগি।'

'কিন্তু শুঁটকি?' মনে করিয়ে দিলো মুসা। 'ওই ব্যাটা এখন মোটেলের অফিসে…'

হেসে উঠলো রবিন। 'শুঁটকি আসবে কোত্থেকে? আমিই মোটেলের রিসিপশনিস্ট সেজে ফোন করেছিলাম। গলাটা ধরতে পারেনি ফেরেনটি। অভিনয়

করা সোজা, তাই না কিশোর?'

'যারা জানে তাদের কাছে সোজাই,' বললো কিশোর। 'বেরোও এখন। সামনের দরজা। কুইক!'

বেরিয়ে এলো ওরা। কাউকে দেখা গেল না। তিনজনেই দৌড় দিলো রবিনের সাইকেলের দিকে।

'মুসা, তুমি চালাও,' বললো কিশোর। 'আমি পেছনে বসছি। রবিন সামনে বসুক। তোমার একটু কষ্ট হবে আরকি...জলদি!'

বড় জোর বিশ গজ এসেছে ওরা, এই সময় পেছনে শোনা গেল উত্তেজিত চিৎকার। যে ঘরটা থেকে বেরিয়ে এসেছে ওরা, ওটার সামনের দরজায় দাঁড়িয়ে জোরে জোরে হাত নাড়ছে ফেরেনটি। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে লাফিয়ে নামলো দরজার নিচে, দৌড় দিলো। বুঝলো, এভাবে খুঁড়িয়ে দৌড়ে পারবে না সাইকেলের সঙ্গে। ঘুরে আবার ছুটলো মোটেলের দিকে।

'গাড়ি আনতে যাচ্ছে!' বললো কিশোর। 'লুকাতে হবে।' আশেপাশে তাকালো সে। কোনো জায়গা দেখলো না।

প্যাডালে পায়ের চাপ আরও বাড়ালো মুসা। ভারি বোঝা নিয়েও শাঁই শাঁই করে ছুটেছে।

'আরে এতো তাড়াহুড়োর দরকার নেই,' বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি রবিন। 'আসতে পারবে না। ওর গাড়ির ইগনিশনের তার একটাও নেই। সব ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি।'

'তুমি আজ যা দেখালে না, নথি,' এতোক্ষণে হাসি ফুটলো কিশোরের মুখে। 'মুসা, গতি কমিও না, চালিয়ে যাও...'

'হুঁ, চালিয়ে যাও,' মুখ ভেঙচালো মুসা। 'এক সাইকেলে তিনজন, বললেই হলো...'

'কি করবো, ভাই? তুমি তো তা-ও পারছো, আমি আর রবিন তো চালাতেই পারবো না।'

কয়েক মিনিট পর হাইওয়েতে একটা খালি ট্রাক থামালো ওরা। ড্রাইভারকে অনুরোধ করতে সে ওদেরকে সাইকেল সহ তুলে নিলো পেছনে।

শহরে ফিরে এলো তিন গোয়েন্দা। টেরিয়ারদের বাড়ির কাছে গিয়ে ঝোপের আড়াল থেকে যার যার সাইকেল বের করে নিলো মুসা আর কিশোর।

স্যালভিজ ইয়ার্ডে ফিরে, খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার হেডকোয়ার্টারে ঢুকলো তিনজনে।

'জটিল এক রহস্য দানা বাঁধছে,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কেটে বললো কিশোর।

'ফেরেনটির ধারণা, মূল্যবান কোনো জিনিস ছিলো ডেনবারের কাছে। কিভাবে পেতে হবে, মেসেজ রেখে গেছে। কাউন্টেস আর ব্রাউনের সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

ফোনে কয়েকবার চেষ্টা করলো কিশোর। কেউ ধরলো না।

'সকালে আবার চেষ্টা করবো,' বললো গোয়েন্দাপ্রধান। 'তবে তার আগে রিগ ডেনবারের সম্পর্কে ভালোমতো খোঁজখবর নেয়া দরকার। লোকটা কে ছিলো, কি করতো···রবিন, কাল সকালে লাইব্রেরিতে বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে দেখো। বলা যায় না, কিছু বেরিয়েও পড়তে পারে!'

আট

তাকের দিকে চেয়েই অবাক হয়ে গেল রবিন। আর্টের ওপর লেখা মোটা মোটা বইগুলো বেশির ভাগই নেই। সরে এলো ওখান থেকে।

ভুরু কোঁচকালেন লাইব্রেরিয়ান মিস হকিনস। 'কি হয়েছে, রবিন?'

'আর্টের রেফারেন্স বইগুলো নেই। কে নিলো?'

'একজন লোক, ছোট পড়ার ঘরটায় নিয়ে গিয়ে পড়ছে। লাইব্রেরি খোলার সঙ্গে সঙ্গে ঢুকেছে। এখনও বেরোয়নি। কালও এসেছিলো। কেন, কোনো বই তোমার দরকার? গিয়ে বলবো দিতে?'

'না, থ্যাংক ইউ। আমিই যাচ্ছি।'

ছোট ঘরটায় ঢুকলো রবিন। পেছন ফিরে বসে আছে লোকটা। টেবিলে একগাদা বই। আরেকটা বইয়ের জন্যে হাত বাড়াতেই মুখটা দেখতে পেলো সে। চমকে উঠলো। প্রফেসর এলউড হোফার!

দ্রুত বেরিয়ে এলো রবিন। ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলেছে মাথায়। আর্টের বই পড়ছেন ভাষাবিদ প্রফেসর! উত্তেজিত হয়ে উঠলো সে। চেয়ার টেনে নিয়ে এমন একটা জায়গায় বসলো, যেখান থেকে দরজা দিয়ে প্রফেসরকে দেখতে পায়। কি পড়ছেন তিনি? ইস্, যদি দেখা যেতো!

অবশেষে উঠলেন প্রফেসর। বেরিয়ে গেলেন। রবিন ভাবলো, তাঁকে অনুসরণ করবে? না, তাতে বিশেষ লাভ হবে না। নিশ্চয় এখন বাড়ি ফিরবেন তিনি। তার চেয়ে যে কাজ করতে এসেছে সে, সেটাই করে যাবে। রেফারেন্স বইতে রিগ ডেনবারের সম্পর্কে কি লেখা আছে, দেখবে।

'প্রফেসর হোফার!'

'হ্যাঁ, কিশোর,' বললো রবিন। 'আর্টের যে ক'টা বই আছে ওখানে, সব ঘেঁটেছেন।'

'খাইছে!' মুসা বললো। 'হঠাৎ করে আর্টের বইয়ের ওপর এই আগ্রহ কেন?'

হেডকোয়ার্টারে আলোচনায় বসেছে তিন গোয়েন্দা।

'আচ্ছা, প্রফেসরের কথা আপাতত থাক,' বললো গোয়েন্দাপ্রধান। 'তো, রেফারেন্স বইতে রিগ ডেনবারের কথা কিছুই লেখা নেই?'

'না, একটা শব্দও না।'

'অন্য কোনো বইতে থাকতে পারে। তবে বোঝা যাচ্ছে, তেমন বিখ্যাত কেউ নয়। তাহলে বড় বড় বই সবগুলোতেই থাকতো।'

'বড়ই যদি না হবে, ওব ছবির জন্যে পাগল হয়ে গেছে কেন জন ফেরেনটি?' মুসার প্রশ্ন।

'এমনও হতে পারে,' রবিন বললো। 'আসলে ছবি খুঁজছে না লোকটা। ছবির ছুতোয় অন্য কিছু খুঁজছে। জিনিসটা কী, হয়তো কাউন্টেস আর তাঁর ম্যানেজারও জানে।'

মাথা ঝোঁকালো কিশোর। 'যুক্তি আছে তোমার কথায়। হয়তো সেই জিনিসটাই সেদিন নিতে এসেছিলো কালো পোশাক পরা লোকটা। আগেই, যাতে আর কেউ পেয়ে না যায়। কিন্তু পায়নি। ডেনবারের জিনিসগুলো আমাদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন প্রফেসর, আমরা বেচে দিয়েছি অন্যের কাছে। সেটার খোঁজ এখনও চালিয়ে যাচ্ছে লোকটা।'

'জন ফেরেনটির মতো,' বলে উঠলো মুসা।

'আমার এখন অবাক লাগছে,' রবিন বললো। 'হঠাৎ করে আর্টের ওপর আগ্রহী হয়ে উঠলেন কেন ল্যাংগোয়েজের প্রফেসর?'

নাক চুলকালো কিশোর। 'বোধহয় মেসেজ। মেসেজের কথা বলেছে ফেরেনটি। হয়তো মৃত্যুর আগে কোনো মেসেজ রেখে গেছে ডেনবার। রিকি বলেছে প্রলাপ বকেছে। সেই প্রলাপের মধ্যেই কোনো মূল্যবান তথ্য দিয়ে গেছে হয়তো লোকটা।'

'এবং সেটা প্রফেসর জানেন, কিন্তু কাউন্টেস নয়?'

'আমার তাই মনে হচ্ছে, নথি। চলো, রেমুডা ক্যানিয়ন থেকে ঘুরে আসি।'

'আমার বাবা!' শুনে রিকিও অবাক। 'বাবা আর্টের বই ঘেঁটেছেন?'

লনের মধ্যে ছায়ায় বসে কথা বলছে চার কিশোর।

'ছবির কথা কি খুব বেশি বলাবলি করতো ডেনবার?' জিজ্ঞেস করলো গোয়েন্দাপ্রধান।

'নাহ্। আমাকে ছবি আঁকা শেখানোর চেষ্টা করেছে। চেষ্টা করেছি, পারিনি। একবার একটা অদ্ভুত কথা বলেছিলো। সে নাকি দুনিয়ার সব চেয়ে দামী পেইন্টার। কিন্তু কেউ জানে না সেকথা। বলেই হেসে উঠেছিলো।'

'এতে কিছু বোঝা যায় না,' মন্তব্য করলো মুসা।

'না, তা যায় না,' কিশোরও একমত।

রিকি বললো, 'কি যে ঘটছে, কিছুই বুঝতে পা ছি না। এতোগুলো মাস একা এখানে থাকলো রিগ ডেনবার, কেউ দেখাও করতে আসেনি তার সঙ্গে। কিন্তু যেই মারা গেল, অমনি একের পর এক আসতে লাগলো, আগ্রহী হয়ে উঠলো কতোজন।...ও হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, এখন ঘরে বাবার সঙ্গে কথা বলছেন কাউন্টেস আর ব্রাউন।'

'আবিষ্কার করে ফেলেছে নাকি কিছু?'

'চলো না, দেখি,' প্রস্তাব দিলো কিশোর।

ম্যানটলপিসে হেলান দিয়ে রয়েছেন প্রফেসর। কাউন্টেস আর তাঁর ম্যানেজারের মুখোমুখি।

ছেলেদের দেখে হাসলেন কাউন্টেস। 'এই যে, গোয়েন্দার দল এসে পড়েছো। কাজ চালিয়ে যাচ্ছো তো?'

'যাচ্ছি, তবে ছবিগুলো এখনও পাইনি, ম্যাডাম,' জবাব দিলো কিশোর। 'আচ্ছা, একটা কথা বলতে পারেন? আপনার ভাই কি কখনও কোনো ছবি কাউকে দেখিয়েছেন? কিংবা বিক্রি করেছেন?'

'না, কে কিনবে তার ছবি? একেবারেই নবিস। তবু, ওর ছবিগুলো আমার চাই। ওই যে বলেছি, ভাইয়ের স্মৃতি। তোমরা তদন্ত চালিয়ে যাও, খুঁজে বের করো ওগুলো।'

'করবো। যদি আমাদের আগেই কেউ হাতিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়।'

'কেউ?' অবাক মনে হলো ম্যানেজারকে।

'জন ফরেনটি নামে এক লোক। আর্ট ডিলার বলে পরিচয় দিয়েছে। আপনাদেরকে অনুসরণ করে। ছবিগুলো চায়।'

নীল গাড়ি নিয়ে কিভাবে পিছে লেগে থাকে ফেরেনটি, ছেলেদেরকে কি করে বন্দি করে নিয়ে গিয়েছিলো, জানালো কিশোর। শুনে শিউরে উঠলেন কাউন্টেস। 'সর্বনাশ! অল্পের জন্যে বেঁচেছো। আরও সাবধানে থাকা উচিত তোমাদের। কিন্তু বুঝতে পারছি না, আমার ভাইয়ের ব্যাপারে তার এতো আগ্রহ কেন। আসলে কি

চায়? ছবি, না অন্য কিছু?'

'কি জানি, হয়তো ছবিই। আজ প্রফেসর সাহেব লাইব্রেরিতে গিয়েছিলেন আর্টের বই ঘাঁটতে।'

সবাই তাকালো প্রফেসরের মুখের দিকে। রিকির চোখে অস্বস্তি। ক্ষণিকের জন্যে জ্বলে উঠলো ম্যানেজারের চোখের তারা। 'সত্যি সত্যি কিছু জানেন আপনি?' মাথা ঝাঁকালো সে, নেচে উঠলো রূপালি চুল।

'না। স্রেফ কৌতূহল। ডেনবারের ব্যাপারে লোকের এই হঠাৎ আগ্রহ আমাকেও ভাবিয়ে তুলেছে। তাই ভাবলাম, দেখিই না গিয়ে, লোকটা বিখ্যাত কেউ ছিলো কিনা। কিছুই পেলাম না। তাতে কৌতূহল আরও বেড়েছে আমার। সেদিন সেই কালো পোশাক পরা লোকটা তাহলে কি খুঁজতে এসেছিলো?'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন কাউন্টেস। 'চোর এসেছিলো? মানে, আমরা এখানে আসার আগেই? নিশ্চয় আমার ভাইয়ের কোনো জিনিস চুরি করতে চেয়েছিলো?'

'আপনারা আসার এক হপ্তা আগে এসেছিলো,' জানালো রবিন। 'কি যে খুঁজতে এসেছিলো সে-ই জানে।'

'আই সী,' বলেই ম্যানেজারের দিকে তাকালেন কাউন্টেস।

'ওই ফেরেনটিটা না তো?' তাড়াতাড়ি বললো ম্যানেজার। 'মিস্টার ডেনবারের জিনিসের ওপর তারই তো বেশি আগ্রহ দেখা যাচ্ছে।'

'নিশ্চয়ই!' বলে উঠলো মুসা।

'স্যার,' প্রফেসরের দিকে চেয়ে বললো কিশোর। 'রিকি, তোমাকেও বলছি। ফেরেনটির ধারণা, মৃত্যুর আগে মিস্টার ডেনবার কোনো মেসেজ রেখে গেছেন। আপনারা বলেছেন, জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকেছেন তিনি। উল্টোপাল্টা কথা বলেছেন। কিছু কি বোঝাতে চেয়েছিলেন?'

ভাবলেন প্রফেসর। তারপর মাথা দোলালেন, 'হতে পারে, কিশোর। অনর্গল কথা বলে চলেছিলো। এখন মনে হচ্ছে, প্রলাপ ছাড়াও বোধহয় আরও কিছু ছিলো তার কথায়। তবে তখন কিছু বুঝিনি, এখনও না। এই যেমন ধরো, বলেছে..."আঁকাবাঁকা" "ভুল", "ক্যানভাস"। "পেইনটিংস" শব্দটা অনেকবার বলেছে। ...আর বলেছে "মাস্টারস"। আমি বেশি যাইনি ওর কাছে, তবে রিকি প্রায় সারাক্ষণই ছিলো। তুমি আর কিছু শুনেছো, রিকি?'

মাথা নাড়লো রিকি। 'ঠিক মনে করতে পারছি না। আসলে প্রলাপই বকেছে। বলেছেঃ ওদের বলো, ওদের বলো...আঁকা...আঁকা যখন বাঁকা...ভুল মনে

হবে···মাস্টার···আমার পেইনটিংস···আমার ক্যানভাস···ক্যানভাস থেকে আঁকা-বাঁকা···বিব্বলো···ভুল। বার বার এইসব কথা বলেছে। একই রকম শব্দ, হেরফের ছিলো না।'

কিছুক্ষণ নীরবতা। সবাই ভাবছে, শব্দগুলোর মানে কি? মুখ দেখেই অনুমান করা যায়, কেউ কিছু বুঝতে পারছে না। এমনকি কিশোরের দৃষ্টিও শূন্য।

'মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না আমি,' বললো ম্যানেজার।

'বোঝার কথাও নয়,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কাউন্টেস। 'প্রলাপের কি আর কোনো অর্থ থাকে?'

'শ্যার,' প্রফেসরকে জিজ্ঞেস করলো কিশোর। 'মিস্টার ডেনবার কি তাঁর সমস্ত জিনিস কটেজেই রাখতেন?'

'আমার তো তা-ই বিশ্বাস।'

মাথা ঝোঁকালো কিশোর। 'হুঁ। আমরা তাহলে যাই। আমার এখনও মনে হয়, ছবিগুলো সব কোথায় আছে টেরিয়ার জানে।'

বার বার ছেলেদেরকে হুঁশিয়ার করলেন কাউন্টেস। তারপর বললেন, 'কোনো সমস্যা হলেই সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবে।'

সায় জানিয়ে বেরিয়ে এলো তিন গোয়েন্দা। সাইকেলে চড়ে বসলো। আগে আগে চলেছে কিশোর। নালার মুখের কাছে এসেই—এখান থেকে প্রফেসরের বাড়িটা দেখা যায় না—মোড় নিলো বাঁয়ে, হঠাৎ। অবাক হলো দুই সহকারী।

'কোথায় যাচ্ছি?' জানতে চাইলো রবিন।

'আমি এখন শিওর, প্রলাপের মাধ্যমে কোনো মেসেজ দিতে চেয়েছিলো ডেনবার,' বললো কিশোর। 'কী, এখনও বুঝতে পারছি না। লোকটা কটেজ থেকে লন, আর লন থেকে কটেজ, এছাড়া আর কোথাও যেতো না। অন্তত যেতে দেখা যায়নি। তাহলে মূল্যবান কিছু যদি থাকেই, ওই কটেজেই রেখে গেছে।'

সাইকেল রেখে নালায় নেমে তার ভেতর দিয়ে এগোলো ওরা। চলে এলো কটেজের পেছনে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। নীরব বাড়িটার আশপাশে কাউকে চোখে পড়লো না। পা টিপে টিপে এসে ভেতরে ঢুকলো ওরা। কোনখান থেকে খোঁজা শুরু করবে, ভাবছে কিশোর, এই সময় বাইরে শোনা গেল পদশব্দ।

'কুইক!' ফিসফিসিয়ে বললো কিশোর। 'লুকাও।'

বেডরুম থেকে দেখলো ওরা, কটেজে ঢুকেছে রিকি। কোনোদিকে খেয়াল নেই, সোজা এগিয়ে গেল লিভিংরুমের এক কোণে। আলগা একটা বোর্ড সরিয়ে, আরও ঝুঁকে হাত ঢুকিয়ে দিলো মেঝের নিচে।

নিঃশব্দে পেছনে এসে দাঁড়ালো তিন গোয়েন্দা।

'তাহলে তুমি জানো, কি লুকিয়েছিলো ডেনবার?' শান্ত কণ্ঠে বললো কিশোর।

নয়

'হুফ্!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো রিকি। 'তোমরা। বুকে কাঁপুনি তুলে দিয়েছো।'

'তোমার হাতে কি?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

দেখালো রিকি। পুরনো আমলের বড় একটা চাবি। প্রশ্ন করলো, 'তোমরা এখানে কি করছো? ভাবছো, এই কটেজেই কিছু লুকিয়েছে ডেনবার?'

'তোমার কি মনে হয়?' পাল্টা প্রশ্ন করলো কিশোর।

'আমারও তা-ই মনে হয়। তোমরা চলে যাওয়ার পর হঠাৎ মনে পড়লো কথাটা, ছুটে চলে এলাম। বাবা এখনও ওই দু'জনের সঙ্গে কথা বলছে।'

'কি মনে পড়লো?' জানতে চাইলো রবিন।

'মাঝে মাঝে অ্যাডোবে যেতো ডেনবার। ক্যানিয়নের ওধারে। ছবিগুলো ওখানেই রাখতো। ঘরটা খালি থাকে, তালা দিয়ে রাখে বাবা, যাতে কেউ ঢুকে নষ্ট করতে না পারে। ঐতিহাসিক মূল্য আছে ওটার। তবে, বুড়ো ডেনবার ঢুকতো, আমিই তাকে চাবি এনে দিয়েছিলাম।'

'এটাই কি সেই চাবি?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'হ্যাঁ। বাবা মেহমানদের সঙ্গে কথা বলছে। তোমরাও চলে গেলে। ভাবলাম, এইই সুযোগ। অ্যাডোবে গিয়ে খুঁজে দেখি।'

'ভালোই হলো। চলো, আমরাও যাই।'

বাইরে বিকেলের রোদ। তিন গোয়েন্দাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো রিকি। পথ থেকে দূরে নালার ধার দিয়ে হাঁটছে ওরা। হোফার হাউসকে দূর দিয়ে ঘিরে এগিয়ে গেছে নালাটা, তারপর হঠাৎ করেই তীক্ষ্ণ মোড় নিয়ে ঢুকে পড়েছে একটা গিরিসঙ্কটে।

কিছুক্ষণ পর বাঁয়ে ঘুরলো রিকি। ঘন ঝোপের ধার দিয়ে চললো। পেছনে তিন গোয়েন্দা।

আরও সামনে ঘন ঝোপঝাড়, মোটা মোটা লতা। ওগুলোর ভেতর দিয়ে পথ করে হাঁটাই মুশকিল। তবে পথ একটা করাই আছে, রিকি সঙ্গে না এলে খুঁজে পেতো না তিন গোয়েন্দা। ঝোপের ভেতর থেকে বেরোতেই দেখা গেল বনের মাঝে একটা খোলা জায়গা। একধারে শক্ত হয়ে আছে কাদার স্তূপ। আরেকধারে একটা ছোট কুঁড়ে। কাঠের নিচু ছাত, খড়খড়ি লাগানো জানালা। রোদে শুকানো

ইঁট দিয়ে তৈরি। নীরব, নিঃসঙ্গ। এটাই অ্যাডোব।

'এই ক্যানিয়নের প্রথম মালিক এক স্প্যানিশ। সে-ই বানিয়েছিলো ওই কুঁড়েটা,' জানালো রিকি। 'দেড়শো বছরেরও বেশি আগে। ভেতরে শুধু একটা ফায়ারপ্লেস আছে। বাথরুমও নেই।'

চাবি দিয়ে তালা খুললো রিকি। মোটা তক্তার পাল্লা, তাতে লোহার পাত লাগানো। পাতের এক মাথা গোল করে চৌকাঠে লাগানো মোটা লোহার বাঁকা শলায় বসিয়ে দেয়া হয়েছে, এই প্রাচীন কব্জার ওপরই খেলে পাল্লাদুটো।

ঠিকই বলেছে রিকি। তিন গোয়েন্দা ঢুকে দেখলো, ভেতরে প্রায় কিছুই নেই। কাঠের মেঝেতে পুরু হয়ে জমেছে ধুলো আর কাঁচা ইঁটের গুঁড়ো। দুটো ঘর। দুটোই ছোট। একটাকে বোধহয় বসার ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হতো, আরেকটা শোবার ঘর—ওটার সংলগ্ন রান্নাঘর। জানালার পাল্লাগুলো বাইরের দিকে খোলে। ফাঁকফোকর দিয়ে চুঁইয়ে ঢুকছে ম্লান আলো। ঘরের ভেতর বেশ ঠাণ্ডা।

'খাইছে!' বলে উঠলো মুসা। 'দেয়াল কি পুরুরে বাবা। তিন ফুটের কম হবে না।'

'অ্যাডোব এভাবেই তৈরি হতো,' রবিন বললো। 'আগুনে-পোড়া ইঁটের মতো শক্ত হয় না রোদে পোড়া ইঁট। ফলে বড় আর পুরু করে বানাতে হতো, যাতে দেয়াল তৈরি করলে ভার রাখতে পারে।'

'মুসা,' রবিনের কথা শেষ হলে কিশোর বললো, 'রান্নাঘরটায় খোঁজো। রবিন, তুমি খোঁজো শোবার ঘরে। আমি আর রিকি খুঁজছি বসার ঘরটায়।'

অব্যবহৃত অনেক ক্যানভাস দেখতে পেলো কিশোর। রঙ পাতলা করার তেলের টিনও আছে। কিন্তু কোনো ছবি নেই। অলংকরণ করা একটা সোনালি ফ্রেম রয়েছে। সেটার দিকে চেয়ে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো সে। আনমনে বললো, 'এটাকে খালি রেখেছিলো কেন ডেনবার?'

'এটাতে আরেকজনের আঁকা একটা ছবি ছিলো,' বললো রিকি। 'নকল ছবি। ডেনবার বলতো, প্রিন্ট। বলতো, প্রিন্ট মোটেই পছন্দ করে না সে, তাই খুলে ফেলে দিয়েছিলো।'

'কিন্তু ফ্রেমটা ফেলেনি। ডিজাইনগুলো দেখেছো?'

'আঁকাবাঁকা! কিশোর, এটার কথা বলেনি তো?'

রিকির কথা যেন শুনতেই পেলো না গোয়েন্দাপ্রধান। 'বেশ পুরু। ভেতরে অনেক কিছুই লুকিয়ে রাখা সম্ভব।'

ফ্রেমটা ভালোমতো পরীক্ষা করে দেখলো দু'জনে। জোড়াগুলো দেখলো। আঁকাবাঁকা অলংকরণগুলোতে আঙুল চালিয়ে, টিপেটুপে দেখলো। অবশেষে মাথা

নাড়লো কিশোর, 'না, নেই কিছু। তাহলে কোথায় কি আছে?'

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলো মুসা। 'পেলাম না। কিছু থেকে থাকলে, দেয়ালের মধ্যে লুকানো রয়েছে।'

'আমরাও কিছু পাইনি,' জানালো রিকি।

'এই, দেখে যাও!' শোবার ঘর থেকে রবিনের ডাক শোনা গেল। 'এইযে, এখানে।'

এক কোণে ফেলে রাখা জীর্ণ মলিন একটা বিছানার গদির কাছে দাঁড়িয়ে আছে সে। খোলের কাপড়ে তির্যক রেখা আঁকা ডিজাইন। 'আমার বিশ্বাস, এটার ভেতরে কিছু আছে।' ফুলে থাকা একটা জায়গা দেখালো।

টিপে দেখলো মুসা। 'খাইছে! নিশ্চয় পাথর। রত্ন! অনেকগুলো।'

'কাটো কাটো, জলদি কাটো,' বললো কিশোর।

পকেট থেকে পেন্সিল কাটার ছোট ছুরি বের করে গদির ওই জায়গাটা কাটলো মুসা। চারপাশ থেকে ঝুঁকে এসেছে অন্যরা। মাথা ঠুকাঠুকি হয়ে যাচ্ছে। গোল গোল পাথরের মতোই কতগুলো জিনিস বেরোলো।

'কি ওগুলো?' রিকির কণ্ঠে বিস্ময়।

'কোনো মেঠো ইঁদুর কিংবা কাঠবেড়ালির রত্ন,' নিরাশ হয়ে বললো কিশোর।

'মানে?'

'দেখছো না? একরন্ আর পাইন নাট।'

ওক আর পাইনের ফলগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলো ওরা। প্রথম হাসলো মুসা। 'হুঁহ্ হুঁহ্' হাসি থেকে বাড়তে বাড়তে একেবারে অট্টহাসি। সংক্রামিত হলো অন্যদের মাঝেও। হাসতে হাসতে চোখে পানি এসে গেল ওদের। একজন কোনোমতে থামলে অন্যদের হাসি দেখে আবার হেসে উঠছে।

এই হাসির জন্যেই টের পেলো না, বসার ঘরে যাওয়ার দরজাটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যখন পেলো, দেরি হয়ে গেছে।

হাসি থামিয়ে দরজার দিকে চেয়ে বললো মুসা, 'আরে...?'

কথা শেষ হলো না। দরজার ওপাশে খসখস শব্দ। খিল লাগানোর আওয়াজও শোনা গেল।

'এই, কে?' চেঁচিয়ে উঠলো রিকি। 'কে তুমি? কে?'

'খোলো খোলো, দরজা খোলো!' রবিন বললো।

পাল্লার ওপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো মুসা। জোরে ঠেলা দিয়ে বললো, 'এই, বন্ধ করছো কেন?'

'থামো তোমরা,' বললো কিশোর।

চুপ করলো অন্যেরা। বসার ঘরে নড়াচড়া করছে কেউ। জিনিসপত্র নাড়ছে। দরজায় ঠোকা দেয়ার শব্দ। আছড়ে ভাঙছে ছবি আঁকার ফ্রেম, ছুঁড়ে ফেলছে তেল আর রঙের কৌটা, টিন।

'খুঁজছে ব্যাটা,' ফিসফিস করে বললো কিশোর।

আরও কয়েক মিনিট ধরে চললো বিচিত্র শব্দ। ক্ষণিকের জন্যে নীরবতা। বাইরের দরজা বন্ধ হলো, তালা লাগানোর আওয়াজও বোঝা গেল।

'সর্বনাশ হয়েছে!' গুঙিয়ে উঠলো রিকি। 'তালায় চাবি লাগিয়ে রেখে এসেছিলাম!'

শোবার ঘরে একটা মাত্র জানালা। পুরু কাঠের শক্ত পাল্লা। খুলে যাতে কেউ ভেতরে ঢুকতে না পারে সেজন্যে মোটা তক্তা আর পেরেক দিয়ে বাইরে থেকে শক্ত করে বন্ধ করে দিয়েছেন রিকির বাবা। খুলতে হলে ছেনি-হাতুড়ি লাগবে।

বাইরে রাত নেমেছে। পাল্লার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো আসছে ঘরে।

কয়েক ঘন্টা হলো আটকে রয়েছে ছেলেরা। চেঁচিয়ে গলা ব্যথা করে ফেলেছে। কিন্তু কে শুনবে? হোফার হাউস থেকে অনেক দূরে এই অ্যাডোব। চেঁচামেচি করে লাভ হবে না বুঝে বেরোনোর অনেক চেষ্টা করেছে ছেলেরা। সুবিধে করতে পারেনি। ভীষণ পুরু দেয়াল। মুসার পকেট নাইফ কিংবা কিশোরের আটফলার সুইস নাইফ দিয়ে খুঁচিয়ে দেখেছে, প্রায় দাগই ফেলতে পারেনি দেয়ালে। বুঝেছে, বেশি চাপাচাপি করতে গেলে অযথা ছুরির ফলাই ভাঙবে, দেয়ালে গর্ত হবে না। দরজা খুলতে পারেনি, জানালা তো নয়ই। ঘরের মেঝেতে লাথি মেরে বুঝেছে, নিচে ফাঁপা, বোধহয় বেসমেন্ট আছে। কিন্তু ওখানে নামার পথ খুঁজে পায়নি।

হতাশ হয়ে এখন বসে রয়েছে পুরনো গদিটার ওপর।

'ডিনারের সময় হয়ে গেছে,' আফসোস করে বললো মুসা।

'আর ডিনার!' জোরে নিঃশ্বাস ফেললো রবিন। 'কাল সকালের নাস্তা করতে পারবো কিনা সন্দেহ। আটকা পড়লাম ভালোমতোই।'

রিকি বললো, 'বাবা আমাকে না দেখলে খুঁজবে। খুঁজে বের করবে।'

'কি করে জানবে, এখানে এসেছো? প্রায়ই আসো নাকি? জানেন তোমার বাবা?'

'না।'

'তাহলে কেন এখানে খুঁজতে আসবেন?'

আবার নীরবতা।

কিছুক্ষণ পর কি মনে হতে উঠলো মুসা। একদিকে দেয়ালের কোণ ঘেঁষে তৈরি করা হয়েছে একটা দেয়াল আলমারি। সেটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। কয়েকবার পা ঠুকলো মেঝেতে। 'বেসমেন্টে নামতে পারলে হতো। হয়তো বেরোনোর পথ পাওয়া যাবে। কিন্তু নামি কিভাবে?'

রিকিও গিয়ে মুসার পাশে দাঁড়ালো। 'অ্যাডোবের নিচে যে ভাঁড়ার ঘর আছে, জানতামই না। কেন বানালো বুঝতে পারছি না!' বিড়বিড় করলো আপনমনে, 'ক্যালিফোর্নিয়ায় এসব বানায় না লোকে!'

'না, তা বানায় না,' বললো কিশোর। 'আর এরকম পুরনো অ্যাডোবের নিচে তো নয়ই।' এক মুহূর্ত ভাবলো। তারপর লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো, উত্তেজিত। 'এখন অ্যাডোবের নিচে ভাঁড়ার বানায় না। কিন্তু যখন আমেরিকান আর স্প্যানিশরা শত্রু ছিলো? পালানোর জন্যে মাটির নিচে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে রাখতো। নিশ্চয় এটার তলায়ও ওরকম কিছু আছে।' আবছা আলোয় পুরো ঘরে আরেকবার চোখ বোলালো সে। বিড়বিড় করলো, 'নামার পথটা কোথায়?...' আলমারিটার দিকে তাকিয়ে রইলো এক মুহূর্ত। 'ওটার নিচে...'

কিশোরের কথা শেষ হওয়ার আগেই হুমড়ি খেয়ে বসে পড়লো রবিন আর মুসা। হাত দিয়ে মুছে ফেললো পুরু ধুলো আর ইঁট-মাটির গুঁড়ো। একটা চিড়মতো দেখা গেল। ওটার মধ্যে ছুরির ফলা ঢুকিয়ে নেড়েচেড়ে, চাপ দিয়ে দেখলো মুসা। 'এই, নড়ছে!' চেঁচিয়ে উঠলো সে।

রবিন আর সে মিলে টেনে তুললো একটা তক্তা। নিচেও ধুলো আর মাটির পুরু আস্তরণ। ওগুলো সরাতে বেরিয়ে পড়লো একটা ট্র্যাপডোর, লোহার মরচে ধরা বড় আঙটা লাগানো। আঙটাটা চেপে ধরে টান দিতেই উঠে এলো ট্র্যাপডোর। ফোকরের তলায় ঘন অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না।

'দেখা যায় না,' অস্বস্তিতে ভরা রবিনের কণ্ঠ।

'নাহ্,' বললো রিকি। 'খালি অন্ধকার।'

'সুড়ঙ্গ থাক আর যা-ই থাক, আমি নামছি না ওখানে,' সাফ বলে দিলো মুসা।

'বেশ, থাকো,' বললো কিশোর। 'ফেরেনটির হাতের ছুরির কথা মনে আছে? রাতের বেলা খুন করতে আসতে পারে।'

'ভয় দেখাচ্ছো? আসুক ছুরি নিয়ে। দরকার হয় লড়াই করবো। কিন্তু আমি ওই অন্ধকারে নামছি না। শুনেছি স্প্যানিশ ভূতগুলো সবচেয়ে পাজি।'

অন্য সময় হলে হেসে ফেলতো সবাই, এখন হাসলো না।

'ইস্, একটা টর্চও যদি থাকতো!' জিভ দিয়ে চুক চুক করলো কিশোর। 'কিন্তু

কেউ একজনকে তো নামতেই হবে।'

ভয়ঙ্কর লাগছে কালো গহ্বরটা, যেন কোনো দানবের হাঁ করা মুখ।

'বেশ, আমিই যাচ্ছি,' অসাধারণ দুঃসাহস দেখিয়ে বসলো রবিন। কেউ বাধা দেয়ার আগেই 'গুড বাই' বলে পা নামিয়ে দিলো ফোকরের ভেতরে। দুই হাতে কিনার ধরে রেখে ঝুলে রইলো এক মুহূর্ত। তারপর ঢিল করে দিলো আঙুলগুলো।

পড়তে লাগলো নিচে। কালো অন্ধকার গ্রাস করলো যেন তাকে।

দশ

কালো মুখটা দিয়ে নিচে উঁকি দিলো অন্য তিনজন।

'রবিন?' ডাকলো মুসা।

'ভালোই আছি আমি,' জবাব এলো নিচে থেকে। 'সুড়ঙ্গই। বালি আর ইঁটের গুঁড়োয় ভরা। কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না। হাত বাড়ালে দেয়াল হাতে লাগছে। এক মিনিট দাঁড়াও, আরও ভালোমতো দেখে নিই।'

নিচে নড়াচড়া শোনা গেল। ছেলেদের মনে হলো কয়েক ঘন্টা পেরিয়েছে, আসলে পেরোলো মাত্র কয়েকটা মিনিট। আবার শোনা গেল রবিনের কণ্ঠ, 'একদিকে ছয় ফুট গেছে, বোধহয় লিভিংরুমের তলায়। ওখানে আরেকটা ট্র্যাপডোর আছে। অনেক টেনেটুনে দেখলাম, খুলতে পারলাম না। ওটা খোলা গেলে হয়তো বেরোনো যাবে।'

'কিশোর,' মুসার কণ্ঠে অস্বস্তি। 'সুড়ঙ্গটা কোথায় গেছে কি করে জানবো?'

'হারিয়ে যেতে পারি,' বললো রিকি।

ঠোঁট কামড়ালো কিশোর। ডেকে জিজ্ঞেস করলো, 'রবিন? বাতাস কেমন ওখানে?'

'ভালোই। শ্বাস নিতে অসুবিধে হচ্ছে না। তবে স্থির হয়ে আছে।'

কালো অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দ্বিধা করছে গোয়েন্দাপ্রধান। কোথায় গেছে সুড়ঙ্গটা? 'বলা যায় না, কি হবে! সাংঘাতিক বিপদে পড়তে পারি,' বললো সে। 'মারাও যেতে পারি। কিন্তু এখানে বসে থাকার কোনো মানে হয় না। চেষ্টা করে দেখা দরকার। যে আটকে রেখে গেছে আমাদের, তার উদ্দেশ্যও জানি না। হয়তো ফিরে আসবে ছুরি নিয়ে...'

'আমি নামছি,' কিশোরের কথা শেষ হওয়ার আগেই বলে উঠলো মুসা। রবিনের মতো একই কায়দায় নেমে গেল।

তার পরে গেল রিকি। সব শেষে কিশোর।

একে অন্যের দিকে তাকানোর চেষ্টা করলো ওরা। এতোই অন্ধকার, কিছু দেখতে পেলো না। ঠাণ্ডাও বেশ। বেশিক্ষণ এখানে থাকতে হলে শীতেই কাবু হয়ে যাবে।

'চলো,' এতোক্ষণ ভয় পাচ্ছিলো বটে, কিন্তু সময়মতো ভয়ডর সব চলে গেল মুসার, নেতা হয়ে গেল। 'আমি আগে যাচ্ছি। কিশোর, তুমি আমার পেছনে থাকো। রবিন, রিকি, তোমরা কিছুটা দূরে থাকো। যদি খাদেটাদে পড়েই যাই, তোমরা অন্তত…' কথা শেষ করলো না সে।

ট্র্যাপডোরটা খোলা গেল না। উল্টোদিকে আরেকটা সুড়ঙ্গ আছে। সেটা ধরেই এগোনোর সিদ্ধান্ত নিলো মুসা। গাঢ় অন্ধকারে খুব সাবধানে এক পা এক পা করে আগে বাড়লো। ধীরে ধীরে নিচু হয়ে আসছে ছাত। ঝুঁকতে ঝুঁকতে শেষে বাঁকা হয়ে গেল, কুঁজো মানুষের মতো।

'মনে তো হয় সোজাই গেছে,' বললো মুসা। 'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

এগিয়ে চলেছে ওরা।

প্রতিটি পা মেপে মেপে ফেলছে মুসা। ফেলার আগে দেখে নিচ্ছে সামনে মাটি আছে, নাকি শূন্য। কথা বলছে না কেউ। গভীর অন্ধকার আর ভীষণ নীরবতা চেপে ধরছে যেন ওদেরকে।

'মুসা,' এক সময় বললো কিশোর। 'কি যেন নড়ছে।'

জমে গেল চারজনেই।

'বাতাস!' বলে উঠলো রবিন। 'বাতাস নড়ছে।'

আবার এগোলো মুসা। গতি সামান্য বাড়ালো। সামনে একটা মোড়।

মোড় ঘুরতেই মনে হলো, সামনে অন্ধকার কিছুটা ফিকে হয়ে আছে।

'সুড়ঙ্গমুখ!' আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলো মুসা।

আর বিশ কদম এগিয়েই খোলা আকাশের নিচে বেরিয়ে এলো ওরা। হাসলো একে অন্যের দিকে চেয়ে। এখন নিরাপদ। বন্ধ কারাগার, ভয়াবহ অন্ধকার থেকে মুক্তি মিলেছে শেষ অবধি। ওই অন্ধকারের পর জ্যোৎস্নাকে মনে হলো উজ্জ্বল সূর্যের আলো।

'নালাটায় বেরিয়েছি,' চারপাশে দেখে বললো রিকি।

নালার ভাটিতে রয়েছে ওরা। উজানের দিকটা উঠে গেছে অনেক ওপরে। যেখান দিয়ে বেরিয়েছে ওরা, সেটাকে দেখে মনে হয় কালো একটা সাধারণ গর্ত, ঝোপঝাড়ে ছাওয়া। সুড়ঙ্গমুখ যে, বোঝার উপায় নেই।

'চলো,' বলে পা বাড়াতে গিয়েই থেমে গেল কিশোর।

মাত্র দশ গজ দূরে ধুপ করে নালায় পড়লো কে যেন! অসাবধানে পা বাড়াতে

গিয়েই বোধহয় পড়েছি। 'বাবারে!' বলে চেঁচিয়ে উঠলো।

'কে?' বলে এগিয়ে গেল মুসা।

হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো লোকটা। চাঁদের আলোয় তার চেহারা দেখে যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো মুসা। ঘুরেই দিলো দৌড়। চেঁচিয়ে বললো, 'পালাও, পালাও! জন ফেরেনটি...'

অন্যেরাও দৌড়াতে শুরু করলো মুসার পেছনে।

'এই শোনো, থামো থামো...!'

কিন্তু কে শোনে ডাক? ছুটছে তো ছুটছেই ওরা। পেছনে আসছে ফেরেনটি। পাথরে লেগে তার জুতোর শব্দ হচ্ছে। থামলো তো না-ই, গতি আরও বাড়িয়ে দিলো ছেলেরা।

'জলদি করো!' বললো মুসা। 'সাইকেলের কাছে।'

মোড় ঘুরতেই হঠাৎ সামনে পড়লো আরেকজন। মুসার হাত চেপে ধরলো। ঝাড়া দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে চিৎকার করে বললো সে, 'খবরদার, কেউ থেমো না! ধরতে যেন না পারে!' উত্তেজনায় মানুষটার মুখের দিকেও তাকালো না, হাত ছাড়িয়ে নিয়েই আবার দৌড়।

'এই রিকি! আমি!'

'আরি, বাবা!'

থেমে গেল ছেলেরা।

হাঁপাতে হাঁপাতে মুসা বললো, 'ফেরেনটি তাড়া করেছে আমাদের।'

'অ্যাডোবে আটকে রেখেছিলো,' জানালো রিকি।

'ভাগ্যিস গোপন সুড়ঙ্গটা পেয়ে গেলাম,' যোগ করলো রবিন। 'নইলে এখনও ওখানেই আটকে থাকতাম!'

নালার ভাটির দিকে তাকালেন প্রফেসর। 'কই, কাউকে তো দেখছি না।'

ছেলেরাও ফিরে তাকালো। সত্যি, কেউ নেই। শুধু নীরব চাঁদের আলো।

'ছিলো তো!' বললো কিশোর। সংক্ষেপে জানালো অ্যাডোবে ঢোকার পর কি কি ঘটেছে।

'হুঁ,' মাথা দোলালেন প্রফেসর। 'কটেজেও আবার কে জানি ঢুকেছিলো। ফেরেনটিই হবে।'

'হবে কি বলছো, বাবা, নিশ্চয় সে-ই ঢুকেছিলো। আমাদের আটকে রেখে কটেজে গিয়েছিলা। ওখানে খুঁজেছে। কিছু না পেয়ে আবার রওনা হয়েছে অ্যাডোবে। ল্যাঙড়া তো। পড়ে গিয়েছিলো নালায়। ওখানে আমাদের দেখেই তাড়া করেছে।'

'ভালো বিপদেই পড়েছিল,' বললেন প্রফেসর। 'কিন্তু ওই ফেরেনটিটা এদিকে এতো ঘুরঘুর করছে কেন? কি চায়?'

এগারো

বাড়িতে বলে যায়নি। ফলে, রাত করে বাড়ি ফেরার জন্যে, আর দুশ্চিন্তায় রাখার কারণে বকা খেতে হলো তিনজনকেই।

পরদিন আবার হেডকোয়ার্টারে মিলিত হলো তিন গোয়েন্দা।

মুসা ঢুকে দেখলো, চেয়ারে নেতিয়ে রয়েছে কিশোর আর রবিন।

'কি ব্যাপার?' ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলো গোয়েন্দাসহকারী। 'মানুষ মরেছে নাকি?'

'এতো দেরি করলে যে?' জোর নেই কিশোরের কণ্ঠে।

ধপ করে বসে পড়ে মুসা বললো, 'কাল রাতে যে দেরি করেছি, তার শাস্তি। সকালে পুরো বাগানের ঘাস কাটিয়ে ছাড়লো মা। তা তোমাদের কি হয়েছে?

'ফ্রেড ব্রাউন আমাদের বরখাস্ত করেছে,' বিষণ্ণ কণ্ঠে জবাব দিলো রবিন।

দীর্ঘশ্বাস ফেললো কিশোর। 'কয়েক মিনিট আগে ফোন করেছিলো। কাল রাতে অ্যাডোবে কি কি ঘটেছিলো, তাকে জানিয়েছেন মিস্টার হোফার। শুনে, ম্যানেজার বললো, কাজটা আমাদের জন্যে বিপজ্জনক হয়ে যাচ্ছে। ফলে, আর কাজ করতে আমাদেরকে বারণ করে দিয়েছে। ছোটখাটো একটা বোনাসও পাঠিয়েছে।'

'খাইছে!' অন্য দু'জনের মতোই মুসাও নেতিয়ে গেল। 'গোয়েন্দাগিরিতে আমাদের প্রথম ব্যর্থতা!'

'এবং এতো কষ্টের পর,' গুঙিয়ে উঠলো কিশোর। 'অথচ রহস্যগুলোও এখনও জট পাকিয়েই রইলো!'

'এবং ওই জট জটই থেকে যাবে,' বললো রবিন।

চুপ হয়ে গেল গোয়েন্দাপ্রধান। বহুদূরে চলে গেছে যেন তার মন, ট্রেলারের গণ্ডিতে নেই।

আর থাকতে না পেরে বলে উঠলো মুসা, 'রবিন, পিঠ সোজা করো। আমাদের কিশোর মিয়া এতো সহজে ছাড়ার পাত্র না। দেখছো না, ফন্দি আঁটছে।'

'তিন গোয়েন্দা ব্যর্থ হতে পারে না,' বাস্তবে ফিরে এলো যেন কিশোর। 'এই রহস্যের সমাধান আমরা করবোই।'

'কিভাবে?' বললো রবিন।

'রিগ ডেনবারের প্রলাপের মানে বুঝতে পারলেই এই রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে।'

'কি দরকার কিশোর?' মাথা নাড়লো মুসা, 'নাহয় ছেড়েই দিলাম একটা কেস। ব্রাউন ঠিকই বলেছে, বড় বেশি বিপজ্জনক...'

'বিপদে আগেও পড়েছি আমরা,' মুসাকে থামিয়ে দিলো কিশোর। 'এখন, এসো, ডেনবারের কথাগুলোর মানে বের করার চেষ্টা করি।' টেবিলে দুই কনুই রেখে সামনে ঝুঁকলো সে। 'এক নম্বরঃ বুড়ো ডেনবারের কাছে দামী কিছু একটা ছিলোই। দুইঃ সেই কথাটা একাধিক লোক জানে। তিনঃ বিশটা ছবির মধ্যে কোনো সূত্র লুকানো রয়েছে। এবং চার নম্বরঃ প্রলাপের মধ্যেই রয়েছে কোনো জরুরী মেসেজ।' আবার চেয়ারে হেলান দিলো গোয়েন্দাপ্রধান। 'এখন ওই প্রলাপগুলোর রহস্য ভেদ করতে হবে আগে। যদি সত্যি বলা হয়ে থাকে।'

'রিকি আর তার বাবা মিছে কথা বলেছে, ভাবছো?' রবিন বললো।

'প্রফেসরের টাকা দরকার,' ঘুরিয়ে জবাব দিলো কিশোর। 'ডেনবারের কাছে টাকা পানও তিনি। আগাগোড়াই হয়তো জেনে এসেছেন, বুড়োর কাছে মূল্যবান কোনো জিনিস আছে। কিংবা হয়তো আন্দাজ করেছেন, যেদিন পয়লাবার চোর ঢুকলো তাঁর ঘরে।'

'আমার বিশ্বাস হয় না রিকি মিছে কথা বলেছে,' মাথা নাড়লো মুসা।

'বেশ,' বললো কিশোর, 'ধরে নিলাম, বলেনি। তাহলে ডেনবারের শেষ কথাগুলোর অর্থ উদ্ধার করা যাক। রিকি আর প্রফেসর যা যা বলেছেন, সব লিখে রেখেছি আমি।' একটা কাগজ বের করে টেবিলে রাখলো সে। 'প্রফেসরের কথামতো ডেনবার বলেছেঃ পেইনটিংস, আঁকাবাঁকা, ভুল, ক্যানভাস আর মাস্টারস। ডেনবারের কাছে কাছে থাকায় আরও বেশি শুনেছে রিকি। সে বলেছেঃ ওদের বলো...আঁকা যখন বাঁকা...ভুল মনে হবে...মাস্টার...আমার পেইনটিংস ...আমার ক্যানভাস...ক্যানভাস থেকে আঁকাবাঁকা...বি-ব্বলো...ভুল। মোটামুটি এই কথাগুলোই বার বার বলেছে।'

মাথা চুলকালো মুসা। 'ওদের বলো, একথার মানে বোঝা যায়, কাউকে বলার কথা বলছে। আঁকা যখন বাঁকা আর ভুল মনে হবে বলে বোধহয় দিক-নির্দেশ করতে চেয়েছে। কোনো একটা পথ ভুল। তাহলে কোনটা ঠিক?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝোঁকালো কিশোর। 'এটা একটা জরুরী প্রশ্ন।'

'মানে কি?' প্রশ্ন করলো রবিন।

'জানি না। আরও একটা শব্দ বুঝতে পারছি না. বি-ব্বলো মানে কি?'

'তোতলামি,' বললো মুসা। 'স্রেফ তোতলামি। প্রলাপ বকার সময় উচ্চারণে ভুল করেছে। বলতে চেয়েছে "বলো", মানে ওদের বলো।'

'তা হতে পারে।'

লেখাগুলো পড়লো রবিন। 'মাস্টার আর পেইনটিংসের মানে হলো, ডেনবার ভেবেছে তার ছবিগুলো মাস্টার পীস। আর আমার ক্যানভাস, ক্যানভাস থেকে আঁকাবাঁকা, এসব কথা বলতেই পারে যে কোনো আর্টিস্ট।'

মুসা বললো, 'ফেরেনটিও হয়তো ভেবেছে, ছবিগুলো ভালো।'

টেবিলে চাপড় মারলো রবিন। 'ঠিক বলেছো! ডেনবার হয়তো আসলেই ভালো আর্টিস্ট ছিলো। বড় আর্টিস্ট, কিন্তু খামখেয়ালী। তাই তার ছবি কাউকে দেখায়নি, কিংবা বিক্রি করেনি। হয়তো ফেরেনটি ভাবছে, ছবিগুলো পেলে অনেক দামে এখন বিক্রি করা যাবে।'

'এ-সবই হতে পারে,' সন্তুষ্ট হতে পারছে না কিশোর। 'কিন্তু ডেনবারের মেসেজটা কি? বলেছে, ওদের বলো। কাদেরকে বলতে বলেছে?'

'কাউন্টেস আর ফ্রেড ব্রাউনকে,' বললো মুসা।

'ব্রাউনের কথা কেন বলবে? ওই লোক তো কাউন্টেসের সাধারণ একজন কর্মচারী। কেন তাকে বোনের সঙ্গে মেশাতে যাবে? বললেই পারতো, আমার বোনকে বলো। তারমানে একাধিক জনকে জানাতে চেয়েছে। কোনো দলের কথা বলেছে।'

'দল!'

'চোর-ডাকাতের দল হওয়াও অসম্ভব নয়। প্রফেসরের বাড়ির সীমানার বাইরে কোথাও যেতো না ডেনবার। ধরে নেয়া যায় না, সে ওখানে কারও ভয়ে লুকিয়ে ছিলো?'

'তাহলে কি ফেরেনটিও ওই দলের কেউ? চোরাই মাল খুঁজতে এসেছে?'

'সে-রাতে আমাদের অ্যাডোবে আটকে রেখে খোঁজাখুঁজি করার এটাই সম্ভাব্য ব্যাখ্যা,' বললো কিশোর। 'আর রবিন যে বলেছে, ডেনবারের ছবিগুলো দামী ছিলো, তা নয়। তাহলে ফেরেনটি অ্যাডোবে গিয়ে জিনিসপত্র ভাঙতো না, বরং ছবিগুলো খুঁজে বের করার দিকেই নজর দিতো বেশি।' দ্বিধা ফুটলো তার চেহারায়।

'কি হলো, কিশোর?' অবাক হলো রবিন।

'শিওর না,' ধীরে ধীরে বললো গোয়েন্দাপ্রধান। 'কাল রাতে অ্যাডোবে···নালায়···কি যেন একটা ভুল···কোথায় যেন কিছু গোলমাল···ঠিক ধরতে পারিনি, এখনও পারছি না।'

'কই, কাল রাতে আমার তো কোনো গোলমাল মনে হয়নি?' বললো মুসা।
'কি জানি! যাকগে, পরে ভাববো। এখন একবার গিয়ে ফ্রেড ব্রাউনের সঙ্গে দেখা করা দরকার। আমি আর মুসা যাবো।'
'আর আমি?' জানতে চাইলো রবিন।
'আরেকবার যাও শুঁটকির কাছে। ছবিটা কোথায় পেয়েছে, জানার চেষ্টা করো।'

বারো

রকি বীচের মাইল খানেক দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে তৈরি হয়েছে অভিজাত বিলাসবহুল মোটেল 'সী বীচ'। বাইরে সাইকেল পার্ক করে চকচকে সুসজ্জিত প্রধান প্রবেশপথের দিকে এগোলো দুই গোয়েন্দা। হলরুমে ঢুকলো। রিসিপশন ডেস্কে বসে রয়েছে লম্বা, বদ-চেহারার এক লোক। ছেলেদের দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকালো। জিজ্ঞেস করলো, 'কি চাই?'
নার্ভাস হয়ে গেল মুসা। কিন্তু কিশোর এতো সহজে দমবার পাত্র নয়। মাথা সোজা করে কেউকেটা একটা ভাব করে, ইংরেজিতে বিদেশী টান এনে, গম্ভীর ভঙ্গিতে বললো, 'কাউন্টেসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি আমরা। আমি কিশোর পাশা দ্য ফোর্থ। আর ইনি মিস্টার মুসা আমান। মশিয়ে ব্রাউনকে খবর পাঠান, আমরা এসেছি।'
অনেক কষ্টে হাসি দমন করলো মুসা।
কিন্তু লোকটা কিশোরের এই অভিনয় ধরতে পারলো না। দ্বিধা করছে। ভাবছে, ছেলেটাও কোনো হবু কাউন্ট নয় তো?
'কিংবা,' ক্লার্ককে দ্বিধা করতে দেখে বললো কিশোর। 'আরেক কাজ করতে পারেন। আপনার কাজ সহজ করে দিচ্ছি। নাম্বার বলুন, আমরা নিজেরাই গিয়ে দেখা করছি।'
'ইয়ে,' নাক চুলকালো ক্লার্ক। 'ইয়ে···মিস্টার ব্রাউন উঠেছেন দশ নম্বর কটেজে। পোর্টারকে ডাকছি···'
'দরকার নেই,' হাত নাড়লো কিশোর। 'আমরাই খুঁজে নেবো। এসো, আমান।'
রাজকীয় চালে হেঁটে হল পেরোলো গোয়েন্দাপ্রধান, একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো মোটেলের চমৎকার চত্বরে। ক্লার্কের চোখের আড়ালে এসেই আবার স্বাভাবিক হলো কিশোর। হেসে বললো, 'দশ নম্বরটা সম্ভবতঃ বাঁয়ে। ···ওই যে,

সিরিয়াল নম্বরের সাইন।'

'এরকম করতে গিয়ে কোনদিন যে কি বিপদে পড়বে…,' বললো মুসা। 'মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেবে তখন।'

'আরে রাখো তোমার বিপদ। ধরতে পারলে তবে তো? আর এসব দামী জায়গার ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা। হোমড়া-চোমড়ারা আসে। পান থেকে চুন খসলেই তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দেবে। ফলে ভয়ে ভয়ে থাকে কর্মচারীরা, সন্দেহে ভোগে। ওদেরকে ধোঁকা দেয়া তাই সহজ।'

এই লেকচারের পর আর কথা চলে না। চুপ হয়ে গেল মুসা।

সরু পথ, দু'ধারে চিরসবুজ গাছ আর লতার ঝাড়। সুইমিং পুলের কাছ থেকে হাসি, কথার আওয়াজ ভেসে আসছে।

পথটা ধরে এগোলো দুই গোয়েন্দা। কিছু দূর এগোতেই এক ধার থেকে শুরু হলো কটেজের সারি।

'নয় নম্বর,' এক সময় বললো কিশোর। 'পরেরটাই দশ নম্বর হবে। ওই পাম গাছটার ওধারে বোধহয়।'

গাছের মোটা গুঁড়িটা ঘুরে এসেই থমকে গেল দু'জনে। দশ নম্বর কটেজের জানালায় দাঁড়িয়ে ভেতরে উঁকি দিয়ে আছে একজন। একটানে মুসাকে নিয়ে আবার গাছের আড়ালে সরে এলো কিশোর। কয়েক সেকেণ্ড জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থেকে ঘুরে দরজার কাছে চলে গেল 'চোরটা'। দরজা খোলার চেষ্টা করলো।

'কিশোর!' বলে উঠলো মুসা। 'ব্যাটা…'

ঝট করে ফিরে তাকালো চোর।

'শুঁটকি টেরি!' মুসার কথাটা শেষ করলো কিশোর।

ক্ষণিকের জন্যে হাঁ হয়ে গেল টেরিয়ার। দুই গোয়েন্দাকে ছুটে আসতে দেখে ঘুরেই দিলো দৌড়। হুড়মুড় করে গিয়ে ঢুকলো ঝাড়ের মধ্যে।

'ধরো, ধরো ব্যাটাকে!' চেঁচিয়ে বললো কিশোর।

পামের সারি আর হিবিসকাসের ঝাড়ের পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে দৌড়াচ্ছে টেরিয়ার। পেছনে মুসা। কিশোর বুঝলো, ওভাবে দৌড়ে শুঁটকিকে ধরা যাবে না। একটা শর্টকাট বেছে নিয়ে দৌড় দিলো আরেক দিক দিয়ে। টেরিয়ারের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছে। পুলের ধার দিয়ে চলে যেতে চায় মেইন গেটের কাছে।

সোজা পুলের দিকে ছুটলো কিশোর। চোখ মুসা আর টেরিয়ারের দিকে। ফলে গায়ের ওপর গিয়ে পড়ার আগে লোকটাকে দেখতে পেলো না।

পেটে গুঁতো খেয়ে গাঁউক করে উঠলো লোকটা। ফিরে চেয়ে দেখলো

কিশোর, ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রয়েছে রূপালি-চুল এস্টেট ম্যানেজার।

'কিশোর! কি করছো এখানে? এভাবে দৌড়াচ্ছো কেন?'

'শুঁটকি টেরি, স্যার,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো কিশোর। 'টেরিয়ার ডয়েল। আপনার ঘরে ঢোকার চেষ্টা করছিলো। মুসা গেছে পেছনে। আমি এদিক দিয়ে ঘুরে গিয়ে ধরতে চেয়েছিলাম...'

'টেরিয়ার ডয়েল? মানে, যে ছেলেটার কাছে মিস্টার ডেনবারের একটা ছবি আছে?'

'হ্যাঁ, স্যার। মুসা ধরতে পারলে...'

পারলো না। ফিরে এলো মুসা। 'পালালো ব্যাটা।...সরি...'

'পালালো, না?' ভ্রূকুটি করলো ম্যানেজার। 'ও আমার কটেজে ঢুকতে চেয়েছে কেন?'

'সেটা তো আমারও প্রশ্ন, কিশোর বললো। 'মিস্টার ডেনবারের জিনিসগুলো কি কটেজেই রেখেছেন, স্যার? আমরা যেগুলো খুঁজে বের করে দিয়েছি?'

'হ্যাঁ। কিন্তু ওগুলো দিয়ে টেরিয়ার কি করবে? একটা পেঁচা...' পুলের ধারের চত্বরের দিকে চোখ পড়তে থেমে গেল ম্যানেজার। 'কাউন্টেস ডাকছেন। বোধহয় কথা বলতে চান।'

চত্বরে পাতা রয়েছে অনেকগুলো চেয়ার-টেবিল। তার একটাতে বসে রয়েছেন কাউন্টেস। তিনজনে এগোলো সেদিকে।

'কি হয়েছে?' উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলেন কাউন্টেস।

ছেলেদেরকে বসতে ইশারা করে, সংক্ষেপে কাউন্টেসকে সব কথা জানালো ম্যানেজার। আবার ফিরলো ওদের দিকে। 'তোমরা নিশ্চয় টেরিয়ারকে ধরতে এখানে আসোনি?'

'না, স্যার,' বললো মুসা। 'আপনাদের অনুমতি নিতে এসেছি, আমরা ছবি খোঁজার কাজটা চালিয়ে যেতে চাই...'

'তাহলে তো ভালোই হতো। কিন্তু...'

'কিছু ব্যাপার আছে, স্যার,' তাড়াতাড়ি বললো কিশোর। খুলে বললো ওদের অনুমানের কথাঃ রিগ ডেনবারের কাছে কোনো মূল্যবান জিনিস ছিলো। কথাটা অন্য কেউ জানে। হারানো ছবিগুলোর সঙ্গে ওই জিনিসের কোনো যোগাযোগ রয়েছে। আর, ডেনবারের প্রলাপ শুধুই প্রলাপ নয়, তার মধ্যে মেসেজ রেখে গেছে। শেষে বললো, 'এর দুটো মানে হতে পারে, স্যার। হয় সত্যি মিস্টার ডেনবার খুব ভালো আর্টিস্ট ছিলেন, তাঁর ছবিগুলোর দাম অনেক, এবং সেটা জানে জন ফেরেনটি। নয়তো মিস্টার ডেনবার কোনো খারাপ কাজে জড়িয়ে

পড়েছিলেন। এই যেমন চুরি-ডাকাতি, কিংবা চোরাচালানী...'

'কি বলছো?' হাত নাড়লো ম্যানেজার। 'কাউন্টেসের ভাই চোর? বুঝেশুনে কথা বলা উচিত।'

'কিন্তু একটা কথা ঠিকই বলেছে,' কাউন্টেস বললেন, 'জন ফেরেনটিকে ভালো লোক মনে হয় না। কিছু খুঁজছে বোঝা যায়।'

'আপনার ভাই তার দ-ের লোকও হতে পারে, ম্যাডাম,' বললো কিশোর।

'হুম্‌ম্‌!' কাউন্টেসের দিকে তাকালো একবার ব্রাউন। 'কে জানে, হতেও পারে। খেয়ালী লোক ছিলেন তো। হয়তো কোনোভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন।...তোমরা তাহলে আর এসবে যেও না। বিপদে পড়বে। এখন পুলিশকে জানাবো...'

'কিন্তু, স্যার, আমরা...'

'আর কোনো কিন্তু নেই। জেনেশুনে বিপদে ফেলতে পারি না আমরা তোমাদেরকে। যাও, বাড়ি যাও।'

তেরো

দরজার কাছে আটকালো দু'জনকে ডোরম্যান। জিজ্ঞেস করলো, 'তোমরা দু'জন গোয়েন্দা?'

ঢোক গিললো মুসা। 'আমরা...'

'আহ্! গোয়েন্দা কিনা বলো। হ্যাঁ, কিংবা না।'

'হ্যাঁ।'

'এসো আমার সঙ্গে।'

পরস্পরের দিকে তাকালো কিশোর আর মুসা। আড়চোখে দেখলো, চোখ গরম করে ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে বদ-চেহারার রিসিপশনিস্ট। হলের প্রতিটি দরজায় লোক, পোর্টার আর ম্যাসেঞ্জার বয়, সবাই চেয়ে রয়েছে দু'জনের দিকে। যেন চোর আটকেছে।

একটা দরজা দিয়ে ছোট একটা ঘরে দু'জনকে নিয়ে এলো ডোরম্যান। তারপর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

কাউন্টেস বসে আছেন। 'কথা আছে তোমাদের সঙ্গে। ওভাবে মন খারাপ করে চলে যাচ্ছিলে...'

'তারমানে কাজটা চালিয়ে যেতে বলছেন!' উত্তেজনা চাপতে পারলো না মুসা।

'আপনার ম্যানেজার মত বদলেছেন তাহলে?' বললো কিশোর।

'না। ও চায় না, তোমরা কাজ করো। তবে আমার বিশ্বাস, তোমরা পারবে।'

'হ্যাঁ, পারবো,' দৃঢ়কণ্ঠে বললো কিশোর।

'পুলিশ চীফ সার্টিফিকেট দিয়েছেন তোমাদের, সেকথা ভুলিনি আমি। কাজ করার অনুমতি দিতে পারি, তবে আমাকে কথা দিতে হবে, সাবধানে থাকবে তোমরা। কোনও বিপদ ঘটাবে না।'

'নিশ্চয়ই না,' কিছু না ভেবেই বলে ফেললো মুসা।

'গুড। আমার ভাই কি করছিলো, জানা দরকার।'

'নিজে হয়তো খারাপ লোক ছিলেন না তিনি,' কিশোর বললো। 'কিন্তু তাঁকে হয়তো কোন খারাপ কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছে...'

'সেটাই জানতে চাই।'

'কাউন্টেস, একটা কথা বলবেন? যে জিনিসগুলো খুঁজে দিয়েছি, ওগুলোর মাঝে সত্যি কি কোনো মূল্যবান কিছু আছে?'

'নেই। তোমার কি মনে হয়? জিনিসটা কি?'

'এখনও জানি না।'

'কিন্তু তোমার বিশ্বাস, আমার ভাই কিছু লুকিয়ে রেখে গেছে। কোথায় রেখেছে, সে-কথাও জানিয়ে গেছে?'

'তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

'বেশ। পারলে খুঁজে বের করো জিনিসটা। আর জন ফেরেনটির ব্যাপারে সাবধান। অযথা ঝুঁকি নিও না। কিছু জানতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে এসে জানাবে আমাকে। যাও এখন। গুড বাই।'

হেডকোয়ার্টারে ঢুকে দেখলো দু'জনে, রবিন বসে আছে। ওদের দেখেই চেঁচিয়ে উঠলো, 'খবর আছে!'

'আমাদের কাছেও আছে!' বসতে বসতে বললো মুসা।

'কোত্থেকে জানি এলো শুঁটকি, মনে হলো ভূতের তাড়া খেয়ে এসেছে! ঘরে গিয়ে যে ঢুকলো, আর বেরোলো না।'

'ওর সঙ্গে তাহলে কথা হয়নি?' জানতে চাইলো কিশোর।

'না। গিয়ে পেলাম না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে যখন ফিরে আসবো ভাবছি, দেখি আসছে। আমার দিকে চাইলো না।...তবে ওদের মালীর সঙ্গে অনেক কথা বলেছি। জেনেছি, কোথায় কাজ নিয়েছে শুঁটকি।'

'শুঁটকি ব্যাটা আবার কাজ নিলো কোথায়? তার চাকরির কি দরকার?' অবাক

হলো মুসা।

'কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'মিস্টার নরম্যান গালিভারের অ্যাসিসট্যান্ট।'

আরও অবাক হলো মুসা। 'মিস্টার নরম্যান গালিভার! আর্টিস্ট...'

'বিখ্যাত আর্টিস্ট!' চকচক করে উঠলো কিশোরের চোখ। 'এই রকি বীচেই যিনি থাকেন!'

'বিশাল একটা বাড়িতে থাকেন,' বললো রবিন। 'স্টুডিওটা আলাদা, তবে বাড়ির লাগোয়া। আমরা ছবি খুঁজছি, আর শুঁটকি আর্টিস্টের ওখানে চাকরি করে, কেমন যেন কাকতালীয় ব্যাপার মনে হয় না?'

'হয়,' মাথা ঝোঁকালো কিশোর। 'খুব বেশি কাকতালীয়ই মনে হয়। জলদি চলো। লাঞ্চ সেরেই মিস্টার গালিভারের সঙ্গে দেখা করতে যাবো।'

লোহার উঁচু গেটের বাইরে সাইকেল রাখলো তিন গোয়েন্দা। বিরাট এলাকার ভেতরে দুর্গের মতো মস্ত এক বাড়ির চূড়া চোখে পড়ছে, ঘন গাছপালার জঙ্গলের মাথার ওপর দিয়ে। বিকেলের রোদে আসল বনের মতোই লাগছে দেখতে। গেটটা খোলা। কাউকে চোখে পড়লো না।

'চলো, ঢুকে পড়ি,' বললো মুসা।

ভেতরে ঢুকলো ওরা। আঁকাবাঁকা সরু একটা পথ চলে গেছে বনের ভেতর দিয়ে। সবে পা বাড়িয়েছে এগোনোর জন্যে, ঠিক এই সময় ভেসে এলো তীক্ষ্ণ এক চিৎকার। যেন তীব্র ব্যথায় চিৎকার করে উঠেছে কোনো মেয়েলোক কিংবা বাচ্চা ছেলে!

'কী?' ফিসফিস করে বললো রবিন।

'ভূত না তো!' ভয় পেয়ে গেছে মুসা। 'চলো, ভাগি!'

আবার শোনা গেল চিৎকারটা। বাঁয়ে।

'কেউ বিপদে পড়েছে!'

'চলো তো, দেখি,' কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে বললো কিশোর। 'খবরদার শব্দ করবে না!'

পথ থেকে সরে গাছের আড়ালে এগোলো ওরা।

শোনা গেল আবার রক্ত-পানি-করা চিৎকার। ঠিক সামনে। দু'হাতে ঠেলে কয়েকটা পাতা সরালো কিশোর। একটুখানি খোলা জায়গা! ওখানে বসে রয়েছে একটা ভয়ানক জানোয়ার। চোখ এদিকেই।

স্তব্ধ হয়ে সবুজ চোখজোড়ার দিকে তাকিয়ে রইলো ছেলেরা।

তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠলো জীবটা। দেখালো মারাত্মক শ্বদন্ত।

'চিতাবাঘ!' গলা কাঁপছে কিশোরের। 'দৌড় দাও! কুইক!'

'না!' মানা করলো মুসা। বাঘটার চোখে চোখে তাকিয়ে রয়েছে। 'যেখানে রয়েছো দাঁড়িয়ে থাকো। দৌড় দিলেই এসে ধরবে।'

'হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে থাকো। একেবারে চুপ,' পেছন থেকে বলে উঠলো আরেকটা কণ্ঠ। 'দৌড় দিলেই মরবে।'

ঝট করে ফিরে তাকালো তিনজনে।

বিশালদেহী এক লোক, যেন একটা গ্রিজলি ভালুক। লাল দাড়ি, লাল ঘন চুল। চোখে আগুন। হাতে একটা বল্লম, ঝকঝকে ফলাটা তিন ফুটের কম হবে না।

পাথর হয়ে গেল যেন তিন গোয়েন্দা। পালানোর পথ নেই। সামনে চিতাবাঘ, পেছনে বল্লম-হাতে এক 'ভালুক'!

বিকট গর্জন করে ওদের দিকে লাফ দিলো চিতাটা।

চোদ্দ

মাঝপথে অদৃশ্য কোনো দেয়ালে বাড়ি খেয়ে যেন থেমে গেল চিতাবাঘ, ধুপ করে পড়লো মাটিতে। নাকে মুখে ব্যথা পেয়েছে। আহত কুকুরের মতো একবার কুঁইকুঁই করে আবার ফিরে গিয়ে বসলো আগের জায়গায়। সবুজ চোখ জ্বলছে। ছেলেদের ধরতে না পেরে রেগে গেছে।

'কি-কিভাবে…,' গলা এতো কাঁপছে, কথাই বলতে পারছে না রবিন।

হাত বাড়ালো মুসা। পাতার ওপাশে, মাত্র ফুটখানেক দূরে ঠেকে গেল হাত। 'কাচ! কাচের খাঁচায় ভরে রাখা হয়েছে! এতো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, দেখিইনি। পুরো খোলা জায়গাটাই একটা বিশাল কাচের খাঁচা!'

'বুঝেছো তাহলে,' বললেন লাল-দাড়িওয়ালা লোকটা। 'তোমাদের কি ধারণা, চিতাবাঘ ছেড়ে রাখবো মানুষের ঘাড় মটকানোর জন্যে?'

'না না,' মিনমিন করে বললো কিশোর, 'তা কেন…'

রবিন জিজ্ঞেস করলো, 'ওটাকে কাচের খাঁচায় ভরেছেন কেন, স্যার?'

'নাহলে স্টাডি করবো কিভাবে? কি করে হাঁটে ওটা, পেশী নাড়ায়, হাঁ করে…না দেখলে আঁকবো কিভাবে? জ্যান্ত হবে ছবি?'

'আপনিই আর্টিস্ট!' এতোক্ষণে বুঝলো কিশোর। 'মিস্টার নরম্যান গালিভার, বিখ্যাত…'

'চিতাবাঘের ছবি আঁকবেন,' বললো রবিন।

'হ্যাঁ, আঁকবো। আফ্রিকান অনেক কিছুর ছবিই আমি এঁকেছি। ওসব কথা থাক।' বল্লমটা নাড়লেন গালিভার। 'এটা দেখো। আফ্রিকান মাসাই উপজাতির লোকেরা এ-জিনিস দিয়ে সিংহ মারে।' ছেলেদের সই করে তুললেন অস্ত্রটা। 'আরও অনেক কিছু মারা যায়। এই যেমন ধরো, মানুষ। বলো এখন, আমার স্টুডিওতে ঢুকেছো কেন? চুরি করার জন্যে?'

'আমরা চোর নই,' মেজাজ দেখিয়ে বললো মুসা। কেউ তাকে চোর বললে সাংঘাতিক রেগে যায়।

'বাহ্, রাগও আছে। তাহলে চুপি চুপি আমার বাড়িতে ঢোকার কারণ?'

'আমরা, স্যার, ডিটেকটিভ,' জবাব দিলো কিশোর। 'কথা বলতে এসেছি। আপনার অ্যাসিসটেন্ট টেরিয়ার ডয়েল...'

'টেরিয়ার? ওই শয়তানটার সঙ্গে সম্পর্ক? হুঁ তোমরাও বাজে ছেলে। যাও, আগে বাড়ো। পুলিশে দেবো তোমাদের,' হাতের বল্লম নাচালেন আর্টিস্ট।

দুর্গের ভেতরে বড় একটা ঘরে ছেলেদের নিয়ে এলেন। শেলফ ভরতি বই। কেমন বিষণ্ণ পরিবেশ।

'পুলিশকে ফোন করবেন তো, স্যার?' কিশোর বললো। 'চীফ ইয়ান ফ্লেচারকে চান।'

'কেন?'

'আমাদের নাম বললেই উনি চিনতে পারবেন।' তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড, সেই সঙ্গে পুলিশ চীফের সার্টিফিকেটটা বের করে বাড়িয়ে দিলো কিশোর।

'সইটা তো আসলই লাগছে। চীফেরই সই কি করে জানবো?'

'করুন না, তাঁকে ফোন করুন। নইলে আরেক কাজ করতে পারেন। আর্টিস্ট যখন, নিশ্চয় মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের সঙ্গে পরিচয় আছে...'

'ফিল্ম প্রডিউসার? ডিরেক্টর?'

'হ্যাঁ।'

'সে-ও তোমাদের চেনে নাকি? এইবার সত্যি সত্যি বিপদে পড়লে, ইয়াং ম্যান। মিছে কথা এবার ফাঁস হবে,' বলতে বলতে রিসিভারের দিকে হাত বাড়ালেন গালিভার। কানে ঠেকিয়ে ডায়াল করলেন। 'কে? ডেভিস? আমি নরম্যান। তিনটে ছেলে চুরি করে ঢুকেছে আমার বাড়িতে, বলছে তিন গোয়েন্দা...কি বললে?...হ্যাঁ হ্যাঁ, ওরকমই চেহারা...তাই নাকি?...ভেরি গুড। আচ্ছা, রাখি। গুড বাই।' রিসিভার নামিয়ে রেখে ফিরে চেয়ে হাসলেন আর্টিস্ট। 'নাহ্, ফাঁসাতে পারলাম না তোমাদের।' বল্লমটা নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখলেন

ঘরের কোণে। 'তা এখানে কি রহস্যের খোঁজে এসেছো?'

'মনে হলো পাহারায় ছিলেন,' ঘুরিয়ে কথা বললো কিশোর। 'নিশ্চয় চোর-টোরের খোঁজে। জ্বালাতন করছিলো বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'ছবি চোর?'

'তুমি কি করে জানলে? ঠিক চুরি নয়। আমাকে না জানিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো, আবার রেখে গেছে। সেজন্যেই তাড়িয়েছি ওকে। তবে আসল রহস্য সেটা নয়। ইদানীং কিছু ভূতুড়ে ছবির পাল্লায় পড়েছি।'

'ভূতুড়ে!' আঁতকে উঠলো মুসা।

'এছাড়া আর কি বলবো? আমার স্টুডিও এই খানিক দূরেই। কাল-পরশু দু'দিনই ঘটেছে ঘটনাটা। সকালে কাজ করতে গিয়ে দেখি সরে রয়েছে ছবিগুলো। যেখানে রেখেছিলাম, সেখানে নেই, অন্য জায়গায়। আরও কিছু জিনিসপত্রও অবশ্য নড়েছে। তবে কিছু চুরি যায়নি।'

'যে ছবিগুলো নড়ে, ওগুলো কি ওই ছবিটার সঙ্গের? যেটা নিয়ে গিয়ে আবার ফিরিয়ে দিয়েছে টেরিয়ার?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'হ্যাঁ। একটা জাঙ্কইয়ার্ড থেকে কিনেছিলাম।'

'তাহলে ভূতের ব্যাখ্যা বোধহয় দিতে পারি।' রিগ ডেনবার, কাউন্টেস, ফ্রেড ব্রাউন আর জন ফেরেনটির কথা বললো কিশোর। কয়েক দিনে যা যা ঘটেছে, তা-ও বললো। সবশেষে বললো, 'তাহলে বুঝতেই পারছেন, ছবিগুলো পরীক্ষা করে দেখার জন্যেই কেউ ঢুকেছিলো আপনার স্টুডিওতে।

'না, পারছি না,' মাথা নাড়লেন গালিভার। 'নাড়াচাড়া করা হয়েছে রাতের বেলা। আর রাতে, স্টুডিওর জানালা সব বন্ধ করে দিই আমি। দরজায় তালা লাগিয়ে রাখি।'

পনেরো

'চোর ঢোকার কোনো পথই রাখি না,' আবার বললেন গালিভার। 'দেখতে চাও?'

তিনজনেই জানালো, চায়।

চিতার খাঁচার পাশ কাটিয়ে, সরু বুনোপথের ভেতর দিয়ে আরেকটা পাথরের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো ওরা। জানালায় মোটা মোটা লোহার শিক। দরজার পাল্লা লোহার। বিরাট তালা লাগানো। ওটা খুলতে দক্ষ তালার মিস্ত্রীরও অন্তত একটি ঘন্টা ব্যয় হবে।

কাছে গিয়ে ভালোমতো তালাটা দেখলো কিশোর। কোনো দাগ নেই, সামান্যতম আঁচড়ও নেই। তার মানে জোর করে খোলা হয়নি তালা।

চাবি দিয়ে তালা খুললেন আর্টিস্ট।

ভেতরে ঢুকলো সবাই।

দরজার কব্জা ভেতরের দিকে, ওগুলোতেও কোনো দাগ নেই। আর, বাইরে থেকে ওই কব্জা ভাঙা অসম্ভব। ঘরের দরজাও ওই একটাই।

বেশ বড় ঘর। সাজানো স্টুডিও। যা যা জিনিস দরকার, সব আছে। তাক আছে অনেকগুলো, তাকে ছবি আঁকার সরঞ্জাম সাজিয়ে রাখা হয়েছে। দুটো জানালা, পাল্লাগুলো ভেতরের দিকে খোলে। একটা স্কাইলাইট দিয়ে আলো আসছে, ওটা খোলেই না। কোনো ফায়ার প্লেস নেই, স্টোভ নেই। এদিকের দেয়ালে ছোট একটা একজস্ট ফ্যান লাগানো, লম্বা কর্ড, সকেটে ঢোকানো প্লাগ। পাথরের নিরেট মেঝে, তলায় বেসমেন্ট বা কোনো ধরনের পাতালঘর নেই। দেয়াল বা মেঝের কোথাও একটা ফোকর নেই যে চোর ঢুকবে।

'ভূতেই তো নাড়ায় দেখছি!' বিড়বিড় করলো মুসা।

'ছবিগুলো কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'ওই তো, র‍্যাকে,' হাত তুলে দেখালেন গালিভার।

'দেখতে পারি?'

'নিশ্চয়। দেখো।'

সাবধানে ছবিগুলো নামালো কিশোর। বিশটা ছবিই আছে। এক এক করে পাশাপাশি সাজালো সে। 'ওই তাকে কেন রেখেছেন, স্যার? ওখানে তো সব বাতিল ক্যানভাস দেখছি।'

'বাতিলই তো। এগুলোও বাতিল বলেই কিনেছি। এগুলোর ওপর নতুন ছবি আঁকার জন্যে। অনেক আর্টিস্টই তাই করে।'

'হ্যাঁ, তা করে। তাহলে আপনার ধারণা, এই ছবিগুলো কোনো কাজের নয়?'

'আমার কাছে তো নয়। রিগ ডেনবারের নামও শুনিনি কোনোদিন। তবে, আঁকার হাত ছিলো লোকটার। ভাবতে অবাকই লাগে, লোকটা বিখ্যাত হলো না কেন? কেন তার নাম কেউ জানলো না?'

'ছবি কখনও বেচেনি তো, তাই,' মুসা বললো।

'হতে পারে। তবে দুনিয়া যে একজন ভালো আর্টিস্টকে হারালো, একথা মানতেই হবে।'

'আপনার কাছে এগুলোর দাম নেই,' কিশোর বললো। 'কিন্তু অন্য কারো কাছে হয়তো আছে? অনেক দাম দিয়ে কিনতে চায়? হতে পারে না এরকম?'

'পারে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন গালিভার। 'তবে সন্দেহ আছে। সেরকম বুঝলে আমিও নষ্ট করবো না। এই ছবিগুলো তেমন ভালো না, ঠিক, কিন্তু লোকটার হাত ছিলো অসাধারণ। ইচ্ছে করলে অনেক কিছু করতে পারতো সে। এই দেখো না, বিশটা ছবি বিশ রকম ভাবে এঁকেছে। যেন বিশজনের আঁকা। এই গুণটা অনেক বড় আর্টিস্টেরও থাকে না। ফলে একঘেয়ে হয়ে যায় তাদের ছবি।'

'তাহলে এই ছবিগুলোকে খারাপ বলছেন কেন?' প্রশ্ন করলো রবিন।

'কারণ, এগুলোতে কেমন যেন নকল নকল একটা ভাব। অন্য আর্টিস্টের স্টাইল চুরি করেছে ডেনবার, তার সঙ্গে নিজের কিছু মিশিয়েছে, পুরোপুরি নিজস্ব নয়। অ্যাডাপটেশন বলতে পারো।'

গভীর মনোযোগে ছবিগুলো দেখছে কিশোর। ফ্রেম নেই, সাধারণ কাঠে ক্যানভাসটা ছড়িয়ে আটকে নিয়ে ছবি আঁকা হয়েছে।

'এগুলোতে কিছু লুকানো নেই,' মুসা বললো। 'আর ছবিতে কোনো মেসেজও নেই।'

'না, নেই,' বললো কিশোর। চেয়েই রয়েছে ছবিগুলোর দিকে। প্রত্যেকটা ছবি যেন রেমুডা ক্যানিয়নের কটেজের প্রতিবিম্ব। 'কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছো? প্রত্যেকটাতে সিরিয়াল নম্বর দেয়া আছে।'

তাই তো! ভুরু কোঁচকালো মুসা। কিশোর বলার আগে নজরে পড়লো না কেন? একেই বলে সূক্ষ্ম দৃষ্টি। রবিন দেখলো। গালিভারও দেখলেন নম্বরগুলো।

ক্রমিক নম্বর অনুসারে ছবিগুলো পর পর সাজালো কিশোর। এক নম্বরটায় ক্লোজ-আপ, সবচেয়ে বড়, পরেরগুলোয় ধীরে ধীরে ছোট হয়ে গেছে। শেষ ছবিটায় এতো ছোট, ঘরের চেহারা অস্পষ্ট, প্রায় বোঝাই যায় না।

'তো, কি বোঝা যাচ্ছে?' ভুরু নাচালো মুসা।

'আমি কিছু বুঝছি না,' রবিন বললো।

'ভালো করে দেখো,' বললো কিশোর। 'ধীরে ধীরে ছোট করে ফেলা হয়েছে কটেজটাকে, সঙ্কুচিত। গাছপালা, পাথর, ক্যানভাসের চেয়ার, ডোরাকাটা ছাউনি, সব কিছুর আকার একই রকম রেখেছে, শুধু ছোট করেছে ঘরটাকে। এই যে দেখো না, শেষটায় ছাউনিটা ছাড়া ঘরের আর কিছুই বোঝা যায় না।'

'বেশ, দেখলাম। কিন্তু তাতে কি?' বললো মুসা।

'ভূতুড়ে ছবির সঙ্গে যোগ হলো সঙ্কুচিত ছবির রহস্য,' হাসলেন আর্টিস্ট। 'ঠেলা সামলাও এখন।'

'কিছু থাকলে এই ছবিগুলোতেই আছে,' আনমনে বললো কিশোর। 'রাতের

বেলা চোর এসে এজন্যেই এগুলোকে নাড়াচাড়া করে।'

'এখানে কেউ ঢুকতে পারে না, কিশোর।' জোর দিয়ে বললেন গালিভার।

'কিন্তু ছবি তো আর আপনাআপনি নড়তে পারে না। ভূত বলেও কিছু নেই।' লম্বা একটা বেঞ্চের ওপর বসে পড়লো কিশোর, পুরো বেঞ্চটাই ঢেকে রাখা হয়েছে বড় একটা কম্বল দিয়ে। স্টুডিওর ভেতরে চোখ বোলালো সে।

গালিভার বসলেন একটা কাউচে। রবিন আর মুসা বসলো দুটো আর্মচেয়ারে।

'চোর কে জানতে পারলে হতো,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর। 'তাহলে হয়তো বুঝতাম, ছবিগুলো তার কেন দরকার?'

'জানার উপায় কি?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

উঠে, স্টুডিওর একমাত্র দেয়াল আলমারিটার দিকে এগিয়ে গেল গোয়েন্দা-প্রধান। পাল্লা খুললো। আলমারির ওপর দিকে দুটো তাক। নিচের অংশটা বড়। ওপরের তাকে আর নিচে সাজানো রয়েছে রঙের কৌটা, ব্রাশ, ছবি আঁকার অন্যান্য সরঞ্জাম। পেছনে নিরেট পাথরের দেয়াল। ফিরে তাকালো সে। 'জানার একটাই উপায়। আমাদের কাউকে লুকিয়ে থাকতে হবে এখানে।'

'বেশ,' বললেন গালিভার, 'আমিই থাকবো।'

'না, আপনি থাকলে হবে না। দরজা-জানালা বন্ধ করে চোরকে দেখিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে আপনাকে। নইলে সে আসবেই না।'

'তাহলে কে থাকবে?'

'আমাদের একজন। মুসা, তুমি থাকবে। আপত্তি আছে?'

'না। তোমরা কি করবে?'

'আমাদের অন্য কাজ আছে। ভয় পাবে না তো?'

'ভূত হলে পাবো। আর চোর এলে তো ধরে কিলই শুরু করবো। ভয় কিসের?'

হেসে উঠলো কিশোর আর রবিন। এমনকি আর্টিস্টও লাল দাড়ি নাচিয়ে হাহ্ হাহ্ করে হাসলেন। 'ভূত হলেও ভয় নেই। বাইরেই লুকিয়ে থাকবো আমরা। তোমার চিৎকার শুনলেই এসে পড়বো।'

কিভাবে পাহারা দেয়া হবে, তার একটা ছক তৈরি করে সবাইকে শোনালো কিশোর। তারপর দুই সহকারীকে নিয়ে বেরিয়ে এলো স্টুডিও থেকে। বাড়ি ফিরে চললো।

তাড়াতাড়ি ডিনার সেরে আবার গালিভারের বাড়িতে রওনা হলো কিশোর আর মুসা। রবিন আসতে পারলো না, জরুরী কাজে তাকে ডেকে নিয়ে গেছেন মা। ঘন বনের ভেতর দিয়ে নীরবে এগিয়ে চললো দু'জনে। থামলো এসে স্টুডিওর

সামনে। চুপ করে বসে রইলো কিছুক্ষণ। সন্দেহজনক আওয়াজের আশায় কান পেতে রইলো। কিছু শোনা গেল না। মুসার গায়ে কনুই দিয়ে গুঁতো দিলো কিশোর।

ঝোপ থেকে বেরিয়ে এক ছুটে খোলা দরজা দিয়ে স্টুডিওতে ঢুকে পড়লো মুসা। আলমারির ভেতর লুকিয়ে বসলো। পাল্লা ফাঁক করে রাখলো কয়েক ইঞ্চি। যাতে ঘরের ভেতর চোর ঢুকলে দেখতে পায়।

সূর্য ডোবার আগে আগে শব্দ করে জানালা বন্ধ করলেন গালিভার। বাইরে বেরিয়ে দরজায় তালা দিলেন। রোজকার মতোই। তারপর চললেন বাড়ির দিকে।

ষোল

বাইরে রাত নামছে। আলমারির ভেতরে কি আর আরাম করে বসা যায়? বেকায়দা অবস্থায়ই রয়েছে মুসা। এভাবে বেশিক্ষণ থাকলে হাত-পায়ে খিল ধরে যাবে, নিদেনপক্ষে ঝিঁঝি যে ধরবে, তাতে তার কোনো সন্দেহ নেই।

এক ঘন্টা পেরোলো।

কিছুই ঘটলো না। আলমারিতে বসে থাকতে খুব খারাপ লাগছে মুসার। বন্ধ ঘর, গরম হয়ে উঠছে। আলমারির ভেতরে গুমোট আরও বেশি। বাইরের খোলা বাতাসে কিশোর আর গালিভার বেশ আরামে রয়েছে ভেবে কষ্ট যেন বেড়ে গেল তার। অবশ হয়ে আসছে পা।

খিদে পেলো তার। সঙ্গে করে স্যাণ্ডউইচ নিয়ে এসেছে। বের করে খেতে শুরু করলো।

পেরোলো আরও এক ঘন্টা।

ঝোপের ভেতর আলোআঁধারি সৃষ্টি করেছে উজ্জ্বল জ্যোৎস্না। ঘাপটি মেরে বসে দরজার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর আর গালিভার।

দশটা বাজলো। ইতিমধ্যে কাউকে দেখা গেল না। নীরব স্টুডিও।

অস্বাভাবিক কিছু ঘটছে না। খাঁচার ভেতরে চিতাবাঘটার পদচারণা, মাঝে মাঝে চাপা গোঙানি। পোকামাকড়ের ডাক আর নিশাচর ছোট ছোট জীবের আনাগোনা ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

একভাবে বসে থেকে পা ব্যথা হয়ে গেছে। এক পা থেকে আরেক পায়ে শরীরের ভার বদল করলো কিশোর।

কিছুই ঘটছে না।

ঘুম তাড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে মুসা। এই বেকায়দা অবস্থা আর অসহ্য গরমেও চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছে তার। কেমন যেন শূন্য লাগছে মাথার ভেতরটা। এমন তো হয় না! এতো খারাপ লাগছে কেন?

কিছুতেই খুলে রাখতে পারছে না চোখের পাতা। দু'বার ঢলে পড়লো তন্দ্রায়। তৃতীয়বার দীর্ঘ তন্দ্রা থেকে চমকে জেগে উঠে মাথা ঝাড়া দিলো। হঠাৎ বুঝতে পারলো, এরকম লাগার কারণটা।

বাষ্প!

আলমারি ভরা রঙ, রঙ গোলানোর তেল আর অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য। ভ্যাপসা গরমে ওগুলো থেকে বাষ্প বেরোচ্ছে, বিষাক্ত করে তুলছে আলমারির বাতাস। আর সেই বাতাস ফুসফুসে ঢোকাতেই এই অস্বাভাবিক তন্দ্রা।

ভাবতে ভাবতেই আবার ঘুমিয়ে পড়লো মুসা। কতোক্ষণ পরে জানে না, চোখ মেললো। ঘোলাটে হয়ে আছে মাথার ভেতর, ফলে দৃষ্টি অস্বচ্ছ।

ঘরের ভেতরে ঢুকেছে কিছু একটা! স্কাইলাইট দিয়ে চাঁদের আলো আসছে, সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে বটে ওটাকে, কিন্তু স্পষ্ট নয়।

মাথা ঝাড়া দিলো মুসা। সে-কি জেগে আছে? নাকি এখনও ঘুমিয়ে? আশ্চর্য এক ধরনের অনুভূতি! ঘন তরলের মাঝে সাঁতার কাটছে যেন তার মন। কিছুতেই পরিষ্কার হচ্ছে না।

স্টুডিওর ভেতরে নড়ছে কিছু। চাঁদের আলোয় হালকা একটা কি যেন, ভেসে বেড়াচ্ছে! কাঁপা কাঁপা একটা মূর্তি নিচু হয়ে যেন তুলে নিলো একটা ছবি, ভাসতে ভাসতে এগিয়ে গেল জানালার কাছে, পলকে বাতাসে মিলিয়ে গেল যেন ছবিটা!

ভূতুড়ে মূর্তিটা দাঁড়িয়েই রয়েছে জানালার কাছে। নড়ে না আর। যুগ যুগ বুঝি পেরিয়ে যাচ্ছে। কিছু একটা করা দরকার। কিন্তু পুরোপুরি সজাগই হতে পারছে না মুসা, ভয়াবহ এক দুঃস্বপ্ন, একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে যেন।

আবার ছবিগুলোর কাছে ফিরে এলো মূর্তিটা। নিচু হয়ে তুলে নিলো আরেকটা ছবি। আবার গেল জানালার কাছে। গায়েব হয়ে গেল ছবিটা।

দাঁড়ানোর চেষ্টা করলো মুসা। পা নড়তে চাইছে না।

তার দিকে ভেসে আসছে মূর্তিটা।

গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠতে চাইলো মুসা।

চাপা চিৎকার শুনতে পেলো কিশোর আর গালিভার। স্টুডিওর ভেতর থেকে এসেছে।

লাফ দিয়ে উঠে দরজার দিকে দৌড় দিলো দু'জনে।

তাড়াতাড়ি তালা খুললেন গালিভার।

বাইরের আলোর তুলনায় ঘরের ভেতরে অন্ধকার। দরজার পাশেই সুইচ বোর্ড। আলো জ্বেলে দিলো কিশোর।

শূন্য ঘর।

আলমারির কাছে ছুটে গেল দু'জনে। মেঝেতে বসে রয়েছে মুসা। মাথা ঝুলে পড়েছে বুকের ওপর। সাড়া পেয়ে অনেক কষ্টে সোজা করলো। চোখে উদভ্রান্ত দৃষ্টি।

'সর্বনাশ! সলভেন্ট আর থিনারের বাষ্প!' চেঁচিয়ে উঠলেন আর্টিস্ট। 'ধরো ধরো, বের করো ওকে।'

টেনে আলমারি থেকে বের করা হলো মুসাকে। দাঁড়াতে পারছে না। অসাড় হয়ে গেছে পা।

বগলের নিচে ধরে জোর করে তাকে দাঁড় করালো দু'জনে মিলে। হাঁটানোর চেষ্টা করলো। ধীরে ধীরে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয়ে এলো, দাঁড়াতে পারলো মুসা। জোরে নিঃশ্বাস ফেললো।

'কি হয়েছিলো?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'ভালোই ছিলাম,' ক্লান্ত কণ্ঠে বললো মুসা, 'কখন জানি ঘুম এসে গেল! চোখ খুলে রাখতে পারলাম না কিছুতেই। তন্দ্রার ঘোরেই দেখলাম ভূতটাকে...'

'আরি!' চেঁচিয়ে উঠলো কিশোর। জানালার দিকে চেয়ে আছে।

একদিকের জানালার নিচে পড়ে রয়েছে ডেনবারের একটা ছবি। জানালার পাল্লা খোলা!

'বললাম না, ভূত!' কেঁপে উঠলো মুসা। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। ধপ করে বসে পড়লো কম্বলে ঢাকা বেঞ্চটার ওপর। ধীরে ধীরে জানালো, কি করে ছবি সরিয়েছে ভূতটা।

'নিশ্চয় কেউ ঢুকেছিলো,' বললো কিশোর।

'আমিও তো তা-ই বলছি ভূত!'

'আরে দূর!' হাত নাড়লো কিশোর। 'তুমি তো ছিলে আধাবেহুঁশ হয়ে। মানুষটাকেই ভূত ভেবেছো।'

'তাহলে মানুষটা কোথায়?' দাড়ি নাচালেন গালিভার। 'ঢুকলো কিভাবে? ওই জানালা দিয়ে কেউ ঢুকতে পারবে না।'

'অন্য কোনো পথ দিয়ে ঢুকেছে।' হঠাৎ চকচক করে উঠলো চোখ। 'ওই যে, ওই দেখুন!'

তাকালো মুসা আর গালিভার। একজস্ট ফ্যানটা যেখানে ছিলো, সেখানেই এখন একটা চৌকোণা ফোকর। ফ্যানটা নেই। টানটান হয়ে রয়েছে তার, প্লাগটা সকেটেই ঢোকানো।

এগিয়ে গিয়ে তার ধরে আস্তে টানলো কিশোর। বাইরের দেয়ালে ঘষা লেগে মৃদু শব্দ হলো। 'ফ্যানের স্ক্রু ঢিল করে রাখা হয়েছিলো, মিস্টার গালিভার। বাইরে থেকে সহজেই খুলে ফেলেছে "ভূতটা"। ফোকরের ভেতর দিয়ে টেনে নিয়ে গিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছে কর্ডে।'

'কিন্তু কিশোর,' প্রতিবাদ করলো মুসা, 'গর্তটা দেখছো না কতো ছোট? বড় জোর একফুট বাই একফুট। ওখান দিয়ে মানুষ ঢুকতে পারবে না।'

'পারবে, যদি তোমার মতো শরীর বড় না হয়। এমন কেউ ঢুকেছে, যার শরীর খুব সরু।'

হাঁ করে ফোকরটার দিকে চেয়ে আছেন আর্টিস্ট। মাথা নাড়ছেন আস্তে আস্তে, বিহ্বল হয়ে গেছেন যেন।

'এখন আরেকটা কথা,' তর্জনী নাড়লো কিশোর। 'মুসা চেঁচিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এসে ঢুকেছি। এতো তাড়াতাড়ি পালাতে পারেনি চোর।'

ঘরের চারপাশে চোখ বোলালেন গালিভার। 'তাহলে গেল কোথায়? এখানে তো নেই।'

'কই?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

মুসার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো কিশোর।

'কি হলো?'

'জানি, কোথায় আছে,' শান্তকণ্ঠে বললো কিশোর।

'কোথায়?'

'ওর ওপরই বসে আছে।'

ছিটকে সরে এলো মুসা, যেন বোলতায় হুল ফুটিয়েছে। বড় বড় চোখ করে তাকালো কম্বলে ঢাকা বেঞ্চটার দিকে।

ভারি গলায় ডাকলো কিশোর, 'এই, বেরিয়ে এসো। আমি জানি, তুমি আছো ওখানে।'

এক মুহূর্ত নীরবতা। তারপর নড়ে উঠলো কম্বল। উঁকি দিলো একটা মুখ।

চোখ মিটমিট করলেন গালিভার।

'শুঁটকি!' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা।

সতেরো

ঘরের কোণে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে রয়েছে টেরিয়ার। চেহারা ফ্যাকাশে। মোটা একটা ডাণ্ডা নিয়ে তার কাছে দাঁড়িয়ে আছে মুসা। উঠলেই মারবে বাড়ি।

'ওখানে ঢুকেছে, কি করে বুঝলে?' জিজ্ঞেস করলেন গালিভার।

'কম্বলটা সরানো দেখলাম,' জবাব দিলো কিশোর। 'বিকেলে অন্যরকমভাবে রাখা ছিলো।'

টেরিয়ারের দিকে ঘুরলেন গালিভার। 'শেষ পর্যন্ত চুরি করতে ঢুকেছো?'

'আমাকে বরখাস্ত করলেন কেন?' তেজ দেখিয়ে বললো টেরিয়ার।

'তাই বলে চুরি করবে? আর বরখাস্ত কি অন্যায়ভাবে করেছি? আমাকে না জানিয়ে ছবি নিয়ে গেলে...'

'ফেরত দিয়েছি আবার। মেরে তো দিইনি।'

'ওই ছবি তোমার কি দরকার? এতো আগ্রহ কেন?'

'সেকথা আপনাকে বলতে যাবো কেন?'

'জানালা দিয়ে পাচার করতে চেয়েছো,' বললো কিশোর। 'কার কাছে? ছবিগুলো নিয়ে সে কি করবে?'

'আমি কিচ্ছু বলবো না।'

'লোকটা কি জন ফেরেনটি?' ডাণ্ডা নাচালো মুসা।

আড়চোখে ডাণ্ডার দিকে তাকালো টেরিয়ার। 'নামই শুনিনি।'

'দেখো ছোকরা,' ধৈর্য হারালেন গালিভার। 'বেশি বাড়াবাড়ি কোরো না। চুরি করতে ঢুকেছো, হাতেনাতে ধরা পড়েছো। পুলিশকে ফোন...'

'পু-পুলিশ!' আঁতকে উঠলো টেরিয়ার। 'দোহাই আপনার, ফোন করবেন না। বাবা তাহলে মেরে ফেলবে...'

'খবরদার!' জানালার বাইরে থেকে বলে উঠলো একটা চাপা কণ্ঠ, 'কেউ নড়বে না। আমার হাতে পিস্তল আছে। টেরিয়ার, জলদি বেরোও!'

কণ্ঠস্বরটা চেনা গেল না, বিকৃত।

নড়লো না কেউ, শুধু টেরিয়ার উঠে দাঁড়ালো। ছুটে বেরিয়ে গেল। ঝনঝন করে বন্ধ হয়ে গেল লোহার দরজা।

'গেল!' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। 'এতো কষ্ট সব বিফল।'

'যাবে কোথায়?' সান্ত্বনা দিলেন গালিভার। 'দরকার হলে পুলিশকে জানাবো। বাড়ি থেকে গিয়ে ধরে আনবে।'

'চোর কে, সেটা জানা গেল,' বললো কিশোর। 'আরও বোঝা গেল, কারও সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করছে টেরিয়ার। কিন্তু কার সঙ্গে, কেন করছে জানি না। ডেনবারের ছবি দিয়ে ওই লোকটা কি করবে?'

'চুরির উদ্দেশ্য ছিলো না,' জানালার নিচের ছবিটা দেখিয়ে বললো মুসা। 'শুটকি দিয়েছে, লোকটা নিয়ে আবার ফিরিয়ে দিয়েছে। সেটা আরেক রহস্য!'

ছবিটা তুলে আনলো কিশোর। মাথা নেড়ে বললো, 'কোনো মেসেজ আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না···স্যার, দেখুন তো! এই কোণটা ভিজে লাগছে!'

'ভেজা?' ছুঁয়ে দেখলেন গালিভার। 'তাই তো। রিটাচ করেছে।'

'কেন করলো?' মুসাও ছুঁয়ে দেখলো।

ভিজে কোণটা ডলে দেখলেন গালিভার। 'নিচে অন্য কোনো ছবি আঁকা রয়েছে কিনা দেখেছে হয়তো। তারপর আবার রঙ দিয়ে রিটাচ করে আগের মতো করে রেখেছে।'

ছবিটার দিক থেকে চোখ সরালো না কিশোর। বিড়বিড় করলো, 'অন্য কোনো ছবি···!' ঝট করে মুখ তুললো। 'স্যার, টেলিফোন কোথায়? এখুনি দরকার। জরুরী!'

আধ ঘন্টা পর। বাড়ির সদর দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন গালিভার, কিশোর আর মুসা। রিকিকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে করে এলেন প্রফেসর হোফার।

আর্টিস্টের সঙ্গে প্রফেসরের পরিচয় করিয়ে দিলো কিশোর।

'কি হয়েছে, কিশোর?' জানতে চাইলো রিকি।

'চলো, স্টুডিওতে। বলছি।'

ডেনবারের ছবিগুলো দেখেই চিনতে পারলেন প্রফেসর আর তাঁর ছেলে।

'পেয়ে গেছো!' চেঁচিয়ে উঠলো রিকি।

'কাউন্টেসকে জানিয়েছো?' জিজ্ঞেস করলেন প্রফেসর। 'শুনে খুশি হবেন।'

'এখনও জানাইনি,' জবাব দিলো কিশোর। 'আপনাদের ফোন করেছি, তার কারণ, আমার ধারণা ছবিগুলো খুবই মূল্যবান। অনেকেই চাইবে।'

'চাইবে?' মুসার কণ্ঠে সন্দেহ।

'হ্যাঁ। রিকি, অ্যাডোবের সেই সোনালি ফ্রেমটা···বলেছিলে, একসময় ওটাতে একটা ছবি লাগানো ছিলো।'

'সোনালি ফ্রেম!' প্রফেসর বললেন। 'কই, ওরকম ফ্রেম লাগানো কোনো ছবি দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না?' ছেলের দিকে তাকালেন প্রফেসর।

'বাবা,' রিকি বললো, 'রিগ ডেনবার যখন প্রথম আমাদের বাড়িতে এলো,

একদিন হঠাৎ করেই দেখে ফেললাম। চমকে গেল বুড়ো। জানালো, ওটা নাকি একটা ইমিটেশন, প্রিন্ট, ফেলে দেবে। তারপর আর একবারও দেখিনি। ফ্রেমটাই শুধু পড়ে ছিলো অ্যাডোবে।'

'ছবিটা কেমন ছিলো?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

মাথা চুলকালো রিকি। 'এই, পাহাড়-পর্বত, ঘোড়া, পাম গাছ, ঘাসের কুঁড়ের সামনে কয়েকজন প্রায় উলঙ্গ মানুষ···পাহাড়ের রঙ বেগুনী, ঘোড়াগুলো নীল, পাম গাছ হলুদ, আর মানুষগুলো লাল···'

'কী!' চেঁচিয়ে উঠলেন গালিভার। চকচক করছে চোখ। 'সত্যি ওরকম ছিলো?'

'হ্যাঁ। উল্টোপাল্টা রঙ।'

'ছবিটা চিনতে পেরেছেন, স্যার?' কিশোর বললো।

'এক মিনিট!' তাড়াতাড়ি গিয়ে তাক থেকে বিরাট একটা বই নামালেন আর্টিস্ট। দ্রুত পাতা উল্টে এক জায়গায় এসে থামলেন। 'এই যে। রিকি, এরকম ছিলো ছবিটা?'

একনজর দেখেই বলে উঠলো রিকি, 'হ্যাঁ, অবিকল এরকম।'

'কি জিনিস দেখেছো তুমি জানো না, রিকি! ওটা বিখ্যাত এক ফ্রেঞ্চ আর্টিস্ট ফ্র্যাঙ্কোই ফরচুনার্দ-এর আঁকা। একটা মাস্টার পীস। জার্মানরা দেখতে পারতো না তাঁকে। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁর আঁকা যতো ছবি পেয়েছে নষ্ট করে দিয়েছে নাৎসী সৈন্যরা। কি বলবো তোমাদেরকে, ছবির জগতে এ-এক অসামান্য ক্ষতি···,' মুখের ভাব দেখে মনে হলো কেঁদে ফেলবেন বুঝি শিল্পী। 'যা-ই হোক, একটা ছবিও যদি অন্তত পাওয়া যায়···রিকি, কি বলেছিলো ডেনবার? প্রিন্ট? কিন্তু ওই ছবিটার তো কোনো প্রিন্ট হয়েছিলো বলে জানি না!'

'তাহলে ওটা আসল,' বললো কিশোর। 'কোনোভাবে বুড়ো ডেনবারের হাতে এসে পড়েছিলো?'

'খাইছে!' গালিভারের দিকে তাকালো মুসা। 'দাম আন্দাজ কতো হতে পারে?'

'অনেক, অনেক টাকা। এসব জিনিসের দাম কতো উঠবে, আন্দাজ করা মুশকিল। কিশোর, তুমি সত্যি ভাবছো···'

'ভাবছি না, স্যার। আমি শিওর। প্রলাপ বকার সময় "মাস্টার" শব্দটা বলেছে ডেনবার। তারমানে বলতে চেয়েছে মাস্টার পীস। অর্থাৎ ছবিটা আসল। আমার মনে হয়, ওই বিশটা ছবির কোনোটার নিচে লুকানো···'

কিশোরের কথা শেষ হওয়ার আগেই ঘুরে দাঁড়ালেন গালিভার। সলভেন্ট,

নরম কাপড় আর আরও কিছু সরঞ্জাম নিয়ে কাজে বসে গেলেন। একটা একটা করে ছবি নিয়ে খুব সাবধানে ঘষে দেখলেন কোণের দিকটায়। তারপর আবার আগের মত রিটাচ করে রাখলেন।

আধ ঘন্টা পর নিরাশ হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'না, নেই। কিশোর, তোমার ভুল হয়েছে। আসল ছবিটা নেই।'

ঠোঁট কামড়ালো কিশোর। 'ভুল আমি করিনি, স্যার। এগুলোর নিচে যখন নেই, নিশ্চয় অন্য কোথাও আছে আর এই ছবিগুলো তার চাবিকাঠি, আমার তা-ই বিশ্বাস।'

এগিয়ে এলেন প্রফেসর। 'অনেক রাত হয়েছে। ছবিগুলো আমি নিয়ে যাই। কাল কাউন্টেসকে দিয়ে দেবো। আপনার যা খরচ হয়েছে, সেটা আমি দিয়ে দেবো, মিস্টার গালিভার।'

প্রফেসরের গাড়িতে ছবিগুলো তুলে দিতে সাহায্য করলো ছেলেরা।

প্রফেসর আর রিকি চলে গেলে গোয়েন্দাদের বললেন গালিভার, 'তোমরা এখানেই থেকে যাও। এতো রাতে আর গিয়ে কাজ নেই। বাড়িতে ফোন করে দাও।' এক মুহূর্ত চুপ থেকে বললেন, 'কাল সকালে দেখবো, শুঁটকির ব্যাপারে কি করা যায়।'

আঠারো

পরদিন সকালে। হেডকোয়ার্টারে বসে আছে কিশোর আর রবিন।

'আমারও মনে হয়,' রবিন বললো। 'আসল ছবিটা পায়নি ডেনবার। আমিও যতোদূর জানি, ফরচুনার্দের সব ছবি নষ্ট করে ফেলেছিলো নাৎসীরা।'

'কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওই একটা ছবি নষ্ট করতে পারেনি। ডেনবারের হাতে পড়েছিলো। রিকি দেখে ফেলেছিলো। তাকে মিথ্যে বলেছে বুড়ো, বলেছে ওটা প্রিন্ট। তারপর, যখন অসুখে পড়লো, ঘোরের মধ্যেই একটা মেসেজ রেখে যাওয়ার চেষ্টা করলো। জানাতে চাইলো, ছবিটা কোথায় লুকিয়েছে।' কাগজের পাতাটা আবার বের করলো কিশোর। আঁকাবাঁকা' বলে দিক নির্দেশ করতে চেয়েছে বুড়ো, বুঝলাম। কিন্তু 'ভুল মনে হবে' বলে কি বোঝাতে চেয়েছে? ভুল কিছু খুঁজতে বলেছে হয়তো। এমন কিছু, দেখে যা মনে হয়, হয়তো আসলে তা নয় ওটা।'

'ভুলভাবে কিছু করা হয়েছে বলছো?'

'তা-ই। মাস্টার মানে মাস্টার পীস। আমার ছবি, আমার ক্যানভাস, আর

ক্যানভাস থেকে আঁকাবাঁকা, এই কথাগুলো বলে নিশ্চয় বোঝাতে চেয়েছে তাঁর কুড়িটা ছবির মধ্যেই রয়েছে ধাঁধার সূত্র। ওই ছবিগুলোই বলে দেবে কোথায় রয়েছে আসল ছবিটা।'

'তাহলে সূত্রটা কি?'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো কিশোর। 'সেটাই তো বুঝতে পারছি না। সব চেয়ে বেশি যেটা চোখে লেগেছে, ছবিগুলোতে কটেজটার আকার। ধীরে ধীরে ছোট করে ফেলা হয়েছে। অথচ আশপাশে আর যা যা রয়েছে, সব কিছুর আকার একই রেখেছে। কেন?'

ভাবছে রবিন। কিছু বুঝতে পারছে না।

'মুসা আসুক,' বললো কিশোর। 'দেখি, শুঁটকি ওদেরকে কি বলে?'

'ও-ব্যাটা বলবে?'

'মিস্টার গালিভার সঙ্গে গেছেন তো। পুলিশের ভয় দেখালে হয়তো বলবে।'

'আমার মনে হয় না।'

'সেটা মুসা এলেই জানা যাবে।...আচ্ছা, রবিন, আরেকটা কথা মনে আছে তোমার? রিকিকে নাকি বলেছিলো ডেনবারঃ আমি দুনিয়ার সব চেয়ে দামী আর্টিস্ট! কিন্তু কেউ সেটা জানে না! তারপর হেসে উঠেছিলো বুড়ো। কেন হাসলো? কি বোঝাতে চেয়েছিলো?'

'হয়তো মাস্টার পীসটা তার কাছে ছিলো বলে...'

'ভেবেছি সেকথা। কিন্তু তার কথার ধরনে তো মনে হয়, নিজের ছবিগুলোর কথাই বলেছে সে। ওগুলো অনেক দামী, এবং কেউ সেটা জানে না।'

'কিশোর, মেসেজটা কার জন্যে রেখে গিয়েছিলো...'

ট্রেলারের নিচে শব্দ হলো। দুই সুড়ঙ্গের ঢাকনা উঠে গেল। ভেতরে ঢুকলো মুসা। দুই বন্ধুর দিকে চেয়ে মাথা নাড়লো। 'পাওয়া যায়নি। শুঁটকি গায়েব। কাল রাতে বাড়ি ফেরেনি। তার মায়ের ধারণা, শুঁটকিকে কিডন্যাপ করা হয়েছে।'

'কিডন্যাপ!' ভুরু কোঁচকালো রবিন।

'কে করেছে?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'শুঁটকির মা জানে না। বললো, তাদের বাড়ির আশপাশে নাকি একটা নীল সেডানকে ঘুরঘুর করতে দেখেছে। আর ওই গাড়ির লোকটার সঙ্গে কথা বলেছে শুঁটকি।'

'জন ফেরেনটি!' বললো কিশোর।

'শুঁটকির মা আরও বললো, ওদের টেলিফোন লাইনও নাকি ট্যাপ করা হয়েছে। সেটা তো আমরাই করতে দেখেছি।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝোঁকালো কিশোর। নিচের ঠোঁটে জোরে জোরে চিমটি কাটলো কয়েকবার। 'ওর কিডন্যাপ হওয়াটা একটা কথাই প্রমাণ করে, শুঁটকি অনেক কিছু জানে। তাই তাকে ধরে নিয়ে গেছে। কাউকে যাতে কিছু বলতে না পারে।'

'মেরে না ফেলে!' বললো রবিন।

'ফেলতেও পারে! ওর জন্যে আমাদের কিছু করার নেই। সেটা পুলিশ দেখবে। চলো এখন, রেমুডা ক্যানিয়নে যাবো।'

উনিশ

সাইকেল চালাতে চালাতে জানালো মুসা, শুঁটকিকে বাড়িতে না পেয়ে থানায় গেছেন মিস্টার গালিভার। রাতে তাঁর স্টুডিওতে যেসব ঘটনা ঘটেছে, জানানোর জন্যে। শুঁটকির বাবাও নাকি গেছে পুলিশের কাছে, ছেলে নিঁখোজ হয়েছে—সেকথা জানাতে।

ক্যানিয়নে পৌঁছলো তিন গোয়েন্দা।

কটেজের চত্বরে দাঁড়িয়ে ছিলো রিকি, ওদেরকে দেখে দৌড়ে এলো। উত্তেজিত। বললো, 'জানো, আজ সকালেও কে জানি এসে কটেজে ঢুকেছিলো! তছনছ করে দিয়ে গেছে।'

'ছবিগুলো কটেজে রেখেছিলে?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'না, আমাদের ঘরে। সকালে কাউন্টেসকে ফোন করার চেষ্টা করেছে বাবা, পায়নি। তারা নাকি বাইরে গেছে। শেষে, বাবা গাড়ি নিয়ে নিজেই গেছে। মোটেলে বসে থাকবে। কাউন্টেস ফিরলেই তাঁকে ধরবে, জানাবে ছবিগুলোর কথা।'

'সকালে কাউকে দেখেছো এখানে?'

'হ্যাঁ। গ্যারেজের কাছে। পলকের জন্যে দেখেছি, চিনতে পারিনি। ছুটে চলে গেল নালার দিকে। তারপরই গিয়ে দেখলাম কটেজের ওই অবস্থা।'

'গ্যারেজের আশপাশে দেখেছো?' মুসা জিজ্ঞেস করলো।

'না।'

'চলো, দেখি গিয়ে,' বললো রবিন।

অনেক খুঁজলো ওরা, কিছু পেলো না। কিছুটা নিরাশ হয়েই এসে দাঁড়ালো গ্যারেজের সামনে।

'কোনো চিহ্ন রেখে যায়নি ব্যাটা,' হাত নাড়লো রবিন।

'না,' বললো কিশোর। এমনকি পায়ের ছাপও না। চলো, কটেজে। দেখি...'

মৃদু একটা শব্দ শোনা গেল। একে অন্যের দিকে তাকালো ওরা। সকালের রোদ এসে পড়েছে চোখেমুখে। অদ্ভুত শব্দ! গোঙানির মতো। যেন গলা টিপে ধরা হয়েছে।

'কী?…' বললো রিকি।

'শ্ শ্ শ্!' তাকে থামিয়ে দিলো কিশোর।

আবার হলো শব্দটা। কাছেই কোথাও।

কান খাড়া করলো মুসা। অন্য তিনজনের চেয়ে তার শ্রবণশক্তি জোরালো। 'গ্যারেজের ভেতরে!' বলেই দৌড় দিলো দরজার দিকে। কিন্তু দরজা বন্ধ। তালা লাগানো।

চেঁচিয়ে বললো রিকি, 'এসো, আরেকটা দরজা আছে পাশে।'

এই দরজাটাতেও ভারি তালা আটকানো।

'এটাও তো বন্ধ!' জিজ্ঞেস করলো রবিন, 'চাবি আছে?'

'আছে…' বলতে বলতেই দরজার পাশের একটা খোপ থেকে চাবি বের করলো রিকি। তালাটা খুললো।

হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকলো চারজনে। প্রথমে কিছু চোখে পড়লো না, দরজার কাছে ফেলে রাখা কয়েকটা যন্ত্রপাতি আর কাঠ ছাড়া।

কোণের কাছে নড়ে উঠলো কি যেন। গোঁ গোঁ করলো।

ছুটে গেল ওরা।

'শুঁটকি!' চমকে উঠলো রবিন।

হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে। মুখে রুমাল গোঁজা। গোঙানো ছাড়া আর কোনো শব্দ করতে পারছে না। বাঁধন খুলে দিতে উঠে বসলো টেরিয়ার।

'কি হয়েছিলো, শুঁটকি?' পাশে বসে জিজ্ঞেস করলো মুসা।

কেঁপে উঠলো টেরিয়ার। বাঁধনের জায়গাগুলো ডলছে। 'তো-তোমরা আমাকে বাঁচালে…!' গলা ভীষণ কাঁপছে ওর। 'সরি! তোমাদেরকে সব সময় শত্রু ভাবি…'

'তা তো ভাবোই,' মুসা বললো। 'এখান থেকে বেরিয়েই আবারও ভাবতে শুরু করবে। সরি-ফরি বাদ দাও। কি হয়েছিলো, তা-ই বলো।'

'সারা রাত ছিলে কোথায়? এখানেই?' প্রশ্ন করলো কিশোর।

'না,' বললো টেরিয়ার। 'আমাকে নিয়ে এলো। হাত-পা বাঁধলো। ওদিকে একটা নালার কাছে। না দেখে নালার পাড়ে গিয়েছিলাম। নেমে এসে আমাকে বাঁধলো সে। খুব একচোট হেসে বললো, সবাই নাকি একবার করে পড়েছে ওই নালায়। আমার দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই।'

'তা পড়েছে!' মাথা দোলালো কিশোর। অকস্মাৎ গম্ভীর হয়ে গেছে।

'সারা রাত নালার মধ্যে ফেলে রাখলো,' আবার বলে চললো টেরিয়ার। 'সকালে এনে ঢোকালো এখানে। বাইরে থেকে তালা দিয়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ আগে অনেক শব্দ শুনলাম। ভয়ে রা করিনি। ভেবেছি, ও-ই আবার এসেছে। তারপর শুনলাম তোমাদের গলা…তখন চিৎকার করার চেষ্টা করলাম…'

'খুব ভালো করেছো,' টিটকারির ভঙ্গিতে বললো মুসা। 'কেন, দোস্তের সঙ্গে তো খুব ভাব হয়ে গিয়েছিলো। ধরে বাঁধলো কেন…'

'আহ্, মুসা, এখন ওসব কথা রাখো তো,' বাঁধা দিয়ে বললো কিশোর। 'তা শুঁটকি, লোকটা…'

দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল খোলা দরজাটা। তালা লাগানোর শব্দ হলো। জানালাশূন্য অন্ধকার গ্যারেজে বন্দি হলো এখন পাঁচজন।

চেঁচিয়ে ডাকলো রিকি।

কেউ সাড়া দিলো না।

ছুটে গিয়ে সামনের দরজার ফোকরে চোখ রাখলো কিশোর। কে দরজা বন্ধ করলো, দেখতে চায়। রিকি, রবিন, আর মুসাও ছুটোছুটি করে গিয়ে যে যেখানে পারলো, চোখ রাখলো।

'আমি দেখছি!' বলে উঠলো রিকি। পাশের দরজাটার ফ্রেমের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আছে সে।

দরজাটার পাশে ফাঁকফোকর আরও আছে। ওগুলোতে চোখ রাখলো তিন গোয়েন্দা। সকালের রোদে স্পষ্ট দেখা গেল লোকটাকে। বেঁটে, ভারি শরীর। এদিকেই ভুরু কুঁচকে চেয়ে রয়েছে ওলন্দাজ আর্ট ডিলার, জন ফেরেনটি।

'মিস্টার ফেরেনটি,' চেঁচিয়ে বললো রিকি। 'আমাদের ছেড়ে দিন!'

'আমরা জানি, আপনি কি খুঁজছেন!' বললো রবিন।

গ্যারেজের দিকে চেয়ে থেকে ভুরু আরও বেশি কুঁচকে গেল লোকটার। 'থাকো ওখানেই! আমি…' ঝট করে ঘুরলো ফেরেনটি। খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে গেল গ্যারেজের পেছনে একটা ঝোপের আড়ালে।

পুরো এক মিনিট আর কিছু ঘটলো না।

তারপর শোনা গেল পায়ের আওয়াজ। এগিয়ে আসতে দেখা গেল আরেকজনকে। ফ্রেড ব্রাউন।

'মিস্টার ব্রাউন!' গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলো মুসা। 'জন ফেরেনটি আছে ওখানে! সাবধান!'

গ্যারেজের দিকে চেয়ে রইলো এস্টেট ম্যানেজার।

'পেছনে! ঝোপের ভেতরে!' চেঁচিয়ে বললো রবিন।

ঝোপের দিকে ফিরলো ব্রাউন।

'আমাদের আটকে রেখে গেছে,' রিকি বললো। 'তালাটা খুলুন।'

দরজার কাছে এগিয়ে এলো ম্যানেজার। জিজ্ঞেস করলো, 'ফেরেনটি কি একা?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলো মুসা। 'মিস্টার ব্রাউন, আমাদের সঙ্গে শুঁটকিও আছে।'

'টেরিয়ার? আই সী। ছেলেটাকে বিশ্বাস কোরো না, বুঝেছো? নানারকম কথা বলবে। পাজি ছেলে।'

'ঠিক বলেছেন,' একমত হলো মুসা।

দরজার তালা পরীক্ষা করলো ব্রাউন। 'এটা তো বন্ধ।'

'চাবি আমার কাছে,' রিকি বললো। 'দরজার নিচ দিয়ে ঠেলে দিচ্ছি। খুলে দিন।'

'কিশোর...!' বলতে গেল টেরিয়ার।

'চুপ!' ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দিলো কিশোর।

চাবিটা দেয়ার জন্যে নিচু হতে গিয়ে জোরে ধাক্কা খেলো রিকি, কিশোরের গায়ে। তাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল সে। ঠন্‌ন্‌ করে ধাতব শব্দ হলো। চেঁচিয়ে উঠলো, 'হায়, হায়!'

'কি হলো?' জিজ্ঞেস করলো ব্রাউন।

'চাবিটা পড়ে গেছে! যা অন্ধকার, কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

'খোঁজো! খুঁজে বের করো। তাড়াতাড়ি!'

খুঁজতে শুরু করলো রিকি, রবিন আর মুসা। ঘরের কোণে আগের জায়গাতেই বসে রয়েছে টেরিয়ার। রিকির গায়ে ধাক্কা লাগানোর পর থেকে চুপ হয়ে আছে কিশোর, বিন্দুমাত্র নড়েনি।

চাবিটা খুঁজছে তিনজনে। পাচ্ছে না, আফসোস করছে।

'একটা গাড়ি আসছে,' হঠাৎ বললো কিশোর।

দরজার ফোকরে চোখ রাখলো সবাই, টেরিয়ার বাদে। সে বসেই রয়েছে। ঘুরে গ্যারেজের সামনের দিকে চেয়ে রয়েছে ব্রাউন।

না দেখলেও বুঝতে পারলো ছেলেরা, গাড়িটা গিয়ে থামলো মূল বাড়ির ড্রাইভওয়েতে।

দৌড় দিলো ম্যানেজার। হারিয়ে গেল নালার ওদিকে।

'নিশ্চয় ফেরেনটিকে দেখেছে!' বললো রিকি।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ!' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা।

ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে ফেরেনটি। হাতে পিস্তল। দৌড় দিলো নালার দিকে, ব্রাউন যেদিকে গেছে।

বিশ

ফেরেনটিও অদৃশ্য হয়ে গেল। কয়েক সেকেণ্ড পর প্রফেসর হোফার আর কাউন্টেসকে আসতে দেখা গেল কটেজের দিকে।

'বাবা!' চেঁচিয়ে ডাকলো রিকি।

পাঁই করে ঘুরলেন প্রফেসর। 'রিকি? কোথায়?'

'গ্যারেজে, বাবা! আটকে রাখা হয়েছে!'

দ্রুত গ্যারেজের দিকে এগিয়ে এলেন দু'জনে। সামনের দরজার চাবি প্রফেসরের কাছে, তালা খুলে বের করলেন ছেলেদের। 'কে তালা দিলো?'

'জন ফেরেনটি,' জানালো মুসা। 'মিস্টার ব্রাউন বের করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রিকি চাবিটা হারিয়ে ফেললো। তারপর ম্যানেজারকে তাড়া করলো ফেরেনটি। পিস্তল নিয়ে।'

'ব্রাউন এখানে এসেছিলো?' অবাক মনে হলো কাউন্টেসকে। 'ফেরেনটিও?'

'কেন, আপনি জানেন না?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর। 'বলে আসেনি?'

'ইয়ে···কাল বিকেল থেকেই ম্যানেজারকে পাচ্ছি না। রাতে মোটেলে ছিলো না। সেকথাই বললাম তখন প্রফেসর হোফারকে। আমাকে কিছুই বলে যায়নি।'

প্রফেসর বললেন, 'কাল নাকি ফেরেনটির নীল সেডানটা মোটেলের কাছে দেখা গেছে, কাউন্টেস বললেন।'

'পিস্তল নিয়ে তাড়া করেছে ফেরেনটি,' উদ্বিগ্ন গলায় রিকি বললো, 'আমাদের যাওয়া দরকার। ম্যানেজারকে বাঁচানো দরকার।'

'কোনো দরকার নেই,' সবাইকে অবাক করে দিলো কিশোর। 'ইচ্ছে করেই তখন ধাক্কা দিয়েছিলাম তোমাকে। চাবিটা হাত থেকে ফেলে দেয়ার জন্যে।' টেরিয়ারের দিকে ঘুরলো সে। 'এখন তুমি নিরাপদ। সব কথা খুলে বলতে পারো। কে কিডন্যাপ করেছিলো? কার হয়ে কাজ করছিলে?'

'অবশ্যই জন ফেরেনটি,' বললো মুসা।

'না, ফেরেনটি নয়,' মাথা নাড়লো গোয়েন্দাপ্রধান।

'তুমি ঠিকই আন্দাজ করেছো, কিশোর।' শুকনো ঠোঁট চাটলো টেরিয়ার। 'ফেরেনটি নয়। ফ্রেড ব্রাউন। সেদিন তোমাদেরকে ছবিটা দেখিয়ে বাড়ি ফিরতেই আমার সঙ্গে দেখা করলো। রাতে গালিভারের স্টুডিও থেকে ছবি বের করে দেয়ার জন্যে আমাকে রাজি করালো।'

'আমিও তা-ই সন্দেহ করেছি,' বললো কিশোর। 'তখন ব্রাউনকে চাবি দিলে

গ্যারেজে ঢুকে আমাদেরকে কি করতো কে জানে! গ্যারেজেই বরং নিরাপদ থেকেছি আমরা।'

'তুমি শিওর, কিশোর?' বললেন কাউন্টেস।

'হ্যাঁ। টেরিয়ার তো নিজেই স্বীকার করছে। এরপর আর সন্দেহ কিসের? নিজেই ভেবে দেখুন না আপনি। "বিপজ্জনক" বলে আমাদেরকে কাজ করতে মানা করে দিলো। বললো, পুলিশকে জানাবে সব কথা। জানিয়েছে?'

'না, জানায়নি।'

'কেন জানালো না? কারণ, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বের করে ফেলবে পুলিশ। আমরাও বের করে ফেলতে পারি, এটা বুঝেই আমাদেরকেও থামিয়ে রাখতে চেয়েছে।' বলে চললো কিশোর, 'সেদিন শুঁটকি গিয়েছিলো মোটেলে। কটেজে উঁকিঝুঁকি মারছিলো। আমরা ভাবলাম, ভেতরে ঢোকার জন্যে অমন করছে। আসলে তা নয়। গিয়েছিলো ব্রাউনের সঙ্গে দেখা করতে। তাকেই খুঁজছিলো। এখন বুঝতে পারছি।'

'অনেক দেরিতে বুঝেছো,' নিরাপত্তা পেয়ে আবার আগের খোলসে ঢুকেছে টেরিয়ার। খিকখিক করে গা-জ্বালানো হাসি হাসলো। 'তারমানে যতোটা ভাবো, ততোটা চালাক তোমরা নও।'

তার কথায় কান দিলো না কিশোর। 'আমার বিশ্বাস, ম্যাডাম, সেই মহিলার কাছে যায়ইনি ব্রাউন। ভেনাসের মূর্তি তার দরকারই ছিলো না। প্রয়োজন ছিলো ছবিগুলোর।'

'কি জানি, বলতে পারবো না। হয়তো যায়নি। জিজ্ঞেস করিনি আর।'

'না, যায়নি। আপনার ভাইয়ের শেষ স্মৃতির চেয়ে ছবিগুলোর প্রয়োজন ছিলো তার অনেক বেশি। মিস্টার ডেনবারের প্রলাপের কথা রিকির মুখে শুনেছে ব্রাউন, বুঝে গেছে, ছবিগুলোতেই রয়েছে চাবিকাঠি।'

'কিসের চাবিকাঠি?'

'ফ্র্যাঙ্কোই ফরচুনার্দের মাস্টার পীস কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন আপনার ভাই।'

'কিন্তু, কিশোর,' প্রফেসর বললেন, 'ব্রাউন কি করে জানলো, ডেনবারের কাছে একটা মাস্টার পীস আছে? কাউন্টেস তো জানেন না। তিনি জানেন না, অথচ তাঁর ম্যানেজার জানবে...'

'অদ্ভুত, তাই না, স্যার? ঠিকই ধরেছেন। মনে হয় কাউন্টেসকে ধোঁকা দিয়েছে ম্যানেজার। আমি এখন শিওর, ফেরেনটি আমাদেরকে অ্যাডোবে আটকায়নি। কালো পোশাক পরে সেদিন যে লোকটা আপনার বাড়িতে ঢুকেছিলো, সে-ও ফেরেনটি নয়।'

'কিন্তু ব্রাউন কি করে জানলো, একটা মাস্টার পীস আছে আমার ভাইয়ের কাছে?'

'শুরু থেকেই জানতো, ম্যাডাম,' রহস্যময় কণ্ঠে বললো কিশোর। 'মিস্টার ডেনবার বলেছিলেনঃ বি-ব্বলো। শুনলে মনে হবে, জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকার সময় কথা জড়িয়ে গেছে, তোতলামি. আসলে তা নয়। বি-ব্বলো মানে হলো, বি-কে বলো, অর্থাৎ ব্রাউনকে বলো। কারণ, ব্রাউন ছিলো তাঁর পার্টনার।'

'পার্টনার!' আঁতকে উঠলেন যেন কাউন্টেস। 'কিসের পার্টনার? কোনো অপরাধের?'

'হ্যাঁ। ছবির ব্যাপারেই কোনো কিছু। কী, এখনও শিওর নই, তবে খারাপ কিছু। জানতে পারলে পুলিশে ধরবে...'

'তাহলে এখুনি পুলিশে ফোন করা উচিত,' বলে উঠলেন কাউন্টেস। 'ফ্রেডকে পালাতে দেয়া যাবে না।'

'আমি যাচ্ছি,' বললেন প্রফেসর, 'পুলিশকে ফোন করতে।'

'চলুন, আমরাও যাই,' কিশোর বললো। 'দেখি আরেকবার ছবিগুলো, ধাঁধার সমাধান করা যায় কিনা।'

একুশ

বাড়িতে ঢুকে প্রফেসর গেলেন পুলিশকে ফোন করতে। ছেলেদের সঙ্গে কাউন্টেস এসে ঢুকলেন লিভিং-রুমে, যেখানে কুড়িটা ছবি রাখা হয়েছে।

ক্রমিক নম্বর অনুসারে সাজিয়ে রেখেছে রিকি, বোঝার চেষ্টা করেছে।

ছবিগুলোর দিকে আবার তাকালো কিশোর। সেই একই রকম, কটেজটা ছাড়া আর কোনো কিছুতে কোনো পরিবর্তন নেই।

ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে চোখ মিটমিট করছেন কাউন্টেস। মৃত ভাইয়ের জিনিস দেখেই বোধহয় অস্বস্তি বোধ করছেন, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। 'দারুণ এঁকেছে? ধীরে ধীরে ছোট হয়ে গেছে বাড়িটা...যেন...'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালো কিশোর, 'ক্রমান্বয়ে ছোট হয়েছে। অসাধারণ হাত ছিলো আপনার ভাইয়ের। এভাবে আঁকা সোজা কথা নয়।'

'কি বলছে ছবিগুলো, কিশোর?' মুসা কিছুই বুঝতে পারছে না।

'দেখো সবাই ভালো করে,' গোয়েন্দাপ্রধান বললো। 'কারো চোখে কোনো খটকা লাগলে বলবে। আমিও দেখছি।'

সবাই দেখছে। সেই একই অবস্থা। গাছপালার আকার এক, কটেজের

ক্যানভাসের ছাউনির আকার এক, শুধু ছোট হয়েছে বাড়িটা…

রিকি বললো, 'মনে হচ্ছে যেন একটা মাইক্রোস্কোপ…না না, টেলিস্কোপের ভেতর দিয়ে চেয়ে আছি…মানে বোঝাতে পারছি না…কোনো যন্ত্রের ভেতর দিয়ে ফোকাসিং…'

'ফোকাসিং?' ধীরে ধীরে বললো কিশোর।

'রিকি কি বলতে চায় বুঝেছি আমি,' রবিন বললো। 'কটেজের ওপর নজর আকৃষ্ট রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। মোটা কোনো নলের ভেতর দিয়ে তাকালে যেমন যে কোনো একটা জিনিস বা বিশেষ জায়গার ওপর দৃষ্টি সীমাবদ্ধ থাকে…'

'খাইছে!' আস্তে মাথা নাড়লো মুসা। 'সবাই গ্রীক বলতে আরম্ভ করেছে!'

হঠাৎ বড় বড় হয়ে গেল কিশোরের চোখ। দ্রুত এক ছবি থেকে আরেক ছবিতে নজর সরাতে লাগলো। পকেট থেকে বের করলো কাগজটা, যেটাতে লিখে রেখেছে শব্দগুলো। একবার কাগজের দিকে তাকায়, আরেকবার ছবির দিকে। এরকম করলো কয়েকবার। উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। আনমনে বিড়বিড় শুরু করলো, 'বি-ব্বলো, মানে ব্রাউনকে বলো।…আমার ছবি আর মাস্টার মানেঃ আমার আঁকা ছবির মাঝে লুকিয়ে রয়েছে মাস্টার পীস কোথায় রয়েছে তার সংকেত।' কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে ভরলো আবার। 'ভুল মনে হবে মানে, ভুল জায়গায় দেখো। অর্থাৎ, এমন জায়গায়, যেখানে সহজেই চোখ যায় অথচ চোখে পড়েও পড়ে না জিনিসটা। আবারও বলেছেঃ আমার ক্যানভাস, আর ক্যানভাস থেকে আঁকাবাঁকা…,' মুখ তুলে তাকালো গোয়েন্দাপ্রধান। 'কিছু বুঝতে পারছো? ছবিগুলোর দিকে তাকাও।'

সবাই তাকালো। বুঝতে পারলো না কিছু।

'সব শেষ ছবিটা,' বুঝিয়ে বললো কিশোর। 'কটেজটা ছোট, কিন্তু বড় বেশি বেমানান লাগছে…'

'ছাউনিটা!' চেঁচিয়ে উঠলো রবিন। 'অসংখ্য তালি!'

'ডোরাকাটা ছাউনি!' রিকি বললো।

'ক্যানভাসের ছাউনি!' মুসাও বুঝে ফেলেছে।

'এবং তার মধ্যে আঁকাবাঁকা ডোরাও আছে,' বললো কিশোর। 'আঁকা যখন বাঁকা, কিংবা বলা যায় ভুল দিকে আঁকা! চলো চলো, কুইক!'

এক ছুটে ঘর থেকে বেরোলো ছেলেরা। চুপ করে ছিলো টেরিয়ার, কিন্তু সে-ও বেরোলো সঙ্গে। লনের ওপর দিয়ে দৌড় দিলো ওরা। ওদের পেছনে রয়েছেন কাউন্টেস।

ছাউনির নিচে এসে ওপরে তাকালো কিশোর। অন্যেরাও। নানারকম তালির

মাঝে চারকোণা টুকরো ক্যানভাসের একটা তালি লাগানো রয়েছে ডোরাকাটা ক্যানভাসের ছাউনিটাতে। টুকরোটার ডোরাগুলো আঁকাবাঁকা, মূল ক্যানভাসের ডোরার সঙ্গে মিল নেই।

দৌড়ে গিয়ে গ্যারেজ থেকে একটা মই বের করে আনলো মুসা আর রিকি।

মই বেয়ে উঠে গেল মুসা। পকেট থেকে ছোট ছুরি বের করে টুকরোটার জোড়ার সেলাই কাটলো। খুলে এলো ওটা। হাতে নিয়ে কিশোরের দিকে ছুঁড়ে দিলো।

আনমনে টুকরোটাকে রোল পাকাতে পাকাতে ওপর দিকে তাকালো কিশোর। ওটা যেখানে ছিলো, সেখানে আরেক টুকরো ক্যানভাস। অথচ থাকার কথা মূল ক্যানভাসে ছিদ্র কিংবা ছেঁড়াটেড়া কোনো কিছু। ছাউনি নষ্ট হলেই শুধু তালি লাগানোর কথা। কিন্তু…

দ্বিতীয় টুকরোটার চার কোনায় শুধু চারটে সেলাই। সাবধানে কেটে নামালো মুসা। মূল ছাউনি বেরিয়ে পড়লো, কিন্তু জায়গাটা অক্ষত। টুকরোটা হাতে নিয়ে নেমে এলো সে।

চোখ ধাঁধিয়ে দিলো যেন উজ্জ্বল রঙ। ক্যানভাসের উল্টো পিঠে আঁকা রয়েছে অসামান্য একটা ছবি। বেগুনী পর্বত, নীল ঘোড়া, হলুদ পাম গাছ আর লাল মানুষ। ফ্র্যাঙ্কোই ফরচুনার্দের হারানো সেই মাস্টার পীস!

'চলো, ঘরের ভেতরে নিয়ে চলো,' বললো কিশোর।

কটেজে ঢুকে ছবিটা টেবিলে বিছানো হলো।

আলতো করে ছুঁয়ে দেখলেন কাউন্টেস, যেন ভয়, ঘষা লাগলে রঙ উঠে যাবে। বিড়বিড় করলেন। 'সাত রাজার ধন মিলবে এটা দিয়ে।…আমার বেচারা ভাইটা কি করে পেলো এই জিনিস?'

'ম্যাডাম…,' বাধা পেয়ে থেমে গেল কিশোর।

প্রফেসর হোফার ঢুকলেন। 'পুলিশ আসছে। ইয়ান ফ্লেচার…আরি! কোথায় পেলে ওটা!'

জানানো হলো প্রফেসরকে।

'কাজই করেছো একটা, কিশোর,' বললেন তিনি। 'কে ভেবেছিলো ক্যানভাসের তালির তলায় থাকবে ওরকম একটা জিনিস? চমৎকার জায়গায় লুকিয়েছে। ওয়াটারপ্রুফ, নিরাপদ, আর সব সময় ডেনবারের হাতের কাছেই ছিলো। যাক, পাওয়া গেছে ভালো। গুটিয়ে ফেলো। ওভাবে খোলা রাখলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।'

খুব সাবধানে ছবিটাকে রোল করলো রবিন আর মুসা। কিশোরের হাতে

দিলো।

বিষণ্ণ হয়ে আছে টেরিয়ার। তাকে কোনো কাজই করতে দেয়া হচ্ছে না। যেন একঘরে করে রাখা হয়েছে।

'কাউন্টেস,' হাসলেন প্রফেসর, 'আইনতঃ ছবিটার মালিক এখন আপনি। তবে, আগে জানতে হবে, চোরাই মাল কিনা ওটা। আপনার ভাই কোনোখান থেকে চুরি করে এনেছিলো কিনা।'

'চুরি? আমার ভাই চোর ছিলো!'

'না,' বললো কিশোর। 'আমার মনে হয় না ওটা চোরাই। তবে...'

দীর্ঘ ছায়া পড়লো ঘরের ভেতরে। দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে লোকটা, হাতে পিস্তল। হেসে বললো, 'তবে আমি এখন ওটা চুরি করবো। কিংবা বলতে পারো, ডাকাতি করবো।'

ফ্রেড ব্রাউন। পিস্তলের কুৎসিত নলের মুখটা ছেলেদের দিকে ফেরানো।

'তুমি যে এতোবড় শয়তান, জানতাম না।' দাঁতে দাঁত চাপলেন কাউন্টেস। 'এসব করে পার পাবে না।'

'তা পাবো,' হাসি মুছলো না ব্রাউনের মুখ থেকে। 'বাধা দেয়ার চেষ্টা করবেন না, ম্যাডাম। খুব খারাপ হবে।' লোভাতুর চোখে কিশোরের হাতের দিকে তাকালো সে। 'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, কিশোর। অনেক চেষ্টা করেছি। ধাঁধার সমাধান আমি করতে পারিনি। তুমি...' চুপ হয়ে গেল ব্রাউন। কান পাতলো একদিকে।

সবাই শুনতে পেলো। পুলিশের সাইরেনের শব্দ।

পিস্তল নাচালো ব্রাউন। হাসি হাসি ভাবটা চলে গেছে চেহারা থেকে, সেই জায়গা দখল করেছে উদ্বেগ। 'দাও, জলদি দাও!'

দ্বিধা করছে কিশোর।

'দাও বলছি!' চেঁচিয়ে উঠলো ব্রাউন।

'দিয়ে দাও, কিশোর,' প্রফেসর বললেন।

'জলদি!' গর্জে উঠলো ব্রাউন।

ঢোক গিললো কিশোর। বাড়িয়ে দিলো একটা ক্যানভাসের রোল। প্রায় ছোঁ দিয়ে ওটা টেনে নিয়ে আরেকবার পিস্তল নাড়লো ব্রাউন। পিছাতে পিছাতে বেরিয়ে চলে গেল।

সবাই ছুটে গেল জানালার কাছে।

'ওকে থামান!' চেঁচিয়ে উঠলেন কাউন্টেস।

কে থামাতে যাবে পিস্তলধারী একটা ভয়ানক লোককে? সবাই দেখলো, লন

পেরিয়ে ছুটে গিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে হারিয়ে গেল ব্রাউন। খানিক পরেই দেখা গেল, হলুদ মার্সিডিজটা ছুটে যাচ্ছে ক্যানিয়নের মেইন রোড ধরে।

এগিয়ে আসছে পুলিশের সাইরেন।

'পুলিশ ধরবে ব্যাটাকে,' বললেন প্রফেসর।

'না,' মাথা নাড়লো কিশোর। 'নীল সেডান হলে আটকাতো। আপনি কি আর হলুদ মার্সিডিজের কথা বলেছেন?'

কিশোরের অনুমানই ঠিক। পুলিশ এলো। মার্সিডিজটাকে আটকায়নি।

বাইশ

গাড়ি থেকে নামলো পুলিশেরা। গিয়ে চীফ ইয়ান ফ্লেচারকে কটেজে নিয়ে এলেন প্রফেসর। দ্রুত জানানো হলো তাঁকে, ব্রাউন পালিয়েছে।

'হলুদ মার্সিডিজটা দেখলাম তো!' উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন চীফ। তাড়াতাড়ি রেডিওতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন তাঁর লোকদের। 'পালাতে পারবে না।'

'যেভাবেই হোক, ধরতেই হবে ওকে, চীফ,' কাউন্টেস বললেন। 'ও একটা ক্রিমিনাল। আমার ছবি নিয়ে পালিয়েছে।'

'না, নিতে পারেনি,' হেসে বললো কিশোর। চীফের দিকে তাকালো, 'আপনার সাইরেন শুনে এতো ঘাবড়ে গেল, খুলে দেখার কথা আর ভাবেনি। যা ধরিয়ে দিয়েছি, নিয়ে পালিয়েছে। আসল ছবি এই যে,' বলতে বলতে ক্যানভাসের দ্বিতীয় রোলটা খুলে আবার টেবিলে বিছালো।

ভুরু কুঁচকে সেটার দিকে তাকিয়ে রইলো ফ্লেচার। সব কথা খুলে বলা হলো তাঁকে।

'এটাই সেই হারানো ফরচুনার্দ,' বললো কিশোর। 'ব্রাউন পালিয়েছে তালি মারার একটা টুকরো নিয়ে। অতি সাধারণ ক্যানভাস। হাহ্ হাহ্!'

হাসতে শুরু করলো সবাই।

গোয়েন্দাপ্রধানের পিঠ চাপড়ে দিয়ে হেসে বললেন চীফ, 'ব্রাউন যদি জানতো কার পাল্লায় পড়েছে? হাহ্ হাহ্! আমাদের কিশোর পাশা...'

'কিন্তু আরেকটা শয়তান যে ছাড়া রয়ে গেল,' বলে উঠলেন প্রফেসর। 'জন ফেরেনটি।'

'আমার মনে হয় না, ফেরেনটি আর এখন কিছু করতে পারবে,' তিন গোয়েন্দার দিকে চেয়ে হাসলেন কাউন্টেস। 'ওদের সমস্ত প্ল্যান ভণ্ডুল করে দিয়েছো তোমরা। তুখোড় ছেলে। ভাবছি, বড় রকমের কোনো পুরস্কার দেবো

তোমাদের।'

তাঁর প্রশংসায় লজ্জা পেলো রবিন আর মুসা। কিন্তু কিশোর যেন খুশি হতে পারছে না। চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে রয়েছে ছবিটার দিকে।

'চীফ,' প্রফেসর বললেন। 'ছবিটার মালিক এখন কে হবে? কাউন্টেসেরই তো পাওয়া উচিত। ছবিটা তাঁর ভাইয়ের ছিলো। অবশ্য যদি ডেনবার কোনোখান থেকে চুরি করে না এনে থাকে...'

'না, আমার ভাই চুরি করেনি। খামখেয়ালী ছিলো বটে, কিন্তু চোর ছিলো না।'

'ঠিকই বলেছেন,' কাউন্টেসের সুরে সুর মিলিয়ে কিশোর বললো, 'চোরাই মাল নয় এটা।'

'তাহলে আর কি? কোনো মিউজিয়ামকে দান করে দেবো ছবিটা। এরকম একটা জিনিস কোনো একজনের হতে পারে না, দুনিয়ার সব মানুষের সম্পত্তি।'

'আগে আমাদের তদন্ত শেষ করে নিই,' চীফ বললেন। 'যদি দেখা যায় চোরাই নয়, তাহলে অবশ্যই আপনি পাবেন। আপনার জিনিস নিয়ে তখন আপনি যা খুশি করবেন। যে কোনো মিউজিয়াম পেলে লুফে নেবে...'

'আরি!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন কাউন্টেস। 'গ্যারেজের পেছনে! জন ফেরেনটি!'

চোখের পলকে জানালার দিকে ঘুরলো সবাই। গ্যারেজের পেছনে কাউকে দেখতে পেলো না।

'আমি দেখেছি,' জোর দিয়ে বললেন কাউন্টেস। 'হাতে পিস্তল নিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। জন ফেরেনটি। বলতে বলতেই পালিয়েছে...'

'পালাবে কোথায়?' বলেই রেডিও তুললেন চীফ, সঙ্গে আসা লোকদেরকে নির্দেশ দিলেন পুরো বাড়ি ঘিড়ে ফেলার জন্যে। রেডিও নামিয়ে বললেন, 'আমি যাচ্ছি।'

ফ্লেচার বেরিয়ে যেতেই কিশোর চেঁচিয়ে উঠলো, 'কুইক! গ্যারেজের পেছনে চলো...ডানে ঘুরে যাবে।' দরজার দিকে দৌড় দিলো সে। পেছনে চললো মুসা, রবিন, আর রিকি। টেরিয়ারও ছুটলো।

জন ফেরেনটির ছায়াও দেখা গেল না। গ্যারেজের পেছনে চীফ আর দু'জন পুলিশের সঙ্গে মিলিত হলো ছেলেরা।

'গেল কই?' এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন চীফ।

'তাই তো!' ছেলেদের পেছন থেকে বলে উঠলেন প্রফেসর। 'কোনো ঝোপঝাড়ে...'

'না না, লুকানো এতো সোজা নয়া মনে হয়...'

'চীফ!' চেঁচিয়ে উঠলো আবার কিশোর, 'কুইক! কটেজে চলুন। জলদি!'

'কি হয়েছে? কেন?'

'জলদি করুন, স্যার,' ছুটতে শুরু করলো কিশোর।

গ্যারেজের সামনে এলে প্রথমে রবিন দেখলো ওদেরকে। দুটো মূর্তি ছুটে যাচ্ছে ড্রাইভওয়ের দিকে। 'আরি আরি, ওই তো! ফেরেনটি!'

'কাউন্টেসকে তাড়া করেছে!' রিকি বললো।

'কাউন্টেসের হাতে ছবিটা!' বললো মুসা।

'আমাদের ফাঁকি দিয়েছে ব্যাটা!' বললেন প্রফেসর। 'আরে, আমার গাড়ির দিকে যাচ্ছে কেন কাউন্টেস?'

কাউন্টেসকে তাড়া করেছে ফেরেনটি। ছবিটা মহিলার হাতে। ছুটে যাচ্ছে প্রফেসরের গাড়ির দিকে।

পিস্তল বের করে ফেলেছেন চীফ আর তাঁর দুই সহকারী। চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এই থামো, নইলে গুলি করবো।' বলেই ফাঁকা আওয়াজ করলেন।

গাড়ির কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন কাউন্টেস, থমকে দাঁড়ালেন। পেছনে ফেরেনটিও দাঁড়িয়ে গেল।

এগিয়ে গেল সবাই।

'যাক, ফেরেনটি ব্যাটাও ধরা পড়লো,' বললো রবিন।

'হ্যাঁ,' ফিরে চেয়ে বললেন কাউন্টেস। 'ঘরে ঢুকে ছবিটা নিয়ে যেতে চেয়েছিলো। তুলে নিয়েই দৌড় দিলাম। অ্যারেস্ট করুন, ওকে, চীফ।'

'হ্যাঁ,' ফ্লেচার বললেন, 'তোমাকে অ্যারেস্ট করা হলো, ফেরেনটি। তুমি…'

'না,' বাধা দিলো কিশোর। 'মিস্টার ফেরেনটিকে নয়। কাউন্টেসকে অ্যারেস্ট করুন।'

স্তব্ধ হয়ে গেল সবাই।

'যাহ্, ঠাট্টা করছো তুমি, কিশোর,' তরল কণ্ঠে বললেন কাউন্টেস।

মাথা নাড়লো কিশোর। 'না, ঠাট্টা নয়, কাউন্টেস। ছবিটা নিয়ে পালাতে চেয়েছিলেন আপনি। জানেন, যদি তদন্ত হয়, মহাবিপদে পড়বেন। এমনকি জেলেও যেতে পারেন। ছবিটা তো পাবেনই না কোনোদিন। মিস্টার ফেরেনটি আসলে আপনাকে আটকাতে চেয়েছিলেন।'

'কি যা তা বলছো?' রেগে গেলেন কাউন্টেস।

'ঠিকই বলছি। রিগ ডেনবার আপনার ভাই ছিলো না। তার দু'জন সহকারী ছিলো, পার্টনার, একজন ফ্রেড ব্রাউন, আরেকজন আপনি।'

'তুমি জানো?' অবাক হলেন ফেরেনটি। 'আমিও ভুল করেছি। তোমাদেরকে

সহকারী করে নিলে আরও সহজে কাজ সারতে পারতাম। আসলে তোমাদেরকে আণ্ডার এস্টিমেট করেছি আমি।'

'ফেরেনটি আসলে কে, কিশোর?' জিজ্ঞেস করলেন চীফ।

'মনে হয় ওলন্দাজ পুলিশের লোক। কাউন্টেস আর ব্রাউনের পিছু নিয়ে আমেরিকায় এসেছেন···ওঁকেই জিজ্ঞেস করুন না?'

মাথা ঝোঁকালেন ফেরেনটি। 'ছেলেটা ঠিকই বলছে, চীফ। আমি ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের লোক। আমস্টারডাম থেকে ওদের পিছু নিয়েছি। কয়েক বছর ধরেই চেষ্টা করছি, কিন্তু আসলটাকে ধরতে পারছিলাম না। সব চেয়ে পিচ্ছিল ছিলো ডেনবারটা। কোনো প্রমাণ রাখতো না আর পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতো, আজ এখানে, কাল ওখানে। কিশোর, তুমিও বুঝতে পেরেছো, না?'

'হ্যাঁ, স্যার। ওরা এই বিপাকে পড়তো না। একজন আরেকজনকে ফাঁকি দিতে গিয়েই ধরাটা পড়েছে। ব্রাউন ফাঁকি দিতে চেয়েছিলো কাউন্টেসকে। আসল ছবি ভেবেই এই কাণ্ড করেছে ব্রাউন আর কাউন্টেস। ব্রাউন নিয়ে গেল সাধারণ ক্যানভাস। কাউন্টেস সেকথা যখন জানলো, আমাদের সবাইকে ফাঁকি দিয়ে ছবি নিয়ে পালাতে চেয়েছিলো। আপনি চোখ না রাখলে···'

'হয়তো পালাতো। এখন যাবে জেলে।'

'আসল ছবির কথা কি যেন বললে?' প্রশ্ন করলেন চীফ। 'এই ছবিটা কি আসল ফরচুনার্দ নয়?'

'না। ওটা সত্যিই ধ্বংস করে দিয়েছে নাৎসীরা।' রিকির দিকে ফিরলো কিশোর। 'তোমার নিশ্চয় মনে আছে, ডেনবার বলেছিলোঃ দুনিয়ার সব চেয়ে দামী আর্টিস্ট সে। কিন্তু কেউ সেটা জানলো না। এক অর্থে ঠিকই বলেছে।'

'সত্যি, তোমার বুদ্ধি আছে, কিশোর পাশা!' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন ফেরেনটি। 'তুমি একেবারে জাত-গোয়েন্দা!'

'খুলে বলো তো, কিশোর,' অধৈর্য হয়ে হাত নাড়লো মুসা।

'রিগ ডেনবার খুব বড় আর্টিস্ট ছিলো। তবে আসল কাজে না গিয়ে গিয়েছিলো নকল কাজে, জালিয়াতি। টাকা রোজগারের ধান্দায়। বড় বড় আর্টিস্টের ছবি এমনভাবে নকল করতো, ধরার সাধ্য ছিলো না। তার দুই সহকারী, ব্রাউন আর কাউন্টেস সেই ছবি আসল বলে বিক্রি করতো লোকের কাছে। অনেক লোককে ঠকিয়েছে।'

'তাহলে কি···!' অবাক হয়ে কাউন্টেসের হাতের ছবিটার দিকে তাকালেন ফ্লেচার।

'হ্যাঁ, এটাও,' বললো কিশোর। 'রিগ ডেনবারের শেষ মাস্টার পীস। ফরচুনার্দ বলে সহজেই চালিয়ে দেয়া যাবে। অভিজ্ঞ আর্টিস্টদেরও বুঝতে কষ্ট হবে।'

তেইশ

'মানে!' রবিনকে অবাক করে দিয়ে রেগে গেলেন মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফার। 'কি ভেবেছো নিজেদেরকে? তোমাদের সব কেসের কাহিনী নিয়েই কি ছবি বানাতে হবে নাকি আমাকে?'

'প্লীজ, স্যার,' অনুনয় করলো রবিন। 'রিপোর্টটা পড়ে দেখুন। নিশ্চয় স্বীকার করবেন, অতি চমৎকার একটা কেস। যা দেখিয়েছে না কিশোর! অনেক কিছু জানতে পারবেন।'

কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে নীরব হয়ে গেলেন বিখ্যাত চিত্রপরিচালক। তারপর বললেন, 'তারমানে কি তুমি বলতে চাইছো, রবিন মিলফোর্ড, যে তোমাদের কিশোর পাশা আমার চেয়ে বুদ্ধিমান?'

'না না, স্যার,' তাড়াতাড়ি বললো রবিন। 'চেষ্টা করলে আপনি খুব বড় গোয়েন্দা হতে পারতেন...মানে, পারবেন...'

'বলছো?' আবার কিছুক্ষণ বরফ-শীতল নীরবতা। 'বেশ, কাল তোমাদের রিপোর্ট নিয়ে এসো আমার অফিসে। পড়ে দেখবো। আর, এক শর্তে এই কাহিনী নিয়ে ছবি করতে পারি।'

'বলুন, স্যার?' অস্বস্তি বোধ করছে রবিন।

'আমি বলে যাবো, কিভাবে কি হয়েছে। কোনো একটা পয়েন্ট যদি ভুল করি—যেটা কিশোর করেনি—শুধুমাত্র তাহলেই এই কাহিনী নিয়ে আমি ছবি বানাবো। তা নাহলে আর কোনোদিনই তোমাদের কোনো কাহিনী নিয়ে ছবি বানাবো না।'

ঢোক গিললো রবিন। পরিচালকের ব্যবহারে ভীষণ অবাক হয়েছে। সাহস করে বলেই ফেললো, 'ঠিক আছে, স্যার। তাই হবে।'

'বেশ। কাল সকালে এসো আমার অফিসে,' লাইন কেটে দিলেন পরিচালক।

পরদিন সময়মতো মিস্টার ক্রিস্টোফারের অফিসে গেল তিন গোয়েন্দা।

রবিনের দেয়া ফাইলটা টেনে নিলেন পরিচালক। শুরুতে কয়েক পাতা পড়লেন। তারপর ফাইল বন্ধ করে বললেন, 'তাহলে জন ফেরেনটি গোয়েন্দা, যাকে তোমরা ক্রিমিন্যাল ভেবেছিলে প্রথমে। আর ব্রাউন এবং কাউন্টেসই আসল ক্রিমিন্যাল। কাউন্টেসও কাউন্টেস নয়, মিছে কথা বলেছে তোমাদের কাছে...'

'ওর আসল নাম মেরি গিলবার্ড...' বললো মুসা।

'হ্যাঁ, ফাইলে লিখেছে রবিন। মানুষ চেনা বড় কঠিন। মুখ দেখেই যদি সব মানুষকে চিনে ফেলা যেতো, কি ভালোই না হতো তাহলে! তো ব্রাউন আর মেরি

কি মুখ খুলেছে?'

'খুলেছে, স্যার,' মুসা বললো। 'পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে, অনেক বছর ধরে করছে এই জালিয়াতি ব্যবসা। অনেক টাকা কামিয়েছে। ইউরোপের বড়লোকদের কাছে বিক্রি করেছে ওসব নকল ছবি। কয়েক মাস আগে ধরা পড়ে জেল হয় দু'জনের। ডেনবার পালিয়ে চলে এসেছিলো আমেরিকায়, তার শেষ মাস্টার পীসটা নিয়ে...'

'থামো,' হাত তুললেন পরিচালক। 'এবার আমি বলি। বাড়ি ভাড়া বাকি রেখে মারা গেল ডেনবার। ইউরোপে চিঠি লিখলেন প্রফেসর হোফার। ব্রাউন আর মেরি, দু'জনেই তখন জেলে। প্রফেসরকে ব্রাউনের বাড়ির ঠিকানা দিয়েছিলো ডেনবার। কাজেই তাঁর চিঠি জেলখানায় পৌঁছলো না, পড়ে রইলো ব্রাউনের বাড়ির চিঠির বাক্সে। মেরির কয়েক দিন আগে—এই ধরো হপ্তাখানেক বা আরও কিছু বেশি—জেল থেকে ছাড়া পেলো ব্রাউন। বাড়ি এসে প্রফেসরের চিঠি পেলো। জানলো, ডেনবার মারা গেছে। বুঝলো, ছবি জালিয়াতির ব্যবসা শেষ। আঁকবে কে? নকল ফরচুনার্দের কথা জানা আছে ব্রাউনের। ঠিক করলো, ছবিটা বিক্রি করে একাই মেরে দেবে টাকাটা, মেরিকে ভাগ দেবে না। তাড়াতাড়ি ছুটে এলো আমেরিকায়। ছবিটা যেদিন প্রফেসরের বাড়িতে খুঁজতে এলো, সেদিনই তোমরা গেলে পুরানো মাল কিনতে। ভালোমতো খোঁজার সুযোগই পেলো না ব্রাউন। বরং পালাতে গিয়ে না দেখে নালায় পড়ে পায়ে ভীষণ ব্যথা পেলো। ওই অবস্থায় ছবি খুঁজে বের করতে পারবে না বুঝে আবার বাড়ি ফিরে গেল। গিয়ে দেখলো, মেরিও ছাড়া পেয়ে গেছে। তাকে ফাঁকি দিতে পারলো না ব্রাউন। পা কিভাবে মচকেছে, বলতেই হলো। তারপর, পা ভালো হলে, দু'জনে একসঙ্গে আবার এলো আমেরিকায়। কি, ঠিক বলছি তো?'

'ঠিকই বলছেন, স্যার,' মাথা ঝোঁকালো কিশোর।

'বেশ। নাটের গুরু ডেনবার ধরা পড়েনি। কাজেই জন ফেরেনটিও সন্তুষ্ট হতে পারেনি। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরই আবার চোখ রাখতে লাগলো মেরি আর ব্রাউনের ওপর। ওদের পিছু নিয়ে সে-ও এলো আমেরিকায়। জানলো, ডেনবার মারা গেছে। ব্রাউনের পিছু নিয়ে ডয়েলদের বাড়ি গেল। ওদের টেলিফোন লাইন ট্যাপ করে জানলো, মিস্টার ডয়েলের কাছে ডেনবারের শেষ ছবিটা বিক্রি করতে চাইছে ব্রাউন। ঠিক?'

আবার মাথা ঝোঁকালো কিশোর।

আত্মবিশ্বাস বাড়লো পরিচালকের। হাসলেন। 'রিকি দেখে ফেলেছে। জানাজানি হয়ে যাওয়ার ভয়ে ছবিটা লুকিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছিলো ডেনবার।

তারপর পড়লো অসুখে। বুঝতে পারলো আর বেশি দিন বাঁচবে না। ততোদিনে যদি জেল থেকে ছাড়া না পায় সহকারীরা? তাই তাদের জন্যে মেসেজ তৈরি করলো, কুড়িটা ছবি এঁকে। জেলে চিঠি লিখে খোলাখুলি জানানো সম্ভব ছিলো না, কারণ কর্তৃপক্ষের হাত হয়ে যায় চিঠি। তবে ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছিলো দু'জনকে, চিঠিতে, যে ছবিটা লুকিয়ে রেখেছে। অসুখ বাড়লো তার। শেষ মুহূর্তে জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকার ভান করে আরও কিছু মেসেজ রেখে গেল সে।

'ব্রাউন আর মেরি এসে দেখলো, ডেনবারের সমস্ত জিনিসপত্র বিক্রি করে দিয়েছে প্রফেসর হোফার। ছুটে গেল ওরা স্যালভিজ ইয়ার্ডে। ওখানে গিয়ে দেখলো, জিনিসগুলো আবার বিক্রি হয়ে গেছে। ওগুলো বের করে দেয়ার জন্যে ধরলো তোমাদেরকে। আর তোমাদের মাধ্যমেই জানলো, একটা ছবি পেয়েছে টেরিয়ার। তার সঙ্গে যোগাযোগ করলো ব্রাউন। জানতে পারলো কোথায় আছে ছবিগুলো। চুরি করে মিস্টার গালিভারের স্টুডিওতে ঢুকতে রাজি করিয়ে ফেললো টেরিয়ারকে। সহজেই রাজি হলো ছেলেটা, কারণ, তার তখন গালিভারের ওপর জেদ, তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছে সেই জন্যে।

'একজস্ট ফ্যানের ফোকর দিয়ে ভেতরে ঢুকতো টেরিয়ার। এক এক করে ছবি বের করে দিতো ব্রাউনকে। ব্রাউন পরীক্ষা করে দেখে আবার ফিরিয়ে দিতো,' থামলেন পরিচালক।

'হ্যাঁ,' বললো কিশোর। 'প্রথমে আমার মতোই ব্রাউনও ভেবেছিলো ওই ছবিগুলোরই কোনোটার নিচে আঁকা আছে আসল ছবিটা!'

'ফলে ব্যর্থ হলো,' আবার বলে চললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'কিন্তু থামলো না ব্রাউন। খোঁজ চালিয়েই গেল। তোমাদেরকে অ্যাডোবে আটকেছিলো সে-ই। তারপর স্টুডিওতে টেরিয়ারকে তোমরা ধরে ফেললে। নিজেকে বাঁচানোর জন্যে তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বন্দি করলো ব্রাউন। টেরিয়ারকে খুঁজতে গিয়ে তোমরাও বন্দি হলে আরেকবার, গ্যারেজে। এবার বন্দি করলো জন ফেরেনটি, তোমাদের ভালোর জন্যেই। আচ্ছা, ভালো কথা, ওর একটা পা খোঁড়া। নিশ্চয় ভেঙেছিলো?'

'হ্যাঁ, স্যার,' বললো রবিন। 'অনেক বছর আগে।'

মাথা ঝাঁকালেন পরিচালক। 'ছবিটা খুঁজে বের করে তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছো তুমি, কিশোর। কিভাবে করেছো, রিপোর্টে পড়ে ফেলেছি, কাজেই সেকথায় আর যাচ্ছি না। আসা যাক জালিয়াতির কথায়। তুমি সন্দেহ করেছো, ডেনবার আর ব্রাউন জালিয়াত। কাউন্টেসের রোলটা তখনও বুঝতে পারোনি। তবে তাকেও সন্দেহ করেছো। সেটা বোঝার জন্যেই কটেজে টেবিলের ওপর ছবি রেখে ইচ্ছে করেই বেরিয়ে গিয়েছিলে ফেরেনটিকে ধরার ছুতোয়। নইলে

তোমাদের যাওয়ার তো কোনো প্রয়োজনই ছিলো না, যেখানে পুলিশ ফোর্স রয়েছে। তোমার পাতা ফাঁদে পা দিলো কাউন্টেস। ঠিক তো?'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললো কিশোর। 'ঠিক।'

'কিন্তু, স্যার,' মুসা বললো। 'বুড়ো ডেনবার যে জালিয়াত, কিশোর সেটা কি করে বুঝতে পারলো?'

'সেটা তো সহজ, মুসা আমান। ডেনবার রিকিকে বলেছে না যে সে দুনিয়ার সব চেয়ে দামী আর্টিস্ট? তাছাড়া মিস্টার গালিভারও স্বীকার করেছেন সেকথা। খুব পাকা হাত ছিলো ডেনবারের। একই দৃশ্য কুড়িবার কুড়িরকম করে আঁকা যা তা কথা নয়। এতোবড় একজন শিল্পী লোকের চোখে না পড়েই পারে না। কেন পড়লো না তাহলে? একটাই জবাব, জালিয়াত বলে। শুধু অন্যের জিনিসই চুরি করতো, নিজের আইডিয়া থেকে আঁকা কোনো ছবিই ছিলো না তার, ওই কুড়িটা বাদে। লোকের চোখে পড়বে কিভাবে? কি কিশোর, এভাবেই তো বুঝেছো?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'আর কি বাকি রইলো?' রবিনের দিকে চেয়ে ভুরু নাচালেন পরিচালক। 'সবই বুঝতে পেরেছি, তাই না?'

মুখ কালো করে ফেলেছে রবিন। 'তাই তো মনে হচ্ছে, স্যার।'

'বেশ। তো এখন জানতে পারি কি, কার কি সাজা হয়েছে?'

চিত্রপরিচালকের ব্যবহার আর কথার ধরনে দুই সহকারী অবাক হলেও কিশোর হলো না। শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলো, 'ব্রাউনের বিরুদ্ধে দুটো কেস। আরেকবার নকল ছবি বিক্রির চেষ্টা, আর শুঁটকি টেরিকে কিডন্যাপ। কিডন্যাপিঙের জন্যে এখানেই জেলে ভরে দিয়েছে তাকে পুলিশ। এখানকার সাজা শেষ হলে পাঠিয়ে দেবে ইউরোপে, ছবি জালিয়াতির জন্যে ওখানে আরেকবার সাজা খাটতে হবে তাকে। মেরিকে চালান করে দেয়া হয়েছে ইউরোপে, সঙ্গে গেছেন জন ফেরেনটি। এতোদিনে সন্তুষ্ট হয়েছেন।'

'ছবিগুলো কি করেছে?'

'ডেনবারের শেষ মাস্টার পীসটা পেয়েছেন প্রফেসর হোফার। ডেনবারের কাছে টাকা পেতেন তিনি, তাই আদালত এই রায় দিয়েছে। আদালতের রায় বেরোনোর পর তাঁর কপাল খুলে দিয়েছে পত্রিকাওয়ালারা। এতো বেশি করে লিখেছে, ছবিটা কেনার জন্যে পাগল হয়ে গেছে লোকে। অনেক দামে কিনে নিয়ে গেছে একজনে। টাকা যা পেয়েছেন, বাড়িঘর সব মেরামতের পরও বেশ কিছু রয়ে গেছে প্রফেসরের হাতে।'

'আর ওই কড়িটা ছবি?'

'মিস্টার গালিভারকে ফেরত দেয়া হয়েছে। আইনতঃ ওগুলোর মালিক তিনিই। কারণ, তখন ন্যায্য দাম দিয়েই কিনেছিলেন। এখন অবশ্য লোকে অনেক বেশি দিতে চাইছে, কিন্তু তিনি আর বিক্রি করবেন না। ওগুলোর ওপর আর ছবিও আঁকবেন না। সাজিয়ে রেখেছেন তাঁর স্টুডিওতে।'

'টেরিয়ার ডয়েলের কি হয়েছে?'

'মিস্টার গালিভার তার বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ করেননি। কিন্তু শুঁটকির বাবা ভীষণ রেগেছেন। ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়েছেন হোস্টেলে। এই ছুটির মধ্যে একা একা কাটাতে হবে বেচারাকে।'

'উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে।' হাত নাড়লেন তিনি, 'যাও, এবার ওঠো। আর কোনদিন কাহিনী আনবে না আমার কাছে, ছবি করার জন্যে···আমি খুব ব্যস্ত···'

'এক মিনিট, স্যার,' হাত তুললো মুসা। 'একটা প্রশ্নের জবাব বাকি রয়ে গেছে। আমরা যখন গ্যারেজে বন্দি হলাম, কিশোর কি করে জানলো যে ফেরেনটি নয়, ব্রাউনই আসল শয়তান?'

'কী? মানে···,' ফাইলের প্রথম দিকের কয়েকটা পাতা দ্রুত পড়ে নিলেন আবার পরিচালক। 'বুঝেছি। ওই যে ডেনবার বলেছে, বি-ব্বলো, মানে, ব্রাউনকে বলো···'

'হয়নি স্যার,' এতোক্ষণে হাসলো কিশোর। 'গ্যারেজে আটকা পড়ার পর শুঁটকির একটা কথা স্ট্রাইক করেছিলো আমার মনে। তখনই বুঝেছি। শুঁটকি বলেছে, তাকে যে বন্দি করেছে সে নাকি বলেছেঃ ওই নালায় সবাই পড়েছে একবার করে। না জেনে।'

'তাতে কি?' ভুরু কোঁচকালেন পরিচালক।

'সেরাতে জন ফেরেনটিও পড়েছিলো নালায়,' বললো কিশোর। 'ওই যেদিন অ্যাডোবে আমরা···'

গুঙিয়ে উঠলেন পরিচালক, 'হায়, হায়, ঠিকই তো! নালাটা রয়েছে ওখানে, জানলে তো আর পড়তো না ফেরেনটি। তারমানে প্রথম যেদিন গেলে হোফারের বাড়িতে, নালায় পড়েছিলো যে লোকটা সে ফেরেনটি নয়! একটাই থাকলো জবাবঃ ফ্রেড ব্রাউন!'

'তাহলে হার স্বীকার করে নিচ্ছেন আপনি?' হাসিতে উজ্জ্বল এখন রবিনের মুখ।

'না নিয়ে আর উপায় কি?' মুচকি হাসলেন পরিচালক। 'তবে, দুঃখ পাচ্ছি না।'

'কেন, কেন?'

'কারণ, আমি আগেই জানি সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারবো না। শার্লক হোমস, এরকুল পোয়ারো, কিংবা কিশোর পাশারা ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মায় না। তবু একবার চেষ্টা করে দেখলাম পারি কিনা?'

'এবার কিন্তু সত্যি লজ্জা দিচ্ছেন, স্যার,' লাল হয়ে উঠেছে কিশোরের গাল।

'খোঁচা মারতে ছাড়লো না মুসা, 'তাহলে, স্যার, এবার আমরা উঠি। আপনি ব্যস্ত মানুষ...'

হো হো করে হেসে উঠলেন পরিচালক। 'নাহ্, তোমরা আমার স্বভাবটাই পাল্টে দিচ্ছো,' হাসতে হাসতে বললেন তিনি। 'কখনও হাসি না বলে যে একটা দুর্নাম ছিলো আমার, সেটা ঘুচিয়ে দিচ্ছো। কথায় বলে না, সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস...!' হঠাৎ কালো হয়ে গেল তাঁর মুখ। চোখের পলকে হাসি মুছে গেছে। দরজার দিকে তাকিয়ে আছেন কড়া চোখে।

অবাক হয়ে ফিরে তাকালো তিন গোয়েন্দা। হাতে কয়েকটা বাক্স নিয়ে ঢুকেছে খানসামা। আইসক্রীম! আগেই অর্ডার দিয়ে রেখেছেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। কতোক্ষণ পর ঢুকতে হবে, নিশ্চয় তা-ও বলে রেখেছেন।

এই প্রথম জানলো তিন গোয়েন্দাঃ শুধু বড় পরিচালকই নন মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফার, অনেক বড় অভিনেতাও, যদিও কখনও ছবিতে অভিনয় করেননি তিনি।

ঃ শেষ ঃ
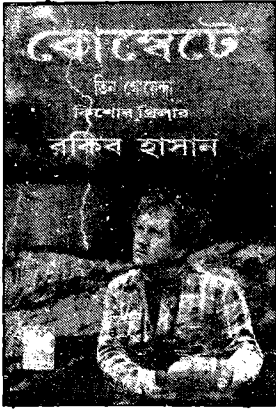
বোম্বেটে

প্রথম প্রকাশঃ অক্টোবর, ১৯৮৯

'ক্যারোলিন!' চিৎকার করতে করতে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন জিনার বাবা মিস্টার পারকার। 'এই, ক্যারোলিন, কোথায় তুমি?'

'এই যে, এখানে,' বেডরুম থেকে বেরিয়ে এলেন জিনার মা। 'ঘর সাফ করছি। ...কি হলো, এতো চেঁচাচ্ছো কেন?'

'এই দেখো না, টেলিগ্রাম,' বললেন মিস্টার পারকার। 'প্রফেসর কারসওয়েল। চিনেছো?'

'কয়েক বছর আগে যে এসেছিলো? খালি খাওয়ার কথা ভুলে যেতো, সেই লোকটা তো?' স্বামীর কোটের হাতায় লেগে থাকা ময়লা ঝেড়ে দিলেন মিসেস পারকার।

'ওভাবে ঝাড়ছো কেন?' ভুরু কোঁচকালেন মিস্টার পারকার। 'আমি কি ময়লার ডিপো নাকি?...শোনো, আজ আসছে। এক হপ্তা থাকবে।'

চমকে উঠলেন মিসেস পারকার। 'কিন্তু জিনারাও তো আসছে আজ! তুমি জানো।'

'আঁা, তাই তো...ভুলে গিয়েছিলাম। থাক, জিনাকে ফোন করে দাও, আগামী হপ্তায় আসতে বলো। জিনার সঙ্গে আবার কিশোর, মুসা আর রবিনও তো আসবে। না, এ-হপ্তায় ওদের আসা চলবে না। প্রফেসরের সঙ্গে আমি শান্তিতে কাজ করতে চাই। নতুন একটা আবিষ্কারের ব্যাপারে...আরে, ওভাবে তাকিয়ে আছো কেন?'

'তোমাদের পাগলামির জন্যে ছেলেমেয়েদের আনন্দ আমি নষ্ট করতে পারবো না। ওরা আজই আসবে। হয়তো এতোক্ষণে রওনা হয়ে গেছে...এক কাজ করো। তোমার বন্ধুকেই মানা করে দাও, যেন পরে আসে।'

'বেশ,' অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হলেন মিস্টার পারকার। গৃহিণীকে চটিয়ে দিয়ে পারিবারিক অশান্তি আর অসুবিধে সৃষ্টি করতে চান না। 'তবে, প্রফেসর খুব মাইণ্ড করবে।' বন্ধুকে ফোন করার জন্যে চলে গেলেন তিনি।

বেডরুমে আবার ফিরে এলেন মিসেস পারকার। তাঁকে সাহায্য করার জন্যে একজন কাজের লোক রেখেছেন. তাঁরই বয়েসী এক মহিলা, নাম আইলিন।

'সব চেয়ে বেশি অসুবিধে হবে থাকার,' বললেন মিসেস পারকার।

ঘর থেকে সবই শুনেছে আইলিন। ঝুল পরিষ্কার করতে করতে মাথা নাড়লো।

'ওই যে, আবার ডাকছে। তুমি কাজ করো, আমি শুনে আসি,' আবার ঘর থেকে বেরোলেন জিনার মা।

স্টাডি থেকে ডাকছেন মিস্টার পারকার। সে-ঘরে ঢুকলেন জিনার মা। 'আবার কি হয়েছে?'

'এই দেখো না, কি কাণ্ড,' রিসিভারটা ধরে রেখেছেন মিস্টার পারকার। 'প্রফেসর নাকি অনেক আগেই রওনা হয়ে গেছে। প্লেনে করে। ইংল্যাণ্ড থেকে আসতে আর কতো সময় লাগবে? আজই পৌঁছে যাবে···আর হ্যাঁ, সঙ্গে তার ছেলেকে নিয়ে আসছে!'

'তার ছেলে! সত্যি! আমি ওদের জায়গা দেবো কোথায়?'

'আর তো কোনো উপায় নেই। জিনাকেই ফোন করো। বুঝিয়ে বলো, আগামী হপ্তায় যেন আসে। নাও, ধরো,' রিসিভার বাড়িয়ে দিলেন মিস্টার পারকার।

ডায়াল করলেন মিসেস পারকার। 'হ্যাল্লো। কে?···মিসেস পাশা?··· কিশোর কোথায়?···রওনা হয়ে গেছে? কখন?···না না, এমনি। ওরা আসছে কিনা জানার জন্যে···হ্যাঁ। রাখি। গুড বাই।' রিসিভার নামিয়ে রাখলেন জিনার মা। জোরে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'রওনা হয়ে গেছে, সকালে। যে কোনো সময় এসে পড়বে। আমি এখন কি যে করি!···তোমাকে নিয়ে আর পারি না। খালি কথা ভুলে যাও। আর তোমার প্রফেসর বন্ধুও···'

'আমি কি করবো?' রেগে গেলেন বদমেজাজী বিজ্ঞানী। 'আমি চিঠি দিয়েছি আসার জন্যে, আসছে। টেলিগ্রাম পেলাম আজ···'

'সে-জন্যেই তো বলছি, খালি ভুলে যাও। তুমি তো জানো, ছেলেমেয়েগুলো আজ আসবে, তারপরেও চিঠি লিখতে গেলে কেন? আর লিখলেই যখন, আগামী হপ্তায় আসতে বললে কি হতো? আসুক, আমি কিছু জানি না। থাকার ব্যবস্থা তুমি করবে। আর না পারলে নিজে গিয়ে শুয়ো কয়লা রাখার ঘরে···'

'ওসব আমি জানি না,' কড়া গলায় বললেন মিস্টার পারকার। 'আইলিন আছে। দু'জনে মিলে একটা কিছু ব্যবস্থা করো গিয়ে। আমার অনেক কাজ। এই কাজগুলো,' টেবিলে রাখা কাগজের উঁচু একটা স্তূপ দেখালেন তিনি। 'সব পড়ে শেষ করতে হবে···যাও এখন। আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে···'

'তোমার যাচ্ছে! আর আমার হয়ে গেছে! আমি বলে দিচ্ছি···' জানালার দিকে চোখ পড়তে হঠাৎ থেমে গেলেন মিসেস পারকার। 'আরি, দেখো দেখো!'

দেখে মিস্টার পারকারও অবাক হলেন। 'বানর! ওটা এলো কোত্থেকে?'

নিচতলা থেকে আইলিনের ডাক শোনা গেল। 'ম্যাডাম, দেখে যান...বোধহয় আপনাদের মেহমান...' বানরটার দিকে হাঁ করে চেয়ে আছেন মিসেস পারকার। জানালার কাচে নাক ঘষছে ছোট্ট জীবটা, হাস্যকর শিশুসুলভ ভাবভঙ্গি। 'নিশ্চয় তোমার বন্ধু!' গুঙিয়ে উঠলেন তিনি। 'বানরটাও কি ওদের নাকি?' দুম দুম করে কিল পড়লো সদর দরজায়, সারা বাড়ি কেঁপে উঠলো।

তাড়াতাড়ি নিচের তলায় ছুটে এলেন দু'জনে।

হ্যাঁ, প্রফেসর কারসওয়েলই এসেছেন। সঙ্গে তাঁর ছেলে। বয়েস নয়-দশের বেশি না। বানরটা এখন বসে রয়েছে ছেলেটার কাঁধে, কখন কিভাবে নেমে এসেছে কে জানে। বানর আর তার মনিবের চেহারায় খুব একটা অমিল নেই।

এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি নিয়ে এসেছেন প্রফেসর। ড্রাইভারের দিকে চেয়ে বাজখাঁই গলায় হাঁকলেন, 'এই, বসে আছো কেন? ব্যাগট্যাগগুলো নামাও। হাঁ করে কি দেখছো?' মিসেস পারকারের দিকে ফিরলেন। 'এই যে, ম্যাডাম, ভালো আছেন? আবার এলাম আপনাকে জ্বালাতে।...তা আপনার স্বামী কোথায়?' বলতে বলতে ভেতরে ঢুকলেন তিনি। 'এই যে, হ্যারি। অনেক ইন্টারেস্টিং নিউজ আছে।'

এগিয়ে এসে হাত মেলালেন মিস্টার পারকার। 'আমার কাছেও আছে। চিঠি পেয়েই চলে এসেছো, খুব খুশি হয়েছি।'

'এই যে আমার ছেলে...' এতো জোরে ছেলের পিঠে থাবা মারলেন প্রফেসর, আরেকটু হলেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলো ছেলেটা। 'নামটা যেন কি? খালি ভুলে যাই। থাক,' বিরক্ত হয়ে হাত নাড়লেন কারসওয়েল। 'ডাক নামটাই বলি। টকার। মোটরকারের "মো" আর ট-এর পরে "র"-টা বাদ দিয়ে দিয়েছি। নিজেকে সারাক্ষণ মোটর গাড়ি ভাবে সে, আর বেশি কথা বলে, সে-জন্যেই এই নাম রেখেছি। হাহ্ হাহ্ হা!...আরে, নটি গেল কোথায়? দুষ্ট, দুষ্ট, ভীষণ দুষ্ট, তাই টকারই ওর নাম রেখেছে নটি। আরে গেল কোথায় বানরটা?'

বোবা হয়ে গেছেন যেন মিসেস পারকার। একনাগাড়ে কথা বলে চলেছেন প্রফেসর কারসওয়েল। কাউকে কিছু বলার সুযোগ দিচ্ছেন না। বানরটাকে দেখা গেল একটা স্ট্যাণ্ডের উপর--হ্যাট রাখার স্ট্যাণ্ড—আগায় চড়ে বসে প্রাণপণে দোলাচ্ছে; যেন প্রতিজ্ঞা করেছে সবগুলো হ্যাট মাটিতে না ফেলে ছাড়বে না।

এ-তো সার্কাস বানিয়ে ফেলবে!...হতাশ হয়ে ভাবলেন মিসেস পারকার— আমি এখন কি যে করি! ঘরগুলোও পরিষ্কার হয়নি ঠিকমতো। দুপুরের খাবারেরই বা কি হবে? ইতিমধ্যে ছেলেমেয়েগুলোও যদি এসে যায়...আর বানরটা যা শুরু করেছে! হ্যাটগুলো ফেলে এখন গিয়ে বসেছে হলের বড় আয়নাটার সামনে।

নিজেকেই মুখ ভেঙচাচ্ছে।

সবার সঙ্গে কিভাবে যে লিভিংরুমে ঢুকলেন মিসেস পারকার, বলতে পারবেন না। মিস্টার পারকার ছুটে গিয়ে স্টাডি থেকে একগাদা কাগজ এনে টেবিলে বিছিয়ে বসে পড়লেন ওখানেই। আলোচনার জন্যে। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করতে চান না।

'এখানে নয়!' এতোক্ষণে মুখ খুললেন মিসেস পারকার, কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'তোমার স্টাডিতে যাও।...আইলিন, প্রফেসর সাহেবের মালপত্রগুলো গেস্টরুমে দিয়ে এসো। ছেলেটা এঘরেই থাকবে, সোফায় শোয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। যাও, জলদি রেখে এসো।'

'বানরটার কি হবে?' আড়চোখে ওটার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলো আইলিন। 'ওটারও কি বিছানা...'

'ও আমার সঙ্গেই থাকবে,' বয়েস আর শরীরের তুলনায় অস্বাভাবিক জোরালো কণ্ঠ ছেলেটার। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে সিঁড়ির দিকে দিলো দৌড়। বিচিত্র শব্দ করছে।

অবাক হয়ে বললেন মিসেস পারকার, 'কি হলো? পেট ব্যথা?'

'না না,' বললেন তার বাবা। 'ওসব কিছু না। বললাম না, মোটরগাড়ির পাগল। নিজেকে মোটরগাড়ি ভাবে। দৌড়ায় আর এঞ্জিনের শব্দ করে।'

'আমি একটা গাড়ি, জাগুয়ার কার।' সিঁড়ির মাথা থেকে চেঁচিয়ে জবাব দিলো টকার। 'এঞ্জিনের শব্দ শুনছেন না? হি-র-র-র-র-র!...এই নটি, জলদি আয়। গাড়িতে চড়বি না?'

প্রায় চোখের পলকে সিঁড়ি পেরিয়ে লাফ দিয়ে গিয়ে মনিবের কাঁধে চড়ে চুল খামচে ধরলো নটি। তীক্ষ্ণ কিচমিচ করে উঠলো। ছুটলো জাগুয়ার। প্রচণ্ড গতিতে বেডরুমের ভেতর থেকে ঘুরে এলো একবার, মাঝে মাঝে বিকট শব্দে হর্ন দিচ্ছে।

'সব সময় ওরকম করে?' প্রফেসরের দিকে চেয়ে বললেন মিসেস পারকার। 'কাজ করেন কিভাবে?'

'না, অসুবিধে হয় না,' জানালেন প্রফেসর। 'বাগানে একটা সাউণ্ডপ্রুফ ঘর বানিয়ে নিয়েছি। হ্যারি, তোমার স্টাডিও সাউণ্ড প্রুফ, না?'

'না, ভাই,' জাগুয়ারের শব্দ সইতে না পেরে কানে আঙুল দিলেন মিস্টার পারকার। ছেলে একখান কারসওয়েলের! দুই মিনিটে পাগল করে দেবে সুস্থ মানুষকে! এক হপ্তা কাটবে কি করে? তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'চলো, স্টাডিতে চলো।'

স্টাডিতে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন দুই বিজ্ঞানী। কিন্তু বৃথা। এ-বাড়ির এমন কোনো দরজা নেই, যা ওই 'হর্নের' শব্দ ঠেকাতে পারে।

ব্যাগ-সুটকেস নিয়ে কুলাতে পারছে না আইলিন। সারা বছরের জন্যে যেন

চলে এসেছেন প্রফেসর, এতো মালপত্র এনেছেন। কোনো হোটেলে গিয়ে উঠলো না কেন?—সেগুলোর দিকে চেয়ে থেকে ভাবছেন মিসেস পারকার। জিনারাও এলো বলে। আর সঙ্গে রাফিয়ানকে না নিয়ে আসবে না জিনা। এতগুলো প্রাণী থাকার জায়গা কোথায় করবেন তিনি?

দুই

বাস থেকে নেমেই চারটে সাইকেল ভাড়া করলো জিনা। এক হপ্তা থাকবে বাড়িতে। ততোদিন ঘোরাঘুরির জন্যে সাইকেল দরকার। ক্যারিয়ারে মালপত্র তুলে নিয়ে সাইকেলে চেপে গোবেল ভিলার উদ্দেশে চললো চারজনে। পাশে পাশে দৌড়ে চললো রাফিয়ান।

'দারুণ হবে, না!' প্যাডাল ঘোরাতে ঘোরাতে বললো মুসা। 'দোতলার জানালা দিয়ে সাগরের দিকে চেয়ে থাকা, খোলা সাগর, খোলা আকাশ! জিনা, এবারও কি তোমার দ্বীপে পিকনিক করতে যাবে?'

'দেখি,' বললো জিনা। 'এখন গিয়ে বোধহয় সুবিধে হবে না, বৃষ্টির দিন তো। যখন তখন নামবে, দ্বীপে আরাম পাবো না।'

'বাড়িতেই বা মন্দ কি?' রবিন বললো। 'আর ক্যারোলিন আন্টিও যা ভালো না...বেশি হৈ-চৈ করবো না আমরা, আংকেলকে ডিস্টার্ব না করলেই হবে। তাহলেই আর চটবেন না।'

'আমার মনে হয় না বাবার হাতে এখন কোনো জরুরী কাজ আছে,' বললো জিনা।

'থাকতেও পারে,' বললো কিশোর। 'চুপচাপ বসে থাকতে হলেই মরেছি। কিছু একটা কাজ না পেলে শুধু সাগর আর আকাশ দেখে কি করে কাটাবো?'

কি কাজের কথা বলছে কিশোর, বুঝতে পারলো অন্য তিনজন। 'রহস্য' কিংবা 'অ্যাডভেঞ্চার'। কিশোর পাশার নেশা।

এগিয়ে চলেছে ওরা।

একপাশে সাগর, ঘন নীল একটা বিশাল আয়না যেন, চকচক করছে উজ্জ্বল রোদে।

'সত্যি তুমি লাকি, জিনা,' সেদিকে চেয়ে মুসা বললো। 'এতো সুন্দর জায়গায় বাড়ি...'

হাসলো শুধু জিনা।

'ওই যে তোমাদের বাড়ির চিমনি,' কিছুক্ষণ পর আবার বললো মুসা। 'ধোঁয়া

উড়ছে! নিশ্চয় রান্নাঘরের। আমরা এতোগুলো মানুষ যাচ্ছি, দুপুরের রান্না চড়িয়েছেন ক্যারোলিন আন্টি...আহ্, মনে হচ্ছে এখান থেকেই সুগন্ধ পাচ্ছি!'

গতি বাড়িয়ে দিলো সে।

তার কাণ্ড দেখে হেসে উঠলো সবাই।

গোবেল ভিলার পেছনের গেটে এসে সাইকেল থেকে নামলো চারজন। গ্যারেজের পাশের ছাউনিতে নিয়ে গিয়ে রাখলো সাইকেলগুলো। তারপর চিৎকার করতে করতে দৌড় দিলো জিনা, 'মা, মাআ, আমরা এসে গেছি! কোথায় তুমি? মা?'

পাশে ছুটছে তিন গোয়েন্দা।

হঠাৎ খপ করে জিনার হাত চেপে ধরলো রবিন। 'জিনা, দেখো! ওই যে, জানালায়!'

'আরে, বানর এলো কোত্থেকে!...এই এই, রাফি, যাবি না! খবরদার!...আয়, আয় বলছি!'

কিন্তু রাফিয়ানকে থামানো গেল না। জানালার কাচে নাক ঠেকিয়ে রাখা ছোট্ট জীবটাকে চিনতে পারছে না কুকুরটা। ওটা কি ছোট কোনো কুকুর? নাকি অদ্ভুত কোনো বেড়াল? যা-ই হোক, তাড়াবে ওটাকে, বাড়িছাড়া করে ছাড়বে। গলা ফাটিয়ে ঘেউ ঘেউ করে দরজার দিকে দৌড় দিলো সে। বেরিয়ে আসছিলো টকার, বিশাল কুকুরের ধাক্কা খেয়ে উল্টে পড়ে গেল। আতঙ্কিত হয়ে বানরটা লাফ দিয়ে গিয়ে ধরলো দেয়ালে ঝোলানো একটা ছবির ফ্রেম, কিনার ধরে ঝুলে রইলো।

'এই কুত্তা!' হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়ালো টকার। 'আমার নটিকে ছুঁবি না! খবরদার বলে দিচ্ছি!' বলেই ঠাস করে এক চড় মারলো রাফিয়ানের নাকেমুখে।

ছুটে গিয়ে দ্বিগুণ জোরে ছেলেটার গালে চড় মারলো জিনা। চেঁচিয়ে বললো, 'শয়তান ছেলে কোথাকার! এত্তোবড় সাহস! আমার রাফির গায়ে হাত দিস! ওটা কি, ওই বাঁদরটা?'

মনিবের দুরবস্থা দেখে আরও ঘাবড়ে গেল বানরটা। ছবি ধরে ঝুলে থেকে বিচিত্র কিচির মিচির জুড়ে দিলো। হট্টগোল শুনে দোতলা থেকে নেমে এলো আইলিন। জিনা কিংবা তিন গোয়েন্দাকে আগে দেখেনি সে, তবে বলে দিতে হলো না ওরা কারা। চিনতে পারলো। বললো, 'কি হয়েছে, জিনা? বানরটা কি করেছে?...আরে এই রাফি, থাম! বাড়ি মাথায় করে ফেলেছিস তো! এই ছেলে, তুমি কাঁদছো কেন? তোমার বানরকে খেয়ে ফেলছে নাকি?'

'কে বললো কাঁদছি?' তেজের সঙ্গে জবাব দিলো টকার। দু'হাতে চোখ ডলছে। 'নটি, নেমে আয়। আয় বলছি...হারামজাদা কুত্তা খালি ছুঁয়ে দেখুক না

তোকে…'

'না না, কিছু করবে না,' এগিয়ে এসে অভয় দিয়ে বললো কিশোর। 'তুমি তোমার বানরটাকে নামাও। ছবিটা ফেলে দেবে তো।'

জিভ টাকরায় লাগিয়ে চুকচুক করে ডাকলো টকার। ছবি ছেড়ে দিয়ে তার কাঁধে লাফিয়ে নামলো নটি। গলা জড়িয়ে ধরে কুকুরটার দিকে চেয়ে কিচমিচ করে উঠলো। ভয় যাচ্ছে না।

'এই রাফি,' ধমক দিলো মুসা। 'ওটা তোর সমান হলো নাকি? থাম।'

'ওকে ধমকাচ্ছো কেন?' জিনার চোখে আগুন জ্বলছে। 'ঠিকই তো করছে ও। কে না কে এসে বাড়িতে ঢুকে বসে আছে!…এই ছেলে, কে তুমি?'

'বলবো না!' রাগে গটমট করে বেরিয়ে গেল টকার।

'আপনি নিশ্চয় আইলিন? আমি মুসা আমান। ছেলেটা কে?'

'মিস্টার পারকারের বন্ধু, প্রফেসর কারসওয়েলের ছেলে। আজই এসেছে। আগামী হপ্তায় আসার কথা ছিলো, আগেই এসে বসে আছে।'

'এখানে থাকবে নাকি?' আঁতকে উঠলো জিনা। 'বাবার তো নেইই, মারও আক্কেল নেই! জানে না, আমরা আসছি? জায়গা দিলো কেন?'

'থামো, জিনা,' হাত তুললো কিশোর। 'শান্ত হও। আগে শুনিই না সব কথা। হয়তো কোনো ভুল হয়েছে…'

'হ্যাঁ, ভুলই,' বললো আইলিন। 'মিস্টার পারকার ভুলেই গেছেন, তোমরা আসছো। বন্ধুকে আসার জন্যে চিঠি-লিখে দিয়েছেন। বন্ধুও চিঠি পেয়ে আর এক মুহূর্ত দেরি করেননি, এক হপ্তা আগেই চলে এসেছেন। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন ছেলেকে, তার সঙ্গে আবার একটা বানর। জিনার মা তো ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। এতোগুলো মানুষের থাকার জায়গা করবেন কোথায়? প্রফেসর নাহয় গেস্টরুমে থাকলেন, তাঁর ছেলে সোফায়। কিন্তু তোমরা…'

'আমি ওসব বুঝি না,' সব শুনে রাগ আরও বাড়লো জিনার। 'এখুনি গিয়ে মাকে বলছি…'

'পাগলামি করো না, জিনা,' বিরক্ত হয়ে বললো কিশোর। 'ব্যবস্থা একটা হবেই। তোমার রাগ সামলাও।'

'হ্যাঁ, ব্যবস্থা করা হচ্ছে,' বললো আইলিন। 'চিলেকোঠায় দুটো ম্যাট্রেস বিছিয়ে দেবো, তোমরা তিনজন থাকতে পারবে,' তিন গোয়েন্দার দিকে আঙুল নাড়লো সে। 'কিন্তু যা ধুলো জমেছে, সাফ করতে লাগবে একদিন…বাতাসও খুব বেশি। ঝড় এলে আর উপায় নেই। ঠাণ্ডায়…'

'তাতে কিছু হবে না,' হাত নেড়ে বললো কিশোর। 'ধুলো আমরাই সাফ করে

নিতে পারবো। আর ঠাণ্ডার সময় কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকবো, আরামই লাগবে। আন্টি কই? মেজাজ নিশ্চয়ই খারাপ?'

'হবে না? তিনি বলেই সামলে নিয়েছেন। অন্য কেউ হলে…আর প্রফেসরেরই কেমন আক্কেল? অন্যের বাড়িতে এমনভাবে ঢুকে পড়লেন, যেন তাঁর নিজের বাড়ি। মালপত্র দিয়েই বোঝাই করে ফেলেছেন ঘর। তার ওপর আবার একটা আজব ছেলে আর বানর! আমি যখন থালাবাসন ধুই, কেমন জুলজুল করে চেয়ে থাকে ওটা, মনে হয় এসে আমার সঙ্গে সে-ও হাত লাগাতে চায়।'

রান্নাঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন জিনার মা। 'এই যে, এসে পড়েছো,' হেসে বললেন। 'রাফির ডাক শুনলাম। রাফি, দেখে চমকে যাবি, একটা বানর এসেছে।'

'চমকে গেছে এসেই,' মুখ কালো করে বললো জিনা। 'মা, তুমি জানো আমরা আসছি। তার পরেও কি করে ওদের জায়গা দিলে?'

'আহ্, জিনা, কি শুরু করলে?' তাড়াতাড়ি বললো কিশোর। 'তুমি এমন করতে থাকলে আমরা চলেই যাবো।…আন্টি, আপনি কিছু ভাববেন না। দরকার হলে দ্বীপে গিয়ে থাকবো আমরা…'

'তুমি খুব ভালো ছেলে, কিশোর,' হাসলেন মিসেস পারকার। অস্বস্তি দূর হলো চেহারা থেকে। 'প্রফেসর না এলে কোনো অসুবিধে হতো না তোমাদের, জানোই তো। আর যেমন প্রফেসর কারসওয়েল, তেমনি তোমার আংকেল। দু'জনেই এমন ভুলো মন। সারাদিন না খেয়ে থাকলেও মনে করতে পারবে না। ভাববে, হায় হায়, পেটে মোচড় দেয় কেন!'

হেসে উঠলো সবাই।

হঠাৎ দরজার দিকে ঘুরে ঘেউ ঘেউ শুরু করলো রাফিয়ান। আবার বানরটার গন্ধ পেয়েছে। কিচমিচ শুনে ছুটে গেল। কী, বাঁদরের বাচ্চা, আমাকে গাল দেয়! এতোবড় সাহস! আজ তোর একদিন কি আমার একদিন! —এমনি ভাবসাব কুকুরটার।

সিঁড়ির রেলিঙে বানরটা বসে আছে। রাফিকে দেখেই নাচতে শুরু করলো, মুখ ভেঙচাচ্ছে।

লাফ দিয়ে সিঁড়িতে উঠলো রাফিয়ান। কিন্তু বানরটাকে ধরতে পারলো না। তাতে রাগ গেল আরও বেড়ে। তারস্বরে চেঁচাতে লাগলো।

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল স্টাডির দরজা। গটমট করে বেরিয়ে এলেন দুই প্রফেসর। রাগে চোখমুখ লাল।

'কী, হয়েছে কি!' চেঁচিয়ে উঠলেন মিস্টার পারকার। 'শান্তিতে কাজ করতে

পারবো না নাকি?'

'না না, পারবে পারবে,' বললেন বটে মিসেস পারকার, কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারছেন, সারাদিনই ঘটতে থাকবে এ-ধরনের ঘটনা। 'বানরটাকে নতুন দেখেছে তো, সহ্য করতে পারছে না এখনও রাফি। ঠিক হয়ে যাবে সব। যাও, কাজ করোগে। দরজাটা বন্ধ করে দিও। আমি দেখবো, আর যেন গোলমাল করতে না পারে।'

ঘাউ-ঘাউ করে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করছে রাফিয়ান। চোখে পড়লো প্রফেসরকে। নতুন লোক দেখে সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো তাঁর ওপর। সিঁড়ি থেকে নেমে তেড়ে এলো।

এক দৌড়ে গিয়ে স্টাডিতে ঢুকে পড়লেন কারসওয়েল।

হাসি থামাতে পারলো না ছেলেরা। বিশেষ করে মুসা। হাসতে হাসতে চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে গেল তার।

'জিনা, কুত্তাটাকে থামা!' গর্জে উঠলেন মিস্টার পারকার। 'নইলে দেবো বিদেয় করে!' বলে আর দাঁড়ালেন না। চলে গেলেন কাজের ঘরে।

'উঁহ্, দেবো বিদেয় করে!' পেছন থেকে মুখ ভেঙচে বললো জিনা। ভাগ্যিস তার বাবা শুনতে পাননি। 'মা, বাবাকে হুঁশিয়ার করে দিও। রাফি চলে গেলে আমিও যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাবো।...আরি, বানরটার কাণ্ড দেখো! আরে ঘড়ির ওপর বসেছে তো! নষ্ট না করে দেয়!...বিদেয় করবে, বললেই হলো। কেন, রাফিকে কেন, ওই বাঁদরের বাচ্চাটাকে দেখে না?'

তিন

কাজে হাত দিলো তিন গোয়েন্দা। টেনেহিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে চিলেকোঠায় তুললো দুটো পুরনো ম্যাট্রেস। ঠাণ্ডা বাতাস! কিন্তু কি করার আছে? বাইরে তাঁবুতে থাকলে ঠাণ্ডা আরও বেশি লাগবে।

গাল ফুলিয়েই রেখেছে জিনা।

'ওরকম করে রাখলে শেষে আবার নামাতে পারবে না,' ঠাট্টা করলো মুসা। 'ফুলেই থাকবে। হাসো, হাসো। তোমার মায়ের কথা একবার ভাবো? আমাদের চেয়ে তাঁর অবস্থা বহুত খারাপ। কি চিন্তায়ই না পড়েছেন!'

আসলেই মিসেস পারকারের অবস্থা কাহিল। নয়জন লোকের খাবার জোগাড় করা, সহজ ব্যাপার নয়। রান্নাঘর থেকে আর বেরানোর জো নেই বেচারি আইলিনের। ছেলেমেয়েরা ঘরের কাজে সাহায্য করলো। সাইকেল নিয়ে বাজারে

গেল বাজার করে আনতে।

'ওই টকারটা কিছু করে না কেন?' পরের দিন রাগ করে বললো জিনা।

'করে না কে বললো? ওই তো করছে,' হেসে বাগানের দিকে দেখালো রবিন।

বাগানময় ছুটে বেড়াচ্ছে ছেলেটা। ভীষণ শব্দ করছে।

'এই টকার, চুপ করবে?' ডেকে বললো জিনা। 'তোমার বাবার কাজে অসুবিধে হচ্ছে...'

'তুমি চুপ করো!' ধমক দিয়ে বললো টকার। 'দেখছো না আমি এখন বেন্টলি কার হয়েছি? ভারি শক্তিশালী এঞ্জিন। আর এই দেখো, ব্রেক করলে কেমন নিঃশব্দে থেমে যায়, একটুও ঝাঁকুনি লাগে না। আর দেখো...' বলেই জোরে পোঁ-পোঁ করে হর্ন বাজালো দু'বার। 'দারুণ, তাই না?'

খুলে গেল স্টাডিরুমের জানালা। দেখা গেল দুই বিজ্ঞানীর ক্রুদ্ধ মুখ।

'এই টকার, কি হচ্ছে?' রেগেমেগে বললেন কারসওয়েল। 'এতো হৈ-চৈ কিসের? চুপ করে থাকতে পারো না?'

বেন্টলি গাড়ি কিছুতেই নিঃশব্দে চলতে পারে না, বোঝানোর চেষ্টা করলো টকার। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে চাইলেন না 'বোকা' মানুষ দু'জন। শেষে একটা মিনি-কার হওয়ার অনুমতি চাইলো সে। 'এই দেখো না, বাবা, কেমন আস্তে শব্দ করে,' ছুটতে ছুটতে শব্দ করে দেখালো টকার। 'ধরতে গেলে কোনো শব্দই নেই...'

দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল জানালা।

দরজা খোলা পেয়ে সোজা রান্নাঘরে ঢুকে পড়লো মিনি-কার। জানালো, খুব খিদে পেয়েছে। খাবার পাওয়া যাবে কি?

'গাড়িটাড়িকে খাওয়াই না আমি,' জবাব দিয়ে দিলো আইলিন। 'এখানে পেট্রল নেই। যাও, ভাগো।'

এঞ্জিনের মৃদু গুঞ্জন তুলে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলো মিনিকার, যাত্রী খুঁজতে লাগলো। জানালার চৌকাঠে বসে আছে নটি, ডাকতেই লাফ দিয়ে গিয়ে চড়ে বসলো দু'পেয়ে গাড়ির কাঁধে। গাড়ির চুল খামচে ধরে রইলো, যাতে ঝাঁকুনি লাগলে পড়ে না যায়।

সারা বাগানে চক্কর দিতে লাগলো গাড়ি। মাঝে মাঝেই তীক্ষ্ণ হর্ন বেজে ওঠে।

'আজব ছেলে।' আইলিনের দিকে চেয়ে বললেন মিসেস পারকার। 'ভালোই লাগছে ওকে। এই ঝামেলা না থাকলে বসে বসে দেখতাম আর কি করে? গাড়ির এমন পাগল...'

তার পরদিন থেকে শুরু হলো বৃষ্টি। বাইরে বেরোতে পারে না টকার। ঘরের ভেতরেই গাড়ি চালাতে শুরু করলো। প্রায় পাগল করে তুললো ঘরের সবাইকে।

'দেখো,' বিশ বারের মাথায় আর সইতে না পেরে ধমক দিলো আইলিন। 'তুমি মরিস মাইনর, স্টিন, কনসাল, নাকি রোলস, কিচ্ছু শুনতে চাই না আমি। আর রান্নাঘরে ঢুকবে না, ব্যস। রোলস রয়েসের মতো গাড়ির লজ্জা করে না, রুটি চুরি করে?'

'রোলসের কি দোষ?' প্রতিবাদ করলো টকার। 'পেট্রল পায় না, কিছু খেয়ে তো বাঁচতে হবে তাকে? চলতে তো হবে? আর খালি আমাকে বকেন কেন? নটি আপেল চুরি করছে, তাকে যে কিছু বলেন না?'

'আবার ঢুকেছে নাকি?' আঁতকে উঠে দৌড় দিলো আইলিন। 'বলি, দরজাটা কে খুলেছে? কে?'

'রাফিয়ান,' নির্দ্বিধায় বলে দিলো টকার।

'এই, এই শয়তান, বেরো বেরো!' ভাঁড়ারে ঢুকে চেঁচাতে লাগলো আইলিন। বানরটাকে বের করে দিয়ে বেরিয়ে এলো। 'রাফি খোলেনি। ও খুব ভালো, তোমার বানরটার মতো চোর না।'

'নটিও খুব ভালো।'

'ভালো, না? রাফি ওকে ধরতে পারলে দেখাবে মজা। আজ যা একখান কাজ করে এসেছে না নটি। রাফি খুব রেগে আছে।'

'কি করেছে, নটি?'

'কি করেছে? রাফির বাসন থেকে হাড় চুরি করে ফেলে দিয়েছে। ঘাউ করে তেড়ে এসেছিলো রাফি। ধরতে পারেনি, তাই বেঁচে গেছে বানরটা। আরেকটু হলেই আজ লেজ হারাতে হতো। কামড়ে ছিঁড়ে নিতো রাফি।'

শঙ্কিত হলো টকার। কণ্ঠস্বর নরম করে বললো, 'আপনারা কেউ ওকে দেখতে পারেন না। অথচ নটি কতো ভালো। দেখেন না, কেমন বেজার হয়ে বসে আছে?'

এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে ছোট্ট বানরটা। এক হাত মাথায় রেখে আরেক হাতে মুখ ঢেকেছে। বাদামী একটা চোখ চেয়ে রয়েছে আঙুলের ফাঁক দিয়ে, বিষণ্ন, যেন নীরবে কাঁদছে।

'আরে, আবার ন্যাকামিও জানে!' হেসে ফেললো আইলিন। 'এই নে, একটা বিস্কুট নে। খবরদার, আর কখনও চুরি করবি না।'

চোখের পলকে বিষণ্নতা দূর হয়ে গেল বানরটার। লাফ দিয়ে এসে ছোঁ মেরে প্রায় কেড়ে নিলো বিস্কুটটা। ছুটে গেল দরজার দিকে।

দরজা বন্ধ। এগিয়ে গিয়ে খুলে দিলো টকার। সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ঢুকলো রাফিয়ান। নাক উঁচু। চুলায় চড়ানো গরম স্যুপের মিষ্টি গন্ধ শুঁকছে।

তড়াক করে এক লাফে গিয়ে একটা চেয়ারের ওপর উঠলো নটি। ভয়ে গুটিয়ে উঠলো। যেন বিশাল কুকুরটার কাছে মাপ চাইছে।

এক কান খাড়া করলো রাফিয়ান, নাড়লো। বানরটার ভাষা যেন বুঝতে পারছে। ফিরে তাকালো।

এক অদ্ভুত কাণ্ড করলো বানরটা। আইলিনকে সাংঘাতিক অবাক করে দিয়ে বিস্কুটটা বাড়িয়ে ধরলো রাফিয়ানের দিকে। নিচু স্বরে কিচমিচ করছে।

দীর্ঘ এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো কুকুরটা। তারপর এগিয়ে গিয়ে মুখে নিলো বিস্কুটটা। দুই চিবান দিয়েই কোঁৎ করে গিলে ফেললো।

'আশ্চর্য!' আনমনে বিড়বিড় করলো আইলিন। 'কি বুদ্ধি! সকাল বেলা হাড় চুরি করেছে। অপরাধ করে ফেলেছে। বিস্কুট দিয়ে এখন মাপ চেয়ে নিচ্ছে।'

লম্বা জিভ বের করে ঠোঁট চাটলো রাফিয়ান। তারপর হঠাৎ আগ বাড়িয়ে নটির খুদে নাকটা চেটে দিলো। হয়ে গেল ভাব।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না আইলিন। জিনাকে খবরটা জানানোর জন্যে দোতলায় ছুটলো।

শুনে জিনা বিশ্বাসই করতে চাইলো না। আইলিনের চাপাচাপিতে শেষে নিচে নেমে এলো।

নটি তখন রাফিয়ানের পিঠে উঠে ঘোড়া চড়ছে। আর আনন্দে হাততালি দিয়ে চেঁচাচ্ছে টকার। 'আরো, আরো জোরে হাঁট, রাফি। রেসের ঘোড়ার মতো ছুটতে পারিস না…'

'না-আ!' চিৎকার করে উঠলো জিনা। 'এই রাফি, থাম! বানরটাকে নামা পিঠ থেকে। গাধা হয়ে গেছিস নাকি?'

পিঠ থেকে নেমে রাফিয়ানের পায়ের ফাঁকে গিয়ে ঢুকলো বানরটা। ভয়ে ভয়ে তাকালো জিনার দিকে।

রাফিয়ান বুঝতে পারলো, তার মনিব রেগে গেছে। জিনার দিকে চেয়ে বিচিত্র মুখভঙ্গি করলো, যেন হাসলো। তারপর আলতো করে চেটে দিলো বানরটার মাথা। যেন বলতে চাইছে, 'ভয় নেইরে! আমার মনিবকে বাইরে থেকেই ভয় লাগে। ভেতরটা ওর বড় ভালো।'

চোখে পানি এসে গেল আইলিনের। তার মনে হলো, রাফিয়ানের মতো ভালো কুকুর আর দুনিয়ায় নেই। বললো, 'দেখলে, জিনা, কতো বড় হৃদয় ওর! বানরটার সঙ্গে দোস্তি করেছে বলে ওকে আর কিছু বোলো না।'

'বলবো, কে বললো আপনাকে?' সত্যি সত্যি অবাক মনে হলো জিনাকে। 'রাফির মতো ভালো কুকুর সারা পৃথিবীতে আর একটিও নেই।' এগিয়ে গিয়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো ওটার মাথায়।

জিনার হাত চেটে দিলো রাফিয়ান। নটির দিকে তাকালো। মনের ভাব, আর ভয় নেই। এবার সবাই আমরা বন্ধু হয়ে গেলাম।

এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে টকার। জিনার ভয়ে। কিন্তু কুকুরটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দেখে ভয় কাটলো তার, হাসলো। এতো জোরে লরির এঞ্জিনের মতো গর্জে উঠলো, চমকে গেল সবাই। ভেঁপু বাজালো জোরে। অর্থাৎঃ সরো, সরো, আমি এখন ছুটতে শুরু করবো।

'আরে থামো, থামো!' তাড়াতাড়ি বাধা দিলো আইলিন।

'চুপ, বোকা ছেলে,' বললো জিনা।

'হুফ!' রাফিয়ান বললো।

'এভাবে ভেঁপু বাজালে এখুনি এসে হাজির হবেন দুই প্রফেসর,' আইলিন বললো। 'এই ছেলে, শান্ত কিছু হতে পারো না? এই যেমন ধরো, সাইকেল?'

কথাটা মনে ধরলো টকারের। সাইকেলের চাকার মৃদু হিসহিস আওয়াজ তুলে রান্নাঘর থেকে ছুটে হলে বেরোলো। তারপর বেল বাজালো টিংটিং করে। শব্দটা এতোই নিখুঁত আর বাস্তব মনে হলো, মিসেস পারকার ভাবলেন, কেউ বুঝি এসেছে। কে এসেছে, দেখার জন্যে বেরিয়ে এলেন তিনি।

প্রায় একই সময়ে খুলে গেল স্টাডির দরজা। বেরিয়ে এলেন দুই বিজ্ঞানী। টকারকে ধরে ঝাঁকাতে শুরু করলেন কারসওয়েল। পকেট থেকে ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে মেঝেতে পড়লো দুটো পেন্সিল।

চেঁচাতে লাগলো টকার। গলা ফাটিয়ে। আর তার গলার যা জোর!

চেঁচামেচি শুনে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলো জিনা। চিলেকোঠা থেকে তিন গোয়েন্দা। আইলিনও বেরোলো, আরেকটু হলেই ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলো রান্নাঘরের দরজার কাছে দাঁড়ানো মিসেস পারকারকে।

ব্যাপার দেখে আর হাসি চাপতে পারলো না জিনা। তার রাগ যেমন বেশি, হাসিও বেশি। হাসতে শুরু করলে থামতে চায় না। হো হো করে হাসছে।

কিন্তু জিনার মতো মজা পেলেন না দুই প্রফেসর। বরং বিরক্তিতে কুঁচকে গেল ভুরু।

'এই মেয়ে!' রাগে জ্বলছে মিস্টার পারকারের চোখ। 'কি হয়েছে? এতো হাসির কি হয়েছে, শুনি? ছেলেটাকে আরও আসকারা দিচ্ছো? পেয়েছো কি? জানো না, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ করছি আমরা? দুনিয়ার মানুষের কতো

উপকার হবে, আমরা সফল হলে! ক্যারোলিন, বের করো ওদের। আর সহ্য করবো না। যেখানে খুশি যাক। শুনেছো? যেখানে খুশি!'

গটগট করে হেঁটে গিয়ে স্টাডিতে ঢুকলেন তিনি।

টকারকে ছেড়ে কারসওয়েলও তাঁর পিছু নিলেন।

দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

চার

ঘটনার আকস্মিকতায় বোবা হয়ে গেছেন মিসেস পারকার। কি করবেন এখন? ওই বিজ্ঞানীগুলো যে কি! সারা দুনিয়ার মানুষের শান্তির জন্যে, সুখের জন্যে, ওদের চোখে ঘুম নেই, দুশ্চিন্তার অন্ত নেই, অথচ নিজের ঘরের লোকের সুখের কথা একবারও যদি ভাবে!

জিনার গোমড়া মুখের দিকে চেয়ে হাসলেন তিনি। হাত ধরে টানলেন, 'আয়, লিভিংরুমে। একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। এভাবে চলতে পারে না। তোর বাবা সত্যি একটা জরুরী কাজে ব্যস্ত, এ-সময় তাকে ডিসটার্ব করা ঠিক হচ্ছে না।'

ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে লিভিংরুমে ঢুকলেন তিনি। আইলিন সঙ্গে এলো। রাফিয়ানও এলো পিছু পিছু। নটিকে দেখা যাচ্ছে না। ভয় পেয়ে গিয়ে কোথাও লুকিয়েছে।

সোফায় বসলো সবাই। রাফিয়ান গিয়ে ঢুকলো একটা টেবিলের তলায়, সামনের দুই পা ছড়িয়ে দিয়ে তার ওপর থুতনি রাখলো।

আলোচনা শুরু হলো।

'মা,' জিনা বললো। 'এটা আমাদের বাড়ি। কেন এখান থেকে যাবো…'

'হয়েছে হয়েছে,' হাত তুললেন মা। 'তুইও যেমন, তোর বাপও তেমন। কথায় কথায় রেগে যাস, আবার ঠাণ্ডা হতেও সময় লাগে না। আমার হয়েছে যতো জ্বালা…যাকগে, এখন একটা উপায় বের করা দরকার।'

'আসলে, এখান থেকে আমাদের এখন চলে যাওয়া উচিত,' বললো কিশোর।

'এক কাজ করলেই পারি,' মুসা বললো। 'গোবেল দ্বীপে…'

'হ্যাঁ, গোবেল দ্বীপ,' রবিনও সায় জানালো।

কিন্তু মিসেস পারকার মাথা নাড়লেন। 'না, এখন আবহাওয়া ভালো না। বৃষ্টির যা মতিগতি, চলতেই থাকবে। ঝড়ও আসতে পারে। এই সময় দ্বীপে গিয়ে, বৃষ্টিতে ভিজে শেষে অসুখ বাধাবে।'

'তাহলে তোমার কি পরামর্শ?' জিনার রাগ যাচ্ছে না।

'খাইছে!' বলে উঠলো মুসা। 'ওই বানরটা কি শুরু করেছে? থামাও না ওকে।'

'কি দরকার?' টকার বললো। 'আগুন খোঁচাচ্ছে, খোঁচাক। ঠাণ্ডা লাগছে হয়তো ওর।'

'আবার একটা ঝামেলা বাধাবে,' দ্রুত গিয়ে বানরটার হাত থেকে আগুন খোঁচানোর লোহার দণ্ডটা কেড়ে নিলো আইলিন। 'এই নটি, ঘরে আগুন লাগাতে চাস? যা, সর।'

'এই জন্যেই নাম হয়েছে বান্দর,' বিমল হাসিতে ঝকঝকে শাদা দাঁত বেরিয়ে গেল মুসার।

'বেশ,' আবার শুরু করলো জিনা। 'দ্বীপে যেতে মানা করছো। এখানেও থাকতে দেবে না। যাবো কোথায়? আমি কোনো হোটেলে-টোটেলে যেতে পারবো না বাপু, আগেই বলে দিলাম।'

নীরবতা। সমস্যাটা কঠিন।

'আমি জানি, কোথায় যাবো!' চেঁচিয়ে উঠলো টকার।

'বেহেশতটা কোথায় শুনি?' ভুরু নাচালো জিনা।

'লাইট-হাউস,' সবাইকে অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে থাকতে দেখে মাথা ঝোঁকালো টকার। 'হ্যাঁ, আমার লাইট-হাউস। এমন করে তাকাচ্ছো কেন? লাইট-হাউস চেনো না নাকি?'

'দেখো, টকার,' শান্তকণ্ঠে রবিন বললো, 'এটা মজা করার সময় নয়।'

'মজা করছি না। বিশ্বাস না হলে বাবাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখো।'

'কিন্তু টকার,' মিসেস পারকার হাসলেন। 'তোমার বয়েসী কেউ লাইট-হাউসের মালিক হতে পারে না, তাই না?'

'আমি হয়েছি,' রেগে উঠলো টকার। 'শান্তিতে কাজ করার জন্যে বাবা ওটা কিনেছিলো। কিছুদিন কাজও করেছিলো। আমি গিয়েছিলাম সঙ্গে। আহ্, কি সুন্দর জায়গা! বাতাস আর বাতাস, আর সারাক্ষণ ঢেউ!'

'সেটা তো তোমার বাবার,' কিশোর বললো। 'তোমার না।'

'কেন নয়? আমি চাইলে কেন দেবে না? তার আর দরকার নেই ওটা। কারও কাছে বিক্রিও করতে পারেনি। আমিও ওটা নেয়ার জন্যে পাগল হয়ে গেলাম। ব্যস, দিয়ে দিলো।'

'খাইছে! জিনার আছে দ্বীপ, টকারের লাইট-হাউস। ভাবছি, আমার একটা আগ্নেয়গিরি কিংবা মরুভূমি থাকলে ভালো হতো।'

মুসার কথায় হেসে উঠলো সবাই।

জিনার রাগ শেষ। চোখ চকচক করছে। 'তোমার লাইট-হাউসটা কোথায়?'

'আমাদের বাড়ি থেকে দশ মাইল দূরে, পশ্চিমে। বিশাল, জানো? পুরনো ল্যাম্পটা এখনও আছে, তবে এখন আর জ্বালানো হয় না।'

'কেন হয় না?' প্রশ্ন করলো মুসা।

'ওই লাইট-হাউস বাতিল করে দেয়া হয়েছে। ভালো জায়গায় নুতন আরেকটা বানানো হয়েছে, আধুনিক, ওটাই এখন জাহাজকে সাবধান করে দেয়। পুরনোটা বেচে দেয়া হয়েছে সে-জন্যেই। বাবার জন্যে জায়গাটা চমৎকার। কেউ ডিসটার্ব করতে পারে না। তবু রেগে গেছে বাবা, সী-গালদের ওপর। পাখিগুলো নাকি বেশি শব্দ করে। আমার কিন্তু খুব ভালো লাগে। বাবা বলে, সী-গালেরা বেড়ালের মতো মিউমিউ করে, তার কাজের ক্ষতি করে...'

'তা তো বুঝলাম,' টকারকে থামিয়ে দিয়ে বললেন মিসেস পারকার। 'খুব ভালো জায়গা। কিন্তু ওটা লণ্ডনে, এখন যেতে পারবে না। আমাদের সমস্যার সমাধান হচ্ছে না।'

'আমার খুব যেতে ইচ্ছে করছে, মা,' আবদার ধরলো জিনা। 'বাবাকে বলেই দেখো না।'

'বললেই হবে নাকি? এখানেই আবহাওয়া খারাপ, ওখানে নিশ্চয় আরও বেশি খারাপ। তাছাড়া প্রফেসর কারসওয়েল চলে এসেছেন এখানে, তিনি বাড়িতে থাকলে না হয় এক কথা ছিলো...পরে কোনো এক সময় যাস। আপাততঃ এখানেই কোথাও ব্যবস্থা করতে হবে...'

'একটা জায়গা আছে,' বলে উঠলো আইলিন। 'অবশ্য যদি এখন খালি পাওয়া যায়।'

সব ক'টা চোখ ঘুরে গেল তার দিকে।

'মিসেস লিয়ারি এলমস-এর কটেজ,' আবার বললো আইলিন। 'ভাড়া দেয়। খাবারও ভালো।'

'হুঁ, নাম শুনেছি,' বললেন মিসেস পারকার। 'কাছেই কোথায় যেন। যাইনি কখনও।'

'হ্যাঁ। বড় জোর দুই কিলোমিটার এখান থেকে।'

'যোগাযোগ করতে হবে কিভাবে?'

'ফোন নম্বর জানি আমি।'

'তাহলে একটা রিঙ করো না, প্লীজ। দেখো, খালি আছে কিনা।'

টেলিফোন করলো আইলিন। টুরিস্ট সীজন নয়, খালিই আছে কটেজ। ভাড়া

করে ফেলা হলো।

ফিরে এসে বসতে বসতে বললো আইলিন, 'ভালো জায়গা। তোমাদের খুব পছন্দ হবে। ওটার আশপাশে পুরনো অনেক ভাঙা দুর্গ আছে...'

'তাই নাকি!' লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো টকার। 'দুর্গ দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। পুরনো হলে তো আরও বেশি।' সেই আনন্দেই সে একটা রেসিং-কার হয়ে গেল, ছুটতে শুরু করলো তীব্র গতিতে, সেই সঙ্গে এঞ্জিনের বিকট শব্দ।

ঘুমিয়ে পড়েছিলো, চমকে জেগে উঠে টেবিলের নিচ থেকে বেরিয়ে ঘেউ ঘেউ জুড়ে দিলো রাফিয়ান। বানরটাও তীক্ষ্ণ কিচির-মিচির শুরু করলো।

'আরে থামো, থামো!' তাড়াতাড়ি উঠে টকারকে থামাতে ছুটে গেলেন মিসেস পারকার। 'তোমার এঞ্জিন বন্ধ করো। নইলে এখুনি আবার বেরিয়ে আসবে ওরা!'

পাঁচ

দুই কিলোমিটার, সাইকেলে করে মাত্র কয়েক মিনিটের পথ। লিয়ারির কটেজটা খুব সুন্দর। শাদা রঙ বাড়িটার, জানালার পাল্লা সবুজ। গাছপালা, ফুলের বাগান, আর ঝোপঝাড়ে ঘেরা। বাগানটা ছাড়া বাকি সব গাছপালাকে বুনো মনে হয়, নিয়মিত সাফ না করায় জঙ্গল হয়ে গেছে। না, জায়গাটা ভালো, ছেলেমেয়েদের পছন্দ হলো।

'তাছাড়া খুব নীরব,' বললো রবিন। 'ভালো লাগে। পড়ালেখার জন্যে এরচে ভালো জায়গা আর হয় না।'

শব্দ শুনে দরজায় এসে দাঁড়ালো মোটাসোটা, মাঝবয়েসী এক মহিলা, মুখে হাসি। 'এই যে, এসে পড়েছো তোমরা। এসো এসো, চা তৈরিই করে রেখেছি। ভাবলাম, সাইকেলে করে আসছো, নিশ্চয় খিদে লাগবে।'

বাহ্, এই তো চাই! ভাবলো মুসা। না চাইতেই যদি এভাবে খাবার পাওয়া যায়...হেসে বললো সে, 'আসছি, এক মিনিট। সাইকেলগুলো রেখে আসি।'

হাতমুখ ধুয়ে, চা খেয়ে মালপত্র খুলে গোছাতে চললো ওরা। মাল বেশি নেই। সাইকেলের ক্যারিয়ারে করে যা যা আনতে পেরেছে। খুলে গোছাতে সময় লাগলো না। কাজ শেষ করে বাগানে বেরোলো ওরা। ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো।

'ভালোই লাগবে এখানে,' জিনা বললো। 'জংলা জায়গা। তাছাড়া আমাদের বাড়িও কাছে। ইচ্ছে করলেই গিয়ে নৌকা বের করে নিয়ে দ্বীপে চলে যেতে পারবো।'

'ঠিক বলেছো,' মুসা একমত হলো। 'আবহাওয়া ভালো থাকলে সাগরে গিয়ে

সাঁতারও কাটা যাবে।'

'আর মিসেস লিয়ারিকেও আমার পছন্দ হয়েছে। নরম মেজাজ। আমার বাবার মতো বদমেজাজী নয়। এখানে শান্তিতেই থাকতে পারবো আমরা।'

খোলা জায়গা পেয়ে টকারেরও সুবিধে হলো। ইচ্ছেমতো গাড়ি চালাতে শুরু করলো সে। যাত্রী হলো নটি। মজা পেয়ে পেছন পেছন ছুটে বেড়াতে লাগলো রাফিয়ান।

সেদিন বিকেলে ঘরে বসে আলোচনা করে ঠিক করলো ওরা, পরের কয়েকটা দিন কি কি করবে।

পরের দিন থেকে সাঁতার কাটলো ওরা, আশপাশের নির্জন এলাকায় পিকনিক করলো, বাগানে খেললো, যার যা খুশি ইচ্ছে মতো করলো। সবাই খুশি, একমাত্র কিশোর ছাড়া। তার মনের মতো কাজ পায়নি। আশা করেছিলো, যে-রকম জায়গা, একটা না একটা রহস্য পেয়ে যাবেই। চুটিয়ে মাথা খাটাতে পারবে। নিরাশ হতে হয়েছে তাকে। এখন পর্যন্ত কিছুই পায়নি। দিন দুই পরে আরও খারাপ হলো অবস্থা। নামলো মন-খারাপ-করে-দেয়া বৃষ্টি। ঝমঝম ঝমঝম ঝরছে তো ঝরছেই। থামার আর নাম নেই। সেই সঙ্গে ঠাণ্ডা ঝড়ো বাতাস যেন হাড় কাঁপিয়ে দেয়।

ঘরের মধ্যে আর কি খেলা যায়? ইনডোর গেম যা যা আছে, দাবা, কেরম, কোনোটাই ভালো লাগে না ওদের। টকারেরও না। সে গাড়ি হতে পারলে খুশি। কিন্তু জায়গা কম। ছোট বারান্দায় যতোটা ছোটাছুটি করতে পারলো করলো, তারপর বিরক্ত হয়ে সে-ও এসে বসে পড়লো ঘরে।

ঘরের কোণে আগুনের কাছে পড়ে পড়ে ঘুমায় রাফিয়ান, বানরটা মাঝে মাঝে গিয়ে তার লেজ থেকে উকুণ বেছে দেয়। কখনও সিলিং ফ্যান ধরে দোল খায়, কখনও বা চুপটি করে জানালার ধারে বসে থাকে, গালে হাত দিয়ে গম্ভীর হয়ে।

কিশোরও বেশির ভাগ সময়ই জানালার ধারে বসে থাকে। বাইরের বৃষ্টি দেখে। মাঝেসাঝে ভারি গলায় কবিতা আবৃত্তি করে।

সেদিনও করছিলোঃ 'গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা, কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা...'

পাশে বসে আছে রবিন আর মুসা। ওরা এখন বাংলা অনেকটা বোঝে, বলতেও পারে কিছু কিছু।

'কিসের "নাহি ভরসা" কিশোর মিয়া?' ভুরু নাচিয়ে হেসে জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'আর কিসের?' জবাবটা দিলো রবিন। 'রহস্যের।...আরে, এতো মন খারাপ

করছো কেন? পাবে, পাবে, নিশ্চয় পেয়ে যাবে···এই দুনিয়ায় রহস্যের অভাব নেই।'

'যা জঙ্গল, আর পোড়ো বাড়ি আছে আশপাশে,' মুসা বললো। 'গুপ্তধনের খোঁজ পেয়ে গেলেও হতো। অন্তত একটা ম্যাপ-ট্যাপ···'

'চেষ্টা করলে হয়তো গুপ্তধনই পেতে পারো,' পেছন থেকে বলে উঠলো লিয়ারি।

ফিরে তাকালো তিন গোয়েন্দা।

মিটিমিটি হাসছে মহিলা। বললো, 'দাঁড়াও, চা নিয়ে আসি। তারপর বলবো।'

সেইদিন লিয়ারির আরেক পরিচয় পেলো ছেলেরা। মহিলা 'বর্ন স্টোরি টেলার', একেবারে জাত গল্প বলিয়ে। এতো সুন্দর করে গুছিয়ে বলে, না শুনে উপায় নেই।

একঘেয়ে ভাব অনেকটা কাটলো ছেলেমেয়েদের। খাওয়ার সময় খায়, আর বাকি সময় বসে বসে গল্প শোনে।

বাইরে বৃষ্টির থামাথামি নেই। পড়েই চলেছে। কখনও অঝোর বর্ষণ, কখনও গুঁড়ি গুঁড়ি। মাঝেমাঝে ধেয়ে আসে ঝড়ো হাওয়া, টালির চালের ফাঁকে ঢুকে বিচিত্র শব্দ তোলে।

জানালার ধারে বসে সোয়েটার বুনতে বুনতে গল্প করছে সেদিন লিয়ারি। হঠাৎ বাইরে চেয়ে কি দেখলো। মুখ ফিরিয়ে হেসে বললো, 'যাক, আর ঘরে বসে থাকতে হবে না। বেরোতে পারবে। মেঘ কাটছে। বৃষ্টি থামলে কোথায় ঘুরতে গেলে ভালো হবে, সেটাও বলে দিতে পারি।' রহস্যময় হাসি ফুটলো তার মুখে।

ছয়

'আরে তাই তো!' আকাশের দিকে চেয়ে বললো কিশোর। 'খেয়ালই করিনি।···তা মিসেস এলমস, কোথায় গেলে ভালো হবে?'

কয়েক দিনে কিশোরের স্বভাব অনেকখানিই জানা হয়ে গেছে লিয়ারির। বুঝে গেছে, ছেলেটা কি চায়? 'ওই যে সেদিন গুপ্তধনের কথা আলোচনা করছিলে, ওয়ালটার ম্যানরের কথা বললাম। ওখানেই যাও। রাস্তায় নেমে বাঁয়ে মোড় নেবে। ছোট একটা পাহাড়ের ওপর···'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখেছি,' বলে উঠলো রবিন। 'আসার দিন···'

'হ্যাঁ, ওটাই।'

'সেদিন কিন্তু সব কথা বলেননি,' কিশোর ধরলো। 'খালি গুপ্তধনের গুজবের

কথাই বলেছেন। ওই দুর্গ কাদের, ওয়ালটাররা কে ছিলো, কিছুই বলেননি।'

'তাহলে তো চা দরকার। বসো, নিয়ে আসি।'

'দাঁড়ান, আমিও আসছি,' উঠে দাঁড়ালো রবিন। 'আপনাকে সাহায্য করবো।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফিরে এলো দু'জনে। লিয়ারির হাতে চায়ের সরঞ্জাম। রবিনের হাতে ইয়া বড় এক কেক।

খাবারের গন্ধে চোখ মেললো রাফিয়ান। উঠে পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো।

ফ্যানের একটা পাখা ধরে ঝুলছিলো নটি, ঝুপ করে লাফ দিয়ে পড়লো ঠিক কুকুরটার পিঠে।

ওদের দিকে দুই টুকরো কেক ছুঁড়ে দিলো লিয়ারি। চায়ের কাপে ঘনঘন চুমুক দিলো কয়েকবার। তারপর কাপটা প্লেটে নামিয়ে রেখে বললো, 'হ্যাঁ, ওয়ালটার-দের শরীরে রয়েছে জলদস্যুর রক্ত...'

এই এক কথায়ই শ্রোতাদের আকৃষ্ট করে ফেললো লিয়ারি। ওদেরকে আগ্রহী করে বসিয়ে রেখে কাপের বাকি চা-টুকু শেষ করলো। বললো, 'তোমরা খাচ্ছো না কেন? খাও খাও, আমি বলি...হামফ্রে ডেভিড ওয়ালটার ছিলো দুর্ধর্ষ জলদস্যু। সে-ই বানিয়েছিলো ওই দুর্গ। লোকটা ছিলো ওলন্দাজ। তার জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছিলেন ইংল্যাণ্ডের তৎকালীন রাজা। শেষে বিশাল এক নৌবাহিনী পাঠালেন হামফ্রেকে ধরার জন্যে। মাঝ সাগরে প্রচণ্ড লড়াই হলো। একে একে ধ্বংস করে দেয়া হলো হামফ্রের সমস্ত জাহাজ। তার বেশির ভাগ সঙ্গীসাথীই মারা পড়লো। কিন্তু তাকে ধরতে পারলো না নেভি। একটা জাহাজ নিয়ে কোনোমতে পালিয়ে বাঁচলো সে, সোজা চলে এলো আমেরিকায়। ওই একটা জাহাজেও ধনরত্ন কম ছিলো না। ডাকাতি ছেড়ে দিয়ে বিরাট এক দুর্গ বানিয়ে বাস করতে লাগলো হামফ্রে। নিরাপদেই কাটিয়ে গেল জীবনের শেষ ক'টা দিন। ও হ্যাঁ, এখানে এসে বিয়ে করেছিলো সে। তাদেরই বংশধর এখানকার ডেভিড ওয়ালটার, ডাক্তার হয়েছে। ডাক্তারের বউ বিদেশী, এক আইরিশ মহিলা, নরিলি। ছেলেপুলে হয়নি। ডাক্তারের বড় এক ভাই ছিলো, মারা গেছে, এক ছেলে রেখে গেছে। নাম, ড্যানি। ওই ছেলেই একদিন এতোবড় সম্পত্তির মালিক হবে। ড্যানির বাবা ছিলো আর্কিটেক্ট, লণ্ডনে বিরাট বাড়ি করেছে, অনেক টাকার মালিক। ড্যানি আর তার চাচা-চাচী ওখানেই থাকে বেশি, এখানে প্রায় আসেই না। এলেও দু'চারদিন থেকে আবার চলে যায়। দেশ তো আসলে ওদের ওটা-ই।'

'এলে কি ওই পোড়ো বাড়িতেই থাকে নাকি?' জিজ্ঞেস করলো জিনা।

'আরে না না, ওখানে থাকবে কি? দুর্গটার একটা ঘরের ছাতও অবশিষ্ট নেই, সব ভেঙে পড়েছে। কাছেই আরেকটা সুন্দর বাড়ি বানিয়ে নিয়েছে ডাক্তার,

চমৎকার একটা পার্কের কাছে। বাংলোটার নাম দিয়েছেঃ ওয়ালটার লজ।'

'ও, দেখেছি তো সেদিন বাড়িটা,' মুসা বললো। 'দুর্গের কাছে গেলেই দেখা যায়।'

'হ্যাঁ। ওয়ালটার ম্যানর, ওয়ালটার লজ, পার্ক, ওয়ালটার উড, আর ওদিককার প্রায় সমস্ত জায়গাই ওদের। আমার এই কটেজটাও...'

'কি বললেন?' ভুরু কোঁচকালো কিশোর। 'আপনার...মানে লিয়ারি কটেজও ওয়ালটারদের জায়গার মাঝেই?'

'আগে ছিলো। এখন আলাদা। আমার স্বামীর দাদা, মানে আমার দাদা-শ্বশুর চাকরি করতো ওয়ালটারদের এস্টেটে। এই জায়গাটা তাকে দান করে দিয়েছে ডাক্তারের দাদা।'

'ভাঙা দুর্গ দেখার ইচ্ছে নেই আমার,' জিনা বললো। 'ওরকম দুর্গ আমার নিজেরই একটা আছে, একেবারে আস্ত এক দ্বীপ সহ। ভাঙা দেয়াল ছাড়া দেখার আর কি আছে?'

'পাহাড়ে চড়লেই সাগর দেখতে পাবে। তোমরা যেদিকে সাঁতার কাটতে গেছো, তার উল্টো দিকে। ওখানে সৈকত নেই, সাঁতার কাটতে পারবে না। নামতেই পারবে না। খাড়া পাহাড়, নিচে পাথরের ছড়াছড়ি, ঢেউ আছড়ে পড়ে। মাথা ঘুরে যদি নিচে পড়ো, ছাতু হয়ে যাবে। কাজেই, হুঁশিয়ার থাকবে।'

'সাগর অনেক দেখেছি। আর কি আছে?'

'ওয়ালটার উড। বন। ভেতরে ঝর্না আছে একটা, অনেক বুনো ফুল আছে।'

'আর?' জিনার মনে হলো, আসল কথাটা বলছে না মহিলা।

'আর।' হাসলো লিয়ারি। 'আর আছে একটা অনেক পুরনো কবরস্থান, একেবারে প্রাগৈতিহাসিক কালের। গুহামানবের অনেক কঙ্কাল পাওয়া গেছে। তার ওপরই নতুন কবর বানিয়ে নিয়েছিলো হামফ্রে ওয়ালটার। জলদস্যু ছিলো তো, মন-মানসিকতাই ছিলো অন্যরকম। নইলে বাপু, এতো জায়গা থাকতে পুরনো ওই কবরের ওপর আরেক কবর বানানো কেন?'

'টিউমিউল্যাস!' বিড়বিড় করলো কিশোর।

'টিউ...কী?' বুঝতে পারলো না মুসা।

'টিউমিউল্যাস।' বুঝিয়ে বললো গোয়েন্দাপ্রধান, 'ওই ধরনের কবরস্থানকে বলে টিউমিউল্যাস।'

বৃষ্টি থামলো বটে, কিন্তু মেঘ পুরোপুরি কাটেনি। আকাশের মুখ থমথমে। যে কোনো মুহূর্তে ঝরঝর করে শুরু হতে পারে আবার।

'নামলে নামুক,' জিনা বললো। 'আর বসে থাকতে পারবো না। বসে থেকে থেকে হাতে-পায়ে খিল ধরে গেছে। একটু ঝাড়া দিয়ে না এলে আর বাঁচবো না।'

রেইনকোট পরে বেরোলো ওরা।

রাফিয়ান আর নটির কৃত্রিম কোট দরকার নেই, প্রাকৃতিক আসল রোমশ কোটই আছে। কাজেই পানিকে ওদের বিশেষ ভয় নেই। ভিজলে, জোরে ঝাড়া দিলেই গা থেকে ঝরে যাবে পানি।

ছেলেমেয়েরা চললো পায়ে হেঁটে, নটি চললো রাফিয়ানের পিঠে সওয়ার হয়ে। গলায় গলায় ভাব এখন দুটোতে, মাঝে মাঝে খাবার নিয়ে যদিও লেগে যায় ঝগড়া।

দুর্গের কাছে চলে এলো ওরা। ভেঙেচুরে রয়েছে শত শত বছরের পুরনো দেয়াল, ছাতের চিহ্নও নেই।

'দূর, মন খারাপ করে দেয়!' বিড়বিড় করলো রবিন।

'পুরনো দুর্গের সেলার দেখার খুব ইচ্ছে আমার,' টকার বললো। 'কিন্তু নামবো কোনখান দিয়ে? পথ তো দেখছি না।'

শুধুই ধ্বংসস্তূপ। পুরোপুরি ঢেকে দেয়ার পাঁয়তারা কষছে যেন ঘন ঘাস আর লতার দঙ্গল।

'দেখার কিছুই নেই,' মুসা বললো।

'হ্যাঁ, খামোকাই এলাম।' আকাশের দিকে তাকালো কিশোর। 'জলদি চলো। নামলো বলে।'

কয়েক পা এগোতে না এগোতেই আবার বৃষ্টি পড়তে শুরু করলো। দৌড়ে চললো ওরা। কিন্তু রেইনকোটেও মানলো না। কটেজে ফিরতে ফিরতে ভিজে চুপচুপে হয়ে গেল সবাই।

পরের দিনও একই অবস্থা। সকাল থেকে বৃষ্টি। বিকেলের দিকে ধরে এলো। মেঘের ফাঁকে উঁকি দিলো সূর্য।

কিশোর প্রস্তাব দিলো, 'চলো, বেরোনো যাক।'

সবাই রাজি। বেরিয়ে এলো পেছনের বাগানে। বাগানের পরে খানিকটা জংলা জায়গা। কয়েকটা আপেল গাছ আছে, আর আছে অনেক পুরনো বিশাল এক ওক গাছ। সব ভেজা। তার মধ্যেই ঘোরাঘুরি করতে লাগলো ওরা। ঘরে বসে থাকার চাইতে এটা অনেক ভালো মনে হলো।

রাফিয়ান আর নটির আনন্দের সীমা নেই। ছুটোছুটি করে খেলছে।

ভেজা ঘাস বেশিক্ষণ ভালো লাগলো না বানরটার। দুই লাফে গিয়ে উঠলো ওকের একটা নিচু ডালে। তারপর তরতর করে উঠে গেল মগডালে।

মেঘের আড়ালে ঢুকলো আবার সূর্য।

'নটি, এই নটি, নেমে আয়,' ডাকলো টকার।

নামতে চাইলো না বানরটা। ওপরে থেকেই চেঁচিয়ে জবাব দিলো, 'ইঁক! ইঁক!'

'হুফ! হুফ!' করে রাফিয়ানও ওকে নামার জন্যে ডাকলো।

কানেই নিলো না নটি। অনেক দিন পর ঘর থেকে ছাড়া পেয়ে গাছে চড়েছে বানর, নামতে কি আর ইচ্ছে করে? ওদিকে বৃষ্টিও প্রায় এসে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে দু'বার ঘর থেকে বেরিয়ে চা খাওয়ার জন্যে তাগাদা দিয়ে গেছে লিয়ারি।

'এই নটি, নামলি না!' রেগে গিয়ে ধমক দিলো টকার।

'চলো, আমরা হাঁটতে শুরু করি,' জিনা বললো। 'আপনিই নেমে আসবে।'

ফোঁটা পড়তে শুরু করলো। থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। নামলো না বানরটা।

'না নামলে থাক ওখানে,' হাত নেড়ে বললো টকার। 'আমরা চলে যাচ্ছি...'

তার কথা শেষ হলো না। প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে নামলো ঝমঝম করে বৃষ্টি।

চমকে উঠলো বানরটা। আর এক মুহূর্ত দেরি করলো না। নামতে শুরু করলো। ওকে ধরার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলো টকার। লাফ দিলো নটি। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে টকারের হাতে না পড়ে পড়লো গিয়ে ভেজা ঘাসে। নিচে পানি, ওপরে পানি, এই অবস্থায় হতবুদ্ধি হয়েই বোধহয় মাথা গোঁজার জন্যে সোজা লতানো ঝোপের দিকে দৌড় দিলো ওটা।

'আরে ধরো, ধরো!' চেঁচিয়ে উঠলো টকার।

বৃষ্টির মাঝে বানরটাকে ধরার জন্যে পেছনে ছুটলো সবাই। রাফিয়ান ভাবলো, এটা একটা নতুন ধরনের খেলা। দৌড়ে গেল নটির কাছে। লাফ দিয়ে তার পিঠে উঠে বসলো বানরটা। আর সওয়ারির আদেশেই যেন সোজা গিয়ে ঝোপের মধ্যে ঢুকলো কুকুরটা।

ধমক দিয়ে রাফিয়ানকে ডাকতে যাবে জিনা, এই সময় হাত তুলে দেখালো রবিন। 'আমার মনে হয় ওখানে যাচ্ছে।'

জংলা জায়গাটার ওধারে একটা পুরনো ছাউনি। কাজের জায়গা, কিন্তু কেউ কাজ করে না এখন ওখানে। অব্যবহৃত পড়ে রয়েছে অনেকদিন।

দৌড়ে এসে ছাউনিতে ঢুকলো ওরা। রবিনের অনুমান ঠিকই। নটিকে নিয়ে ওখানেই এসেছে রাফিয়ান। কুকুরটার গলা জড়িয়ে ধরে রেখেছে বানরটা, ঠাণ্ডায় কিংবা ভয়ে যে কারণেই হোক, কাঁপছে। মনিবকে দেখে লাফিয়ে এসে উঠলো তার

কাঁধে।

কালো আকাশটাকে চিরে দিলো যেন বিদ্যুতের শিখা। ভীষণ শব্দে বাজ পড়লো। আবার, তারপর আবার।

'খাইছে!' বলে উঠলো মুসা। 'ঝড়ই শুরু হলো দেখছি।'

'হ্যাঁ, মনে হয় একেবারে মাথার ওপর বাজ পড়ছে,' বললো জিনা।

'আর বাড়ছেই,' কান পেতে ঝড়ের আওয়াজ শুনছে রবিন। 'এগিয়ে আসছে। বোধহয় সাগরের দিক থেকে...'

হঠাৎ উজ্জ্বল নীল আলোয় আলোকিত হয়ে গেল দশদিক। ছাউনির নিচে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে এলো ছেলেরা। আলোর প্রায় পর পরই বাজ পড়লো। এতো জোরে আওয়াজ হলো, মনে হলো কানের পর্দা ফেটে গেল ওদের, থরথর করে কেঁপে উঠলো মাটি। চেঁচালো রাফেয়ান। চিঁ-চিঁ করলো বানরটা।

'কটেজের ওপর পড়েছে!' চোখ বড় বড় হয়ে গেছে টকারের। 'হায় হায়, বেচারি লিয়ারি...'

'চুপ!' থামিয়ে দিলো তাকে কিশোর। 'কটেজে নয়। ওই দেখো, ওক গাছটা...দেখেছো?'

ঘন বৃষ্টির মাঝ দিয়েও দেখা গেল। দেখলো সবাই। একটু আগের সুন্দর ওক গাছটা আর নেই, দাঁড়িয়ে আছে শুধু ওটার পোড়া কালো কাণ্ড, ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

'আল্লাহ্‌রে! কি সর্বনাশ!' আঁতকে উঠে বললো মুসা। 'কয়েক মিনিট আগে...'

'নটি ছিলো ওটার ডালে...,' বললো টকার।

'আর আমরা সবাই ছিলাম ওটার তলায়!' জিনা শেষ করলো কথাটা।

সাত

ধীরে ধীরে দূরে সরে গেল বাজের শব্দ। বিদ্যুতের ঝিলিকও কমলো। থেমে আসছে ঝড়।

শোনা গেল লিয়ারির ভয়ার্ত ডাক, 'কিশোর! জিনা! কোথায় তোমরা?'

'আমরা ভালোই আছি,' চেঁচিয়ে জবাব দিলো কিশোর। 'আপনি বেরোবেন না। আমি আসছি।' অন্যদেরকে ছাউনিতে থাকতে বলে বেরিয়ে গেল সে। এক ছুটে গিয়ে ঢুকলো কটেজে।

দশ মিনিট পর ফিরে এলো আবার। প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে শুকনো সোয়েটার নিয়ে এসেছে সবার জন্যে। আর এনেছে বড় একটা ঝুড়ি। তাতে স্যাণ্ডউইচের প্যাকেট, মস্ত এক চকোলেট কেক, বড় এক ফ্লাস্ক কোকা।

'এই না হলে তুমি আমার ভাই!' বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে হেসে বললো মুসা।

'হয়েছে হয়েছে, এসো এখন শেষ করে ফেলা যাক। খুব খিদে পেয়েছে।'

'তোমারই যখন খিদে, আমার অবস্থা বোঝো!'

হেসে উঠলো সবাই।

দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল সমস্ত খাবার। একটা কণাও অবশিষ্ট থাকলো না। এমনকি মাটিতে যা পড়লো, তা-ও না। চেটেপুটে শেষ করলো রাফিয়ান আর নটি।

বৃষ্টি থেমেছে।

রবিন বললো, 'চলো তো, কাছে গিয়ে দেখি গাছটার অবস্থা।'

ছাউনি থেকে বেরোলো সবাই। হঠাৎ করেই দেখা দিলো সূর্য। মেঘ তাড়িয়ে নিয়ে চলে গেছে ঝড়ো বাতাস।

'ইস্, এতো সুন্দর গাছটা গেল!' আফসোস করে বললো জিনা।

'হ্যাঁ,' আনমনে বিড়বিড় করলো কিশোর। 'লিয়ারি বললো না সেদিন, গাছটা অনেক পুরনো। হামফ্রে ওয়ালটার যখন এসেছিলো, তখনও ছিলো।'

আরও কাছে এগিয়ে গেল ওরা। গাছটার চারপাশের গোড়ার মাটি যেন খুবলে তুলে ফেলেছে কোনো দানব। গর্ত হয়ে গেছে। একটা পরিখার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন এখন পোড়া কাণ্ডটা।

'কাণ্ড দেখেছো, কতো বড় গর্ত?' টকার বললো। 'বাজের এতো জোর!'

খেলাচ্ছলে লাফ দিয়ে গর্তে নামলো নটি। কি একটা জিনিস কৌতূহল জাগিয়েছে তার। সরু সরু আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করলো। দেখাদেখি রাফিয়ানও গিয়ে নামলো, মাটি খোঁড়ায় সাহায্য করলো বানরটাকে।

'পোকা খুঁজছে,' হেসে বললো টকার।

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে কিশোর। গম্ভীর। আরও ভালোমতো দেখার জন্যে গর্তের কিনারে গিয়ে ঝুঁকলো। কঠিন কিছু একটাতে কুকুরটার নখ লেগে শব্দ হয়েছে। কি ওটা? বললো, 'এই রাফি, খোঁড়। আরও খোঁড়।'

হঠাৎ প্রায় একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো সবাই। বেরিয়ে পড়েছে রঙচটা, মরচে পড়া একটা ধাতব বাক্স।

'কি ওটা?' মুসার প্রশ্ন।

'হয়তো গুপ্তধন,' রসিকতা করে হাসলো রবিন।

'হুঁ, গুপ্তধন পাওয়া এতোই সহজ!' জিনা বললো।

কিশোর ততোক্ষণে নেমে পড়েছে গর্তে। মাটি সরিয়ে বাক্সটা তুলে আনার চেষ্টা করছে।

'ওভাবে পারবে না,' মুসা বললো। 'দাঁড়াও, খন্তা-টন্তা কিছু একটা নিয়ে আসি।' এক দৌড়ে গিয়ে কটেজ থেকে একটা শাবল নিয়ে এলো সে। দু'জনে মিলে খুঁড়ে তুলে আনলো বাক্সটা।

তালা আছে, কিন্তু এতো পুরনো, মরচে পড়ে একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। শাবল দিয়ে এক বাড়ি মারলো মুসা। হুক ভেঙে তালাটা খুলে পড়ে গেল।

ডালা তুললো কিশোর।

হাঁ হয়ে গেল সবাই।

সত্যি গুপ্তধন! সোনার মোহর আর নানারকম অলংকার।

চোখ ডললো কেউ, কেউ চিমটি কাটলো নিজের হাতে। না, জেগেই তো আছে, স্বপ্ন দেখছে না। তারমানে আসলেই গুপ্তধন পেয়েছে। গুপ্তধন পাওয়া নতুন কোনো ব্যাপার নয় ওদের জন্যে, আগেও অনেক বার পেয়েছে। তবে এভাবে নয়, অনেক খুঁজতে হয়েছে।

'বিশ্বাস হচ্ছে না এখনও আমার,' বিড়বিড় করলো রবিন।

'অনেক কিছুই ঘটে এই পৃথিবীতে,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কেটে বললো কিশোর, 'যার কোনো ব্যাখ্যা দেয়া যায় না।...যাকগে, পেয়েছি এ-তো আর মিছে কথা নয়। চলো, এগুলো কটেজে নিয়ে যাই। কার জিনিস, হয়তো লিয়ারি বলতে পারবে।'

বাক্সটা নিয়ে এলো ওরা। রান্নাঘরের টেবিলে রেখে খুললো।

একবার তাকিয়েই স্তব্ধ হয়ে গেল লিয়ারি। অনেকক্ষণ পর কথা ফুটলো মুখে, 'গুজব তাহলে মিথ্যে নয়! সত্যিই গুপ্তধন লুকিয়ে রেখে গেছে হামফ্রে ওয়ালটার।'

'সেদিন তো বললেনই লুকিয়েছে,' কিশোর বললো।

'বলেছিলামঃ লোকে বলে। বিশ্বাস করতাম না। এখন তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি...'

'কিন্তু লুকালো কেন?'

'স্বভাব,' জবাবটা দিলো রবিন। 'জলদস্যুরা ধনরত্ন লুকাতে অভ্যস্ত ছিলো, হয়তো সে-কারণেই নিরাপদ জায়গায় এসেও নিশ্চিত হতে পারেনি হামফ্রে ওয়ালটার। কিছুটা লুকিয়ে রেখেছিলো ওই ওক গাছের তলায়।'

'কি জানি। হতেও পারে,' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে হাত নাড়লো কিশোর।

'এসো না, কি কি আছে দেখি? একটা লিস্ট তৈরি করে ফেলি,' প্রস্তাব দিলো টকার। গুপ্তধনের গল্প শুধু বইয়েই পড়েছে এতোদিন, চোখে দেখেনি।

অন্যদেরও মনে ধরলো কথাটা। অনেকদিন পর একটা নতুন ধরনের কাজ পাওয়া গেছে।

বাক্সে রয়েছেঃ ছয়শো সোনার মোহর, পান্না খচিত এক সেট গহনা, হীরা আর নীলকান্ত মণি বসানো একটা ব্রেসলেট, বিশাল একটা রুবি পাথর, একটা টায়রা, একটা হীরার লকেট, অনেকগুলো আঙটি আর কানের দুল,—প্রায় সবগুলোতেই মূল্যবান পাথর বসানো। বড় বড় মুক্তো আছে অনেকগুলো, গোটা তিনেক সোনার ব্রেসলেট, তিনটে সোনার চেন, দুটো সোনার ঘড়ি (বন্ধ হয়ে আছে), চারটে সোনার বড় বড় মেডেল। আর আছে হাতির দাঁতে খোদাই করা দুটো প্রতিকৃতিঃ একটা পুরুষের, আরেকটা মহিলার। পুরুষেরটার নিচে নাম লেখা রয়েছে হামফ্রে ডেভিড ওয়ালটার। আর মহিলাটার নিচে টেরিলিন ওয়ালটার।

'হামফ্রের স্ত্রীর নাম কি ছিলো, জানেন?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'টেরিলিন...'

'হুঁ। তারমানে গুপ্তধন হামফ্রেই লুকিয়েছিলো। এই প্রতিকৃতি দুটোই তার প্রমাণ।'

'কি করবে এখন এগুলো?' রবিন জানতে চাইলো।

জবাব না দিয়ে লিয়ারির দিকে তাকালো কিশোর। 'ডাক্তার ওয়ালটার এখন কোথায়? এখানে, না লণ্ডনে?'

'ঠিক বলতে পারবো না, বৃষ্টির জন্যে বেরোতেই তো পারি না,' বললো লিয়ারি। 'তবে সেদিন মুদির বৌ বলছিলো, এখানে নেই। দু'চার দিনের মধ্যে আসবে। তারমানে আজ কিংবা কাল আসবে।'

জানালার বাইরে তাকালো কিশোর। 'বৃষ্টি বোধহয় আর আসবে না।' বন্ধুদের দিকে ফিরলো। 'একবার গেলে কেমন হয়? ওয়ালটার লজে? ডাক্তার থাকলে তাঁকে জানাবো খবরটা। এসে নিয়ে যাবেন। আইনতঃ জিনিসগুলো এখন তাঁরই পাওনা।'

'চলো,' মুসা রাজি। 'হেঁটে, না সাইকেলে?'

'সাইকেল।'

দ্রুত প্যাডাল করে চললো ওরা। অনেক দিন ঘরে বন্দি হয়ে থাকার পর মুক্তির আনন্দ, তার ওপর গুপ্তধন পাওয়ার উত্তেজনা, টগবগ করে ফুটছে যেন শরীরের রক্ত। টকারের সাইকেল নেই, সে বসেছে মুসার সাইকেলের ক্যারিয়ারে। নটি চলেছে রাফিয়ানের পিঠে সওয়ার হয়ে।

অবশেষে দূর হয়ে গেছে মেঘ। কড়া রোদে ভেজা মাটি থেকে বাষ্প উঠছে। গাছপালা ঘন সবুজ, এক কণা বালি নেই, ধুয়েমুছে সব সাফ হয়ে গেছে।

দেখতে দেখতে চললো ওরা।

আট

ভাঙা দুর্গের পাশ দিয়ে পথ। চোখে পড়লো ওয়ালটার লজের শাদা দেয়াল। প্রায় বর্গাকার চমৎকার একটা বাংলো। বেগুনী উইসট্যারিয়া আর অন্যান্য লতায় ছেয়ে রয়েছে। সুন্দর ছিমছাম বাগানে নানারকম ফুলের ঝাড়, বেড, সবুজ ঘাসে ঢাকা লন।

গেটের কাছে এসে সাইকেল থেকে নামলো ওরা। পাল্লার লোহার শিকের ফাঁক দিয়ে ভেতরে তাকালো। বাগানে কাজ করছে একটা লোক।

গেটের পাশে লাগানো ঘন্টা বাজানোর শেকল ধরে টানলো কিশোর।

ঘন্টার শব্দে ফিরে তাকালো লোকটা। খোয়া বিছানো পথে জুতোর মচমচ শব্দ তুলে এগিয়ে এলো গেটের কাছে। মাঝবয়েসী, মাথায় পাতলা চুল, ধূসর। গোলগাল মুখে পাতলা ঠোঁটজোড়া বড় বেশি বেমানান। চেহারায় বিরক্তি। পরনে কর্ডের প্যান্ট—ময়লা, মাটি লেগে রয়েছে। গায়ে নীল ওভারঅল। গভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, 'কি চাই?'

'ডাক্তার ওয়ালটার আছেন?' ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

জবাব দিলো না লোকটা। এক এক করে তাকালো পাঁচজনের মুখের দিকে। তারপর বললো, 'আজেবাজে ছেলেমেয়ের সঙ্গে কথা বলেন না তিনি।'

কথা বলার জন্যে মুখ খুলেও থেমে গেল কিশোর।

লোকটা বললো, 'তোমাদের মতো কেউ যাতে ঢুকতে না পারে, সেদিকে কড়া নজর রাখতে বলা হয়েছে আমাকে।'

রাগে লাল হয়ে গেল জিনার মুখ। এমনিতেই ধৈর্য তার কম। ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললো, 'দেখুন, বড় বড় কথা বলবেন না। আজেবাজে ছেলেমেয়ে নই আমরা। আপনাকেই বরং বাজে লোক মনে হচ্ছে আমার। যান, গিয়ে বলুন, জরুরী কথা বলতে এসেছি তাঁর সঙ্গে।'

আরও গম্ভীর হয়ে গেল কেয়ারটেকার। তারপর হঠাৎ হাসতে আরম্ভ করলো। 'জরুরী, না? হাহ্ হাহ্ হা! তা জরুরী ব্যাপারটা কি জানতে পারি, ম্যাডাম?'

'দেখুন,' শীতল কণ্ঠে বললো কিশোর। 'ওর নাম জরজিনা পারকার। প্রফেসর হ্যারিসন পারকারের নাম নিশ্চয় শুনেছেন, বিখ্যাত বিজ্ঞানী, তাঁর মেয়ে। কাজেই বুঝতে পারছেন, আজেবাজে কেউ নই আমরা। এখন দয়া করে গিয়ে যদি ডাক্তার সাহেবকে খবর দেন, খুশি হবো।'

দ্বিধা ফুটলো লোকটার চোখে।

'যান,' মুসা বললো। 'গিয়ে বলুন, জরুরী কথা আছে। তাঁরই লাভ।'

'হ্যাঁ,' মুসার কথার পিঠে বলে উঠলো টকার। 'তাঁর জন্যে সুখবর। গুপ্তধন পাওয়া গেছে...'

'এই, তুমি চুপ করো তো!' ধমক দিয়ে টকারকে থামিয়ে দিলো কিশোর।

'গুপ্তধন?' ভুরু কোঁচকালো কেয়ারটেকার। তারপর হা-হা করে হাসলো। 'এই গপ্পোই শোনাতে এসেছো নাকি? নিশ্চয় বলবে, মিস্টার হামফ্রে ওয়ালটারের গুপ্তধন খুঁজে পেয়েছো তোমরা?'

কড়া গলায় জিনা বললো, 'আপনার সঙ্গে আমাদের কোনো কথা নেই! যা বলছি করুন। ডাক্তার ওয়ালটারকে খবর দিন, চাকরিটা না খোয়াতে চাইলে। জলদি করুন।'

'থাকলে তো খবর দেবো,' সামান্য নরম হলো কেয়ারটেকার। 'বাড়ি নেই। আজ সকালেই আসার কথা ছিলো। বৃষ্টির জন্যেই হয়তো আসতে পারেননি। আকাশ ভালো থাকলে রাতে চলে আসতে পারেন, কিংবা, কাল কিংবা পরশু...ঠিক নেই। আমাকেই খুলে বলো সব। এলে তাঁকে জানিয়ে দেবো।'

কর্কশ ব্যবহার অনেক কোমল হয়ে গেছে লোকটার। কিন্তু তবু কেউই তাকে পছন্দ করতে পারলো না। এমনকি রাফিয়ানও না। শিকের ফাঁক দিয়ে মুখ ঢুকিয়ে তার জুতো শুঁকলো, তারপর মৃদু গররর করে উঠলো।

'সরি,' বললো কিশোর। 'ডাক্তার সাহেবকে ছাড়া আর কাউকে বলা যাবে না। কাল আবার আসবো আমরা।'

'না না, দরকার কি? এসে হয়তো পেলে না, খামোকা কষ্ট করবে। তারচে এক কাজ করো, ঠিকানা রেখে যাও। সাহেব এলেই তোমাদেরকে খবর দেবো।'

আবার বোকামি করে বসলো টকার। বলে ফেললো, 'লিয়ারি কটেজ, চেনেন নিশ্চয়?'

'চিনি, চিনি,' হেসে বললো লোকটা। 'ওদিক দিয়েই তো রোজ বাজারে যাই। ঠিক আছে, মিস্টার ওয়াল্টার এলে একটা নোট ফেলে যাবো'খন তোমাদের লেটার বক্সে।'

লোকটার হাসি মোটেও পছন্দ হলো না মুসার। ফেরার পথে বললো, 'শয়তান লোক। দেখলে, গুপ্তধনের নাম শুনেই কেমন বদলে গেল?'

'তা না-ও হতে পারে। মিস্টার পারকারের নাম শুনেও বদলাতে পারে,' রবিন বললো। 'আর চেহারা দেখে মানুষ বিচার করা যায় না। মুখে কড়া, মনটা হয়তো নরম।'

'তুমি নিজে নরম তো, তাই সবাইকে ওরকম ভাবো,' বললো জিনা। 'আমি

মুসার সঙ্গে একমত। আস্ত শয়তান লোক। হারামী নাম্বার ওয়ান। এই কিশোর, তুমি কি বলো?'

'আমারও ভালো লাগেনি।'

'আমারও না,' টকার বললো। 'গুপ্তধনের কথা বলে বোকামি করিনি তো?'

'বোকামিই করেছো। আর ঠিকানা দিয়ে করেছো গাধামি। আগ বাড়িয়ে আর কথা বলতে যাবে না কক্ষণো। তোমাকে বলেছি না, আমরা গোয়েন্দা। গোয়েন্দাগিরিতে সব সময় ভেবেচিন্তে কথা বলতে হয়...'

'কিন্তু অসুবিধে কি হবে?'

'গুপ্তধনের লোভে আমাদের পেছনে লাগতে পারে। ঠিকানাও বলে দিয়ে এসেছো...'

'তাই তো! ভুলই হয়ে গেছে...'

'যা হবার হয়ে গেছে। এখন আর ভেবে লাভ নেই। দেখা যাক কি হয়। হয়তো লোকটা বিশ্বাসই করেনি আমাদের কথা।'

লিয়ারি জানালো ওদেরকে, লোকটার নাম ডেনার। ডাক্তার ওয়ালটারের বাড়িতে মালীর কাজ থেকে শুরু করে কেয়ারটেকারের কাজ, সবই সে করে। ডেনার ভালো কি মন্দ, বলতে পারলো না। কারণ, বোঝার উপায় নেই। মোটেই নাকি মিশুক না লোকটা।

পরদিন সকালে ডেনার কখন এলো লিয়ারি কটেজে কেউই জানলো না। কিন্তু নাস্তার টেবিলেই পাওয়া গেল তার নোট। একটা খামে ভরে চিঠির বাক্সে ফেলে গেছে। লিয়ারি এনে দিলো ছেলেদের।

নোটে লেখাঃ জরুরী কাজে আটকে পড়েছেন ডাক্তার ওয়ালটার। তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে পারছে না বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। আজ দুপুরের দিকে তোমাদের সঙ্গে দেখা করবে তাঁর ভাইপো ড্যানি ওয়ালটার। জিনিসগুলো তার হাতে দিয়ে দেয়ার জন্যে অনুরোধ করেছেন ডাক্তার ওয়ালটার।

নিচে ডেনারের সই।

রেগে গিয়ে জিনা বললো, 'নিজে একটা নোট পর্যন্ত লিখতে পারলো না, এতোই জরুরী কাজে ব্যস্ত? ওই ডেনার ব্যাটা তাকে কি বলেছে, কে জানে! আসলে আমাদের কথা বিশ্বাস করেনি ওরা।'

'ওদেরই বা দোষ কি?' কিশোর বললো। 'আমাকে বললে আমিও বিশ্বাস করতাম না। নিজের চোখে দেখেছি বলেই না...তবে ওরকম ভাবে হঠাৎ গুপ্তধন পেয়ে যাওয়ার অনেক কাহিনী জানি আমি।'

'আমিও জানি,' রবিন বললো। 'বইয়ে পড়েছি। রেফারেন্স বইতেও আছে

কিছু কিছু ঘটনার উল্লেখ।

'বিশ্বাস করেনি,' মুখ ভর্তি খাবার চিবাতে চিবাতে বললো মুসা, 'তো কি হয়েছে? করবে। যখন বাক্সটা নিয়ে গিয়ে তার সামনে ফেলবে আর ভাতিজা।'

ড্যানি আসবে দুপুর নাগাদ। ততোক্ষণ আর কটেজের কাছ থেকে দূরে যেতে পারছে না ছেলেমেয়েরা। রোদ উঠেছে। বাগানে আর পেছনের জঙ্গলে ঘোরাঘুরি করেই কাটালো ওরা।

দুপুরের আগেই এলো ড্যানি। ছাউনিতে বসে গল্প করছিলো তখন ওরা। মোটর সাইকেলের আওয়াজ শুনে ছুটে গেল।

নয়

গেটের বাইরে মোটর সাইকেল থেকে নামলো ছেলেটা। লম্বা, হালকা, কালো চুল। বয়েস আঠারো মতো হবে। বেল বাজালো।

গেট খোলার জন্যে একসাথে এগোলো পাঁচজনে।

'তোমরাই গিয়েছিলে, না?' বললো আগন্তুক। 'আমি ড্যানি ওয়ালটার। ডেনার বললো, কয়েকটা বাচ্চা দেখা করতে এসেছিলো জরুরী কথা বলতে।'

ছেলেটার ওপর বিতৃষ্ণা জাগলো কিশোরের। এমন ভঙ্গিতে বাচ্চা' কথাটা বললো, যেন সে নিজে একজন বুড়ো মানুষ। তাছাড়া তার তীক্ষ্ণ উঁচু পর্দার কণ্ঠস্বরও পছন্দ করার মতো নয়।

'হ্যাঁ, আমরাই গিয়েছিলাম,' নিষেধ মনে থাকলো না টকারের। আগ বাড়িয়ে কথা বলতে গেল আবার। 'আপনাদের পারিবারিক গুপ্তধন পেয়েছি।'

'চমৎকার। চাচা দেখলে খুশি হবে। চলো তো দেখি, কি পেয়েছো?'

লিভিংরুমে নিয়ে আসা হলো ড্যানিকে। নিজের ঘরের খাটের নিচ থেকে বড় একটা সুটকেস বের করে আনলো কিশোর, তাকে সাহায্য করলো মুসা। টেবিলের ওপর রেখে বাক্সের ডালা তুললো।

দেখে বিস্ময়ে শিস দিয়ে উঠলো ড্যানি। 'দারুণ তো! সত্যি সত্যি পেয়েছো দেখা যাচ্ছে!'

চিন্তিত ভঙ্গিতে তার দিকে চেয়ে রয়েছে কিশোর। লিয়ারি বলেছে, ডাক্তার ওয়ালটার নাকি খুব ভদ্রলোক। তাহলে তার ভাইপো এরকম কেন? কেমন যেন গোঁয়ার, দুর্বিনীত। ব্যবহারও ভালো না। জলদস্যু হামফ্রের স্বভাব পেয়েছে নাকি?

'ঠিক আছে, নিয়ে যাচ্ছি,' বলতে বলতে বাক্সের ডালা নামালো ড্যানি। সুটকেস বন্ধ করলো। তারপর হাতল ধরে তুলে নিলো। সুটকেসটা যে অন্যের, এ-

কথাটাও যেন ভুলে গেল।

'এক মিনিট,' ড্যানির পথরোধ করলো কিশোর। 'নোট লিখেছে ডেনার, সইও তার। মিস্টার ওয়ালটার লেখেননি। না লিখুন, ডেনারের কথাই নাহয় বিশ্বাস করলাম। কিন্তু আপনি যে ড্যানি ওয়ালটার, তার প্রমাণ কি? কিভাবে বুঝবো?'

'হ্যাঁ, ঠিক,' এগিয়ে এলো জিনা। 'প্রমাণ করুন, যে আপনি ড্যানি ওয়ালটার। মোটর সাইকেল এনেছেন। নিশ্চয় ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে। দেখান।'

ফ্যাকাশে হয়ে গেল ড্যানি। জ্বলন্ত চোখে তাকালো জিনা আর কিশোরের দিকে। 'মানে! আমাকে সন্দেহ করছো? ডাক্তার ওয়ালটারের ভাতিজাকে?'

'না, শিওর হতে চাইছি,' দরজার দিকে এগিয়ে গেল মুসা। 'প্রমাণ করার মতো কিছু সঙ্গে না থাকলে চলে যান। গিয়ে নিয়ে আসুন। আমাদেরকে বিশ্বাস করাতে পারলে তারপর পাবেন সুটকেস।'

'বেশ, যাচ্ছি।'

'আগে সুটকেসটা রাখুন,' বেশ উপভোগ করছে টকার। মোটর সাইকেলের এঞ্জিনের মতো একবার গোঁ গোঁ করে উঠে বললো, 'যান। পঞ্চাশ মাইল বেগে ছুটে চলে যাবেন। কতোক্ষণ আর লাগবে?'

কিন্তু সুটকেস রাখলো না ড্যানি। হঠাৎ দৌড় দিলো দরজার দিকে। পাথরের দেয়ালের মতো তার সামনে দাঁড়িয়ে গেল তিন গোয়েন্দা আর জিনা। পেছন থেকে তার জ্যাকেট খামচে ধরলো টকার।

ঝাড়া দিয়ে টকারের হাত ছাড়িয়ে খোলা জানালার দিকে ছুটলো ড্যানি।

বাঘের মতো লাফ দিয়ে গিয়ে পড়লো রাফিয়ান। কামড়ে ধরলো ড্যানির চামড়ার জ্যাকেটের ঝুল। দুই পা তুলে দিলো গায়ের ওপর।

হাত থেকে সুটকেস ছেড়ে দিলো নকল ড্যানি—কারোই আর বুঝতে বাকি নেই এখন, সে আসল ড্যানি নয়। জ্যাকেটটা ছাড়ানোর চেষ্টা করলো। টেনে বের করে নিলো কুকুরটার দাঁতের ফাঁক থেকে।

আবার কামড় দিলো রাফিয়ান। নকল ড্যানির জিনসের প্যান্টের পেছনে। হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে ফেললো খানিকটা, কাপড় তো বটেই, সেই সঙ্গে কিছুটা চামড়াও। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠলো ছেলেটা। আবার দরজার দিকে দৌড় দিলো।

সুটকেস ফেলে দিয়েছে। আর আটকানোর কোনো মানে নেই। পথ ছেড়ে দিলো ছেলেরা।

পিছন দিকটা চেপে ধরে বারান্দা পেরিয়ে লাফ দিয়ে বাগানে পড়লো নকল ড্যানি। ইতিমধ্যে আরেক কাণ্ড হয়েছে। নটি ভেবেছে, সবাই কিছু না কিছু করেছে, তারও কিছু একটা করা দরকার। ড্যানি ঘর থেকে বেরোনোর আগেই

গিয়ে লাফিয়ে উঠেছে তার কাঁধে, ঝাঁকড়া চুল খামচে ধরেছে। এখন হ্যাঁচকা টান মারছে।

দৌড়াবে, পাছা ডলবে, নাকি কাঁধ থেকে বানর ফেলবে? মহা মুশকিলে পড়ে গেছে নকল ড্যানি। দু'হাতে ধরে অনেক কষ্টে টেনে বানরটাকে নামিয়ে আনলো কাঁধ থেকে, ছুঁড়ে ফেলে দিলো। দেখে টকার গেল রেগে। লাফ দিয়ে বাগানে নেমে ইয়া বড় এক ঢিল তুলে নিয়ে ধাঁ করে ছুঁড়ে মারলো। ধ্যাপ করে গিয়ে লাগলো সেটা ড্যানির পিঠে। 'ওরে বাবারে, গেছিরে!' বলে আরও জোরে দিলো দৌড়। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য তখনও শেষ হয়নি। বিশাল এক লরির মতো গর্জন তুলে তার পেছনে ছুটলো টকার।

গাড়ির আওয়াজ শুনে আরও ভড়কে গেল বেচারা ড্যানি। ভাবলো, গাড়ি নিয়ে তাকে তাড়া করেছে কেউ। পেছনে ফিরে তাকানোরও সাহস হলো না। এক লাফে গিয়ে চড়লো মোটর সাইকেলে। এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে শাঁ করে চলে গেল।

হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লো ছেলেমেয়েরা।

মুসা তো একেবারে বাগানে চিত হয়ে শুয়ে পড়েছে। পেট চেপে ধরে হাসছে। হাসি কিছুটা কমলে বললো, 'আক্কেল থাকলে···হাহ্ হা···আর আসবে না···রাফি ওর পাছার চামড়া···!' আবার হেসে উঠলো হো-হো করে।

হাসাহাসি চললো আরও কিছুক্ষণ।

অবশেষে হাসি থামিয়ে কিশোর বললো, 'স্রেফ ধাপ্পা দিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিলো···'

'সে-তো বোঝাই গেল,' বললো রবিন। 'নিশ্চয় ডেনারের কাজ।'

'তাতে কোনো সন্দেহ আছে কি? আমরা যে গুপ্তধন পেয়েছি, একমাত্র সে-ই জানে···'

'আর লিয়ারি,' মনে করিয়ে দিলো জিনা।

'আরে না,' প্রতিবাদ করলো মুসা। 'গলা কেটে ফেললেও লিয়ারি কিছু করবে না।' ভালো রান্না খেয়ে খেয়ে মহিলার ভক্ত হয়ে গেছে সে। 'সব শয়তানী ডেনারের।'

'এখন তাহলে আমরা কি করবো?' জিজ্ঞেস করলো রবিন। 'আবার যাবো ওয়ালটার লজে? দেখবো ডাক্তার ওয়ালটার এসেছেন কিনা?'

'তা-ই বোধহয় করতে হবে,' কিশোর বললো। 'লিয়ারি বাজার থেকে আসুক। তাকে সব বলি। দেখি কি রিঅ্যাকশন হয়? তারপর খেয়েদেয়ে বেরোবো।'

লিয়ারির অকৃত্রিম বিস্ময় দেখে বোঝা গেল, সে এই ধাপ্পাবাজিতে জড়িত

নেই।

লাঞ্চের পর সাইকেল নিয়ে আবার ওয়ালটার লজে চললো ওরা।

আগের দিনের মতোই গেট বন্ধ। তবে আজ বাগানে কাউকে দেখা গেল না, ডেনারকেও না। বাংলোর দরজা-জানালাও সব বন্ধ। বেল বাজালো কিশোর। কয়েকবার। কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল না। মনে হচ্ছে, কেউ নেই বাড়িতে।

আরও কয়েক মিনিট গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রইলো ওরা। বেল বাজালো। জবাব মিললো না।

'নেই কেউ বাড়িতে,' মুসা বললো।

'হুঁ,' রবিন একমত হলো তার সঙ্গে। 'ডাক্তার ওয়ালটারও ফেরেননি। কিন্তু ডেনার গেল কোথায়?'

কিশোরের দিকে তাকালো জিনা। 'কিশোর, এখন কি করবো?'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছিলো কিশোর। 'অ্যাঁ?' ফিরে তাকালো। 'এখন? শেরিফকে জানাতে হবে। তবে আগে গিয়ে গুপ্তধনগুলো নিরাপদ কোথাও লুকিয়ে ফেলতে হবে। চলো, জলদি চলো।'

কিশোরের এই তাড়াতাড়ি করার কারণ বুঝতে পারলো না অন্যেরা। তবে কোনো প্রশ্নও করলো না। ফিরে চললো লিয়ারি কটেজে।

দশ

কটেজে ফিরে গুপ্তধনগুলো দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো কিশোর। যেন আশা করেছিলো, ফিরে এসে আর দেখতে পাবে না, তার আগেই ডাকাতি হয়ে যাবে।

লিয়ারিও ভীষণ উদ্বিগ্ন। ছেলেদের দেখেই বলে উঠলো, 'ডাক্তার এসেছেন?'

'না,' জানালো কিশোর।

'তাহলে তো মুশকিল হয়ে গেল। এতো টাকার জিনিস ঘরে রাখতে আর সাহস হচ্ছে না। কিছু একটা করা দরকার।'

'আমিও তাই ভাবছি। শেরিফকে খবর দেয়া দরকার।'

'কি করে দেবে? তাহলে যেতে হবে কাউকে।'

'কেন, টেলিফোন?'

'নষ্ট। তারটার ছিঁড়েছে বোধহয় কোনো জায়গায় ঝড়ে। বাজারে গিয়েছিলাম যে, তখনই মিস্ত্রীকে খবর দিয়ে এসেছি। চলে আসবে।'

'হুঁ! তাহলে শেরিফের অফিসে গিয়েই খবর দিতে হবে। তবে তার আগে কোথাও লুকিয়ে ফেলতে হবে এগুলো,' গুপ্তধনের সুটকেসটা দেখালো কিশোর।

কিন্তু কোথায় লুকানো যায়? চিলেকোঠার কথা ভাবলো প্রথমে। ওখানে গিয়ে দেখা গেল, জায়গা নেই।

মুসা পরামর্শ দিলো, একটা ট্রাংকে ভরে তালা দিয়ে রাখলে কেমন হয়? কিশোর রাজি হলো না। তার ধারণা, ওখানেই প্রথম খুঁজবে চোরেরা। শেষে সেলারে লুকিয়ে রাখবে ঠিক করলো ওরা। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো মাটির নিচের ঘরে।

পুরনো আমলের একটা বয়লার পড়ে আছে। বাতিল। এখন আর কাজ হয় না ওটা দিয়ে। তার মধ্যে লুকানোর কথা বললো রবিন। দেখা গেল, বয়লারের মুখটা খুব ছোট। বাক্সটা ঢুকবে না তার মধ্যে।

ঘরের একধারে পড়ে রয়েছে একগাদা বস্তা। তুড়ি বাজিয়ে কিশোর বললো, 'পেয়েছি। ওখানে লুকাবো।'

'কোথায়?' অবাক হয়ে জানতে চাইলো মুসা।

'ওই যে, ওই বস্তাগুলোর তলায়। তার ওপর পুরনো একটা ময়লা চাদর ফেলে রাখবো। ব্যস, তাহলেই হবে। চোরেরা ভাবতেই পারবে না এতো দামী জিনিস ওরকম সাধারণ জায়গায় লুকানো হয়েছে।'

আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করলো টকার, 'আচ্ছা, এতো ঝামেলা কেন করতে যাচ্ছো? চোর কি আসবেই?'

'সেই সম্ভাবনাই বেশি! ধাপ্পা দিয়ে নিতে আসার সাহস যখন করেছে, চুরি করা তো আরও সোজা।'

খুব সাবধানে একটা একটা করে বস্তা তুলে পাশে নামিয়ে রাখলো কিশোর। কয়েকটা বস্তা সরানোর পর সুটকেসটা রাখলো বাকি বস্তাগুলোর ওপর। তারপর নামিয়ে রাখা বস্তাগুলো তুলে আবার আগের মতো সাজিয়ে দিলো সুটকেসটার ওপর। তার ওপর বিছিয়ে দিলো একটা পুরনো চাদর, এলোমেলোভাবে। যেন অনেকদিন থেকেই ওটা ওভাবে পড়ে আছে।

ঘরের আরেক ধারে পুরনো একটা ভাঙা খাট ফেলে রাখা হয়েছে। কি ভেবে, ওই খাটটা তুলে এনে বস্তাগুলোর ওপর রাখতে বললো কিশোর।

ধরাধরি করে খাটটা তুলে এনে বস্তার দিকের দেয়াল ঘেঁষে রাখলো ওরা। ঢাকা পড়ে গেল বস্তাগুলো। খাটের নিচ দিয়ে উঁকি না দিলে আর চোখে পড়ে না।

'যাক, আপাতত নিরাপদ,' হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বললো কিশোর।

'তো, শেরিফকে কি আজই খবর দিতে হবে?' জিনা জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি করা উচিত! অযথা ঝুঁকি নেয়ার কোনো মানে হয় না। কেন, তুমি যাবে নাকি?'

'নাহয় গেলামই।'

কিন্তু সেলার থেকে বেরিয়েই বেরোনোর আশা বাদ দিলো ওরা। আবার কালো মেঘে ঢেকে গেছে আকাশ। দেখে বিশ্বাসই হতে চায় না, এই কিছুক্ষণ আগেও ঝকঝকে রোদ ছিলো।

কি আর করা? ঘরে বসেই কাটাতে হলো।

বিকেলের দিকে বৃষ্টি আরও বাড়লো। সাঁঝ হলো, রাত নামলো। থামার কোনো লক্ষণ নেই।

সারা রাত পালা করে পাহারা দিলো ওরা। এরকম দুর্যোগের রাতেই চোর-ডাকাত আসার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু তাদের ধারণা ভুল হলো। কেউ এলো না। নিরাপদেই কেটে গেল রাতটা।

পরদিন সকালে আবার রোদ উঠলো।

নাস্তা সেরেই বেরিয়ে পড়বে ঠিক করলো ওরা। জিনা আর রবিন যাবে শেরিফকে খবর দিতে। কিশোর আর মুসা যাবে আবার ওয়ালটার লজে, ডাক্তার এসেছেন কিনা খোঁজ নেয়ার জন্যে। আর টকার থাকবে কটেজে, লিয়ারির সঙ্গে। বাড়ি পাহারা দেবে। চোর-ডাকাত এলে ছুটে গিয়ে খবর দেবে কিশোর আর মুসাকে।

প্রথমে ঘরে থাকতে রাজি হলো না টকার।

তাকে বোঝালো মুসা। শেষে বললো, 'তোমার গাড়ি চালানোর এই তো সুযোগ। সোজা রেসিং-কার হয়ে ছুটে যাবে। তাছাড়া রাফিয়ান আর নটি থাকছে। নকল ড্যানির কি অবস্থা করেছিলো, ভুলে গেছো?'

হাসি ফুটলো টকারের মুখে।

বেরিয়ে পড়লো ওরা যার যার মতো।

ওয়ালটার লজে চললো কিশোর আর মুসা। গিয়ে দেখা গেল, আগের দিনের মতোই জানালা-দরজা বন্ধ। ডেনারও নেই বাগানে। বেল বাজালো, কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল না। খানিকটা নিরাশ হয়েই কটেজে ফিরে এলো দু'জনে।

ওখানেও কোনো রকম অঘটন ঘটেনি। দ্বিধায় পড়ে গেল কিশোর। তবে কি তার সন্দেহ অমূলক? গুপ্তধন চুরি করার আর কোনো চেষ্টা হবে না?

কিছুক্ষণ পরেই পিকাপ নিয়ে এলেন শেরিফ। সঙ্গে রবিন আর জিনা। তাদের সাইকেলগুলো পিকাপের পেছনে তুলে নিয়ে এসেছে।

গাড়ি থেকে নামলেন শেরিফ লিউবার্তো জিংকোনাইশান। তিন গোয়েন্দার পরিচিত। (সাগর সৈকত দ্রষ্টব্য) হেসে এগিয়ে এসে হাত মেলালেন কিশোর আর মুসার সঙ্গে। বললেন, 'কি ব্যাপার? তোমরা যেখানেই যাও, গুপ্তধন চলে আসে

নাকি তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে?'

কিশোরও হাসলো। 'সে-রকমই তো লাগে। চলুন, দেখাবো।'

বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে লিয়ারি। জিজ্ঞেস করলো, 'কেমন আছেন, শেরিফ?'

'ভালো। আপনি?'

'ভালো। যান, দেখুন গিয়ে। আমি চা করে ফেলছি। না খেয়ে যাবেন না কিন্তু,' বলেই তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে চলে গেল লিয়ারি।

সিঁড়ি বেয়ে আগে আগে নামলো কিশোর। নেমেই চিৎকার করে উঠলো।

কি হলো! হুড়মুড় করে নেমে এলো অন্যেরা। চমকে গেল কিশোরের মতোই। খাটটা সরানো। কাত হয়ে পড়ে আছে বস্তার স্তূপ। চাদরটা ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে একধারে। সুটকেসটা নেই।

ভুরু কুঁচকে রেখেছেন শেরিফ। 'শিওর, ওখানেই রেখেছিলে?'

'নিশ্চয়ই!' মুসা বললো। 'অনেক কষ্ট করেছি লুকিয়ে রাখতে।'

স্থির দাঁড়িয়ে রয়েছে কিশোর। ভাবছে। 'কিন্তু ঢুকলো কিভাবে?' বিড়বিড় করলো আনমনে। 'পাথরের দেয়াল···লিয়ারি বলেছিলো, আগে নাকি হান্টিং লজ ছিলো এটা। সেই বাড়ি ভেঙে তার ওপর তৈরি হয়েছে লিয়ারি কটেজ। সেলারের দরজায় নিজের হাতে তালা লাগিয়েছি আমি, নিজের হাতে খুললাম। তাহলে?'

'ওই জানালা দিয়ে নয় তো?' দেয়ালের অনেক ওপরের ছোট জানালাটা দেখালো রবিন। ওটা দিয়েই ঘরে আলো আসে।

'না। ওটা দিয়ে বড় মানুষ কেউ ঢুকতে পারবে না। বাচ্চা-টাচ্চা, টকারের মতো হলে···কিন্তু এতো ভারি একটা সুটকেস নিয়ে ওখানে উঠতে পারবে না টকারের মতো কেউ। বড় মানুষ হলেও মইয়ের দরকার হবে।'

'দা মিস্টরি অভ দা লকড্ রুম!' চেঁচিয়ে উঠলো টকার। একটা গোয়েন্দা গল্পের বইয়ের নাম। পড়েছে সে। 'প্রায় ওটার মতোই কাণ্ড হয়েছে এখানেও। ঢোকার পথ নেই। তাহলে সুটকেস নিয়ে গায়েব হলো কিভাবে?'

দরজা-জানালা সব পরীক্ষা করে দেখলেন শেরিফ। 'ভেঙে ঢোকার কোনো চিহ্ন নেই।'

ওপরে উঠে এলো সবাই।

শুনে, আরেকটু হলেই হাত থেকে চায়ের কাপ ফেলে দিয়েছিলো লিয়ারি। ছলকে খানিকটা চা পড়ে গেল মেঝেতে।

'প্রথম থেকে সব বলো তো আবার, শুনি,' সোফায় বসে বললেন শেরিফ।

গোড়া থেকে আবার বলা হলো তাঁকে।

'হুঁ,' চা শেষ করে কাপটা ঠক করে নামিয়ে রাখলেন টেবিলে। 'ওই ডেনার ব্যাটাকেই গিয়ে ধরতে হবে। জানতে হবে, কাকে পাঠিয়েছিলো ড্যানির পরিচয় দিয়ে।'

এগারো

সরাসরি সব অস্বীকার করলো ডেনার—সে কিছুই জানে না। এমনকি নোটটাও নাকি সে লেখেনি। সেটা প্রমাণও করা গেল না। কারণ, হাতের লেখা মিললো না। মহাধড়িবাজ লোক। নিশ্চয় অন্য কাউকে দিয়ে লিখিয়েছে, হতে পারে নকল ড্যানিকে দিয়েই। তাকে ধরা গেল না। হয়তো লুকিয়ে আছে কোথাও, কিংবা পালিয়ে গেছে। মোট কথা, ডেনারের মুখ থেকে কিছুই বের করা গেল না। তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন শেরিফ। দোষী প্রমাণ করতে না পারলে আটকে রাখবেন কিভাবে?

হতাশ হয়ে কটেজে ফিরে এলো ছেলেরা। কিশোর নিশ্চিত, কাজটা ডেনারই করেছে। দুপুরের খাওয়া শেষে আলোচনায় বসলো সবাই।

মিটিঙে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, তদন্ত চালিয়ে যাবে ওরা।

'সেলারে চলো,' বললো কিশোর। 'আরেকবার খুঁজে দেখি, কোনো সূত্র পাওয়া যায় কিনা।'

'ওখানে গিয়ে আর কি দেখবো?' মুসা বললো। 'তখন আমরা সবাই দেখেছি। শেরিফ দেখেছেন। থাকলে কি পাওয়া যেতো না?'

'দেখেছি। তবে একটা জায়গা বাকি রয়ে গেছে। মনে পড়েছে আমার।'

অবাক হয়ে বললো মুসা, 'কোথায়?'

'চলো। দেখাবো।'

আবার সেলারে নামলো ওরা।

ঢুকেই জিজ্ঞেস করলো মুসা, 'কোথায়?'

'ওই যে,' হাত তুলে দেখালো কিশোর।

'ওগুলো তো বস্তা! ধাক্কা লেগে পড়েছে।'

'হ্যাঁ, বস্তা। তবে ধাক্কা নয়, বরং বলা ভালো, ঠেলা দিয়ে ফেলেছে।'

'ঠেলা তো পরে দিয়েছে। ঢুকলো কোনখান…'

'সেটাই তো দেখতে এলাম।' বস্তাগুলোর দিকে এগিয়ে গেল কিশোর। দ্রুত সরাতে শুরু করলো।

'গোপন পথ-টথ আছে ভাবছো নাকি?' পাশে এসে দাঁড়িয়েছে রবিন।

'হ্যাঁ।'

রবিন আর মুসাও হাত লাগালো। দেখতে দেখতে সরিয়ে ফেললো সমস্ত বস্তা। কিন্তু কোথায় গুপ্তপথ? কোনো চিহ্নই নেই। নিরেট পাথরের দেয়াল যেন ব্যঙ্গ করে হাসছে ওদের দিকে চেয়ে।

দেয়ালটার দিকে তাকিয়ে রইলো কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো দু'বার।

'এবার কি বলবে?' মুসা বললো।

'এখনও বলবো গুপ্তপথ আছে। নইলে ঢোকার আর কোনো উপায় নেই। এসো, খুঁজে দেখি।' বসে পড়ে দেয়ালে হাত রাখলো কিশোর। হাত বুলিয়ে দেখতে লাগলো, কোথাও বাধে কিনা, পাথরের কোনো কিনার বেরিয়ে আছে কিনা।

নেই। অন্যান্য খাঁজগুলোর মতোই বস্তার পেছনের চৌকোণা বড় পাথরটার কিনারে খাঁজ। অন্যগুলোর সঙ্গে কোনো তফাত নেই।

'এই, এসো তো,' ডাকলো কিশোর। 'সবাই ধাক্কা দাও।'

জোরে ধাক্কা দিতেই সরে গেল পাথরটা, দরজার পাল্লার মতো বেরিয়ে পড়লো কালো সুড়ঙ্গমুখ। টকার ধাক্কা দিচ্ছিলো এক কিনারে, আরেকটু হলেই হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলো সুড়ঙ্গের মধ্যে, যেভাবে হঠাৎ সরেছে পাথরটা।

'তাহলে আমিই ঠিক!' এতোক্ষণে হাসি ফুটলো গোয়েন্দাপ্রধানের মুখে। 'পুরনো এলাকা এটা, বাড়িঘর বেশির ভাগই পুরনো আমলের। আর এটা তো সবচেয়ে পুরনোগুলোর একটা। তখন লোকে এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়িতে সুড়ঙ্গ-যোগাযোগ রাখতো। বিশেষ করে হামফ্রে ওয়ালটারের মতো লোকেরা। আমার বিশ্বাস, এই সুড়ঙ্গ চলে গেছে একেবারে দুর্গটার নিচে। আর গেছে ওয়ালটার লজের নিচ দিয়ে, কিংবা পাশ দিয়ে। এটা জানে ডেনার। রাতে এই পথ দিয়েই চুরি করতে এসেছিলো। আর এমনি কপাল, একেবারে তার পথের মুখেই জিনিসগুলো রেখে দিলাম। আমি একটা গর্দভ! আরও ভালোমতো ভাবা উচিত ছিলো।'

'এখানে সুড়ঙ্গ রয়েছে জানার কথা নয় তোমার,' রবিন বললো। 'একটা কথা ঠিকই বলেছো। ডেনারই কাজটা করেছে। ওয়ালটারদের ওখানে অনেক দিন কাজ করছে সে, সব কিছু তার চেনা, জানা। সুড়ঙ্গ যে আছে, জানে।'

'তাহলে এখনও দাঁড়িয়ে আছি কেন আমরা?' বলে উঠলো মুসা। 'চলো না যাই। ও-ব্যাটা যেখান দিয়ে এসে নিয়ে গেছে, ওখান দিয়ে গিয়ে আমরা আবার ফেরত নিয়ে আসি।'

'গেলেই তো আর হলো না,' জিনা বললো। 'নিয়ে গিয়ে কোথায় লুকিয়েছে কি করে জানবো? তবে, এই সুড়ঙ্গ কোথায় গেছে দেখতে আপত্তি নেই আমার।'

বললে হয়তো যেতে দেবে না, তাই লিয়ারিকে কিছু জানালো না ওরা। ঘরে গিয়ে টর্চ নিয়ে এলো। ঢুকে পড়লো সুড়ঙ্গে।

গুপ্তদরজার কয়েক কদম পরেই সিঁড়ি পাওয়া গেল, নিচে নেমে গেছে। ওটা দিয়ে নেমে সরু একটা গলিপথ পাওয়া গেল, দু'ধারে পাথরের দেয়াল, মাথার ওপরে পাথরের ছাত, মানুষের তৈরি।

এগিয়ে চলেছে ওরা। মনে হচ্ছে, ধীরে ধীরে নেমে গেছে পথটা। তবে এতো নিচেও পানি নেই, শুকনো।

আগে আগে চলেছে মুসা। হঠাৎ টর্চ নিভিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তার গায়ের ওপর এসে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লো কিশোর। 'কি হলো?'

'শ্ শ্ শ্! একটা শব্দ শুনলাম!'

কয়েক মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো ওরা। কিছুই ঘটলো না। কিন্তু মুসা যখন শুনেছে বলেছে, নিশ্চয় শুনেছে, ভুল হতে পারে না। তার শ্রবণশক্তি খুবই প্রখর।

চোখে সয়ে এলো অন্ধকার। সামনে আবছা আলো পড়লো এখন।

'খোলা!' বললো টকার। 'সুড়ঙ্গ শেষ নাকি...'

'চুপ?' তাকে থামিয়ে দিলো কিশোর।

আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরও কিছুই ঘটলো না দেখে আবার এগোলো ওরা। খুব সাবধানে, পা টিপে টিপে। শুরুতে যেমন নেমেছিলো, এখন আবার উঠে যাচ্ছে পথটা। শেষ মাথায় পৌঁছে গেল। সুড়ঙ্গমুখ ঘিরে ঘন হয়ে জন্মেছে লতাপাতা, ঝোপ। ওগুলোর ফাঁক দিয়ে চোখে পড়লো উজ্জ্বল রোদ।

সাবধানে মাথা উঁচু করলো মুসা। 'আরি, ওয়ালটার লজ!' ফিসফিস করে বললো সে। 'ওই যে, বাংলোটা দেখতে পাচ্ছি।'

পেছন থেকে কিশোরও মাথা উঁচু করে দেখলো।

'এবার কি করবো?' জানতে চাইলো মুসা। 'বেরোবো?'

'এক মিনিট,' বললো কিশোর। 'দরজা-জানালা তো বন্ধ দেখা যাচ্ছে, অন্তত এদিকেরগুলো। দেখি, কেউ বেরোয় কিনা।'

'আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে,' সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে বললো টকার। 'বেরোও।'

তার কথার জবাব দিলো না কেউ।

পুরো এক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে কিশোর বললো, 'হ্যাঁ, এবার

বেরোনো যায়। শব্দ করবে না। ডেনার দেখে ফেললে হুঁশিয়ার হয়ে যাবে। বলা যায় না, বিপদেও ফেলে দিতে পারে।'

বেরিয়ে এলো সবাই।

পুরো এলাকাটাই নির্জন লাগছে। সুড়ঙ্গমুখের কাছে ঝোপের ভেতরে বসে রইলো ওরা। সময় কাটছে খুব ধীরে। কিশোর ভাবছে, নিশ্চয় গাছপালা পরিষ্কার করার সময় কোনোভাবে এই সুড়ঙ্গমুখ আবিষ্কার করে ফেলেছে ডেনার। হয়তো ডাক্তার ওয়ালটারও এ-সম্পর্কে কিছু জানেন না।

আরও কিছুক্ষণ কাটলো।

ঝোপ থেকে বেরোনোর নির্দেশ দিলো কিশোর।

বাড়িটার দিকে এগোলো ওরা। শান্ত, যেন ঘুমিয়ে রয়েছে বাংলো।

'নেই কেউ,' টকার বললো।

'আস্তে বলো,' বললো কিশোর। 'শুনে ফেলবে।'

'যদি থাকে,' বললো জিনা।

'থাকতেও পারে।'

বাংলোর ধার ঘুরে একপাশে চলে এলো ওরা। খানিক দূরে একটা ছোট কটেজ দেখা গেল।

'নিশ্চয় ওখানে থাকে ডেনার,' কটেজটা দেখিয়ে বললো রবিন।

'চলো, গিয়ে দেখি,' কিশোর বললো। 'আছে কিনা।'

'কী?' মুসার প্রশ্ন। 'গুপ্তধনগুলো?'

'না, ডেনার। আমার মনে হয় না। গুপ্তধন ঘরে রাখবে। ভয় আছে না? শেরিফ যদি গিয়ে খোঁজাখুঁজি করে?'

'যাবো? যদি দেখে ফেলে?' দ্বিধা করছে মুসা।

'নাথিং ভেনচার, নাথিং উইন!' এরকম কাজ আর আগে কখনও করেনি টকার, খুব মজা পাচ্ছে। এর তুলনায় গাড়ি হওয়াটা অনেক পানসে মনে হচ্ছে এখন তার কাছে।

'ঠিক,' সায় জানিয়ে বললো কিশোর। 'ঝুঁকি না নিলে জিতবো কিভাবে? আর, ফরচুন ফেভারস দা বোল্ড।'

'হয়েছে হয়েছে,' দু'হাত তুললো মুসা। 'ওসব তত্ত্বকথা শুনতে ভাল্লাগে না। চলো যাই।'

কটেজের পেছনের ছোট বাগানে চলে এলো ওরা, বিন্দুমাত্র শব্দ করলো না। রাফিয়ানও একেবারে চুপ। টকারের কাঁধে বসা নটিও। কিভাবে যেন বুঝে গেছে, এখন 'জরুরী অবস্থা'।

উঁকি দিয়ে দেখে এলো রবিন। 'ডেনার ব্যাটা আছে ঘরে! আরও একজন আছে।'

'দেখি তো,' এগিয়ে গেল মুসা। কয়েক কদম এগিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোলো। থামলো গিয়ে নিচতলার একটা জানালার নিচে। তারপর ধীরে, খুব ধীরে মাথা তুললো।

অন্যেরাও একইরকম ভাবে গিয়ে থামলো তার পাশে। এক এক করে মাথা তুলতে লাগলো। ঘামছে দরদর করে, যতোটা না পরিশ্রমে, তার চেয়ে বেশি উত্তেজনায়। গরম তেমন নেই। ঝোপ থেকে যখন বেরিয়েছিলো, কড়া রোদ ছিলো। এখন নেই। যেন চোখের পলকে কোথা থেকে এসে উদয় হয়েছে কালো মেঘ, ঢেকে দিচ্ছে সূর্য।

বাইরের আলোর তুলনায় ঘরের ভেতরে অন্ধকার। আবছামতো দেখা যাচ্ছে দু'জন মানুষকে। তবে ওদের চিনতে কোনো অসুবিধে হলো না ছেলেদের।

একজন ডেনার। অন্যজন সেই কালো-চুল তরুণ, নকল ড্যানি। একটা টেবিলের দু'ধারে বসেছে দু'জনে। টেবিলের ওপর দুই বোতল বিয়ার। শান্ত কণ্ঠে কথা বলছে। নিজেদের আলোচনায় এতোই মগ্ন, ওদেরকে যে দেখছে পাঁচজোড়া চোখ, খেয়ালই করলো না।

বারো

'আসার সময় শেরিফের একজন লোককেও দেখোনি? আশ্চর্য!' বললো ডেনার। 'এই একটু আগে এসেছিলো ওরা, কটেজে খুঁজে দেখতে। গাধার দল। খালিহাতে ফিরে গেছে। ওদের বোকামি দেখে হাসি পেয়েছিলো আমার।'

'চাচা, তুমি একটা জিনিয়াস,' হেসে বললো তরুণ। 'নিশ্চয় তাজ্জব করে দিয়েছো ওদের। ওরা কল্পনাও করতে পারবে না, কোথায় লুকিয়েছো।'

'না, তা পারবে না। তোমাকে তো আগেই বলেছি, কিচ্ছু করতে পারবে না।'

'তবে, এজন্যে ছেলেগুলোকেও ধন্যবাদ দেয়া দরকার। ওরাই তো খুঁজে পেয়েছে। আর এমন জায়গায় নিয়ে লুকিয়েছে...হাহ্ হাহ্ হা! যা-ই বলো, সেলারে না রেখে ঘরে রাখলে কিন্তু বের করে আনা মুশকিল হতো। বিচ্ছু একেকটা। সঙ্গে বাঘের মতো এক কুত্তা। বানরটাও আস্ত বাঁদর।' এক মুহূর্ত চুপ করলো। 'খুলে দেখেছো নাকি?'

'দেখেছি। চমকে গিয়েছিলাম একেবারে। এতো দামী দামী সব জিনিস।'

'কিন্তু চাচা, ওসব জিনিস বেচবে কোথায়? যে দেখবে সে-ই সন্দেহ করবে।'

'তুই কি ভাবছিস সেকথা ভাবিনি? ব্যবস্থাও করে ফেলেছি। হলিউডে একটা লোক আছে, চোরাই মালের ব্যবসা করে। তার নাম লিংকার। আমার পুরনো দোস্ত। ওর কাছে নিয়ে গেলেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তবে তাড়াহুড়ো নেই। আর তাড়াহুড়ো করা উচিতও হবে না। শেরিফ কিছুদিন কড়া নজর রাখবে আমার ওপর। পরিস্থিতি এখন গরম, ঠাণ্ডা হয়ে নিক, তারপর ধীরেসুস্থে তুলে নেবো। এখন যেখানে আছে সেখানেই নিরাপদ, থাক।'

'সফল হবো তো, চাচা?'

'এখনও তোর সন্দেহ আছে নাকি, ডজ?'

এরপর আর বিশেষ কোনো কথা হলো না। নীরবে বিয়ার খেয়ে চললো দু'জনে। এক সময় উঠে বেরিয়ে গেল ডজ। মোটর সাইকেলের এঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার শব্দ হলো। পথের দিকে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল আওয়াজ।

মাথা নিচু করে ফেললো ছেলেরা। একে অন্যের দিকে তাকালো। অল্প সময়ে অনেক কথা জেনে ফেলেছে। শেরিফ এসেছিলেন, ডেনারের কটেজ খুঁজে বিফল হয়ে ফিরে গেছেন, কিছু পাওয়া যায়নি। আর ড্যানি সেজে যে গিয়েছিলো, তার আসল নাম ডজ, ডেনারের ভাইপো। চাচা-ভাতিজা মিলে গুপ্তধনগুলো চুরি করেছে। তৃতীয় আরেক লোক, লিংকারের মাধ্যমে ওগুলো বিক্রি করবে। তবে সেটা কয়েকদিন পর। তারমানে গোয়েন্দাদের হাতে সময় আছে। খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে পারবে।

কিন্তু আসল কথাটাই জানা যায়নি। ডেনবার একবারও বলেনি, গুপ্তধনগুলো কোথায় লুকিয়েছে।

আর এখানে থেকে কোনো লাভ নেই। ডেনার দেখে ফেললে বিপদে পড়বে। লিয়ারি কটেজে ফিরে চললো ওরা।

ওয়ালটার লজের সীমানার বাইরে চলে এলো।

'ডাক্তার ওয়ালটার থাকলে সুবিধে হতো এখন,' জিনা বললো। 'আজকালের মধ্যে চলে এলেও হতো। তাঁকে বলতে পারতাম।'

'কি আর হতো?' রবিন হাত নাড়লো। 'যা জেনেছি, শেরিফকে গিয়েও তো বলা যায়। কিন্তু লাভটা কি হবে?'

'ঠিকই বলেছো,' চিন্তিত মনে হচ্ছে গোয়েন্দাপ্রধানকে। 'বড় জোর আবার ধরে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করবেন ডেনারকে। ডেনার অস্বীকার করবে। তাতে আরও ক্ষতি হবে। আবারও হুঁশিয়ার হয়ে যাবে সে। গুপ্তধন নিয়ে পালিয়ে যাবে। নাহ্, খুঁজে বের করার চেষ্টা আমাদেরকেই করতে হবে।...আমার ধারণা, ওয়ালটার লজের কাছাকাছি কোথাও লুকানো হয়েছে ওগুলো। বেশি দূরে রাখেনি

ডেনার। আর এ-রকম সাধারণ চোরেরা যা করে, তা-ই করবে। মাঝে মাঝেই দেখতে যাবে, ঠিকমতো আছে কিনা জিনিসগুলো। এখন আমাদের প্রধান কাজ হলো ওর ওপর চোখ রাখা। ও-ই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে আমাদেকে।'

'বেশ,' মুসা বললো। 'কাল থেকে তাহলে তা-ই করা যাবে।'

পরদিনও ডাক্তার ওয়ালটার ফিরলেন না। তিনি থাকলে সুবিধে হতো ছেলেদের। তাঁর অনুমতি নিয়ে সহজেই খুঁজতে পারতো ওয়ালটার লজ আর আশপাশের এলাকায়। অনধিকার প্রবেশের দায় এড়াতে পারতো।

ওয়ালটার লজে ঢুকলো না ওরা। ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পালা করে চোখ রাখতে লাগলো ডেনারের কটেজের ওপর। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রাখে, রাতে বাদ।

কিন্তু লোকটার দৈনন্দিন কাজ বড় একঘেয়ে। ওয়ালটার লজের সীমানার বাইরেই যায় না, শুধু বাজার করা ছাড়া। হয় ঘরে বসে থাকে, নয়তো বাগানের লতাপাতা ঘাস সাফ করে।

দু'দিন কাটলো এভাবে।

কিশোর এখন বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছে, কটেজের ভেতরে বা বাইরে খুব কাছেই কোথাও গুপ্তধন লুকিয়েছে ডেনার। শেরিফের লোক জায়গামতো খুঁজতে পারেনি, তাই পায়নি।

কিশোরের সঙ্গে একমত হলো অন্যেরাও। নইলে কটেজ থেকে দূরে পারতপক্ষে যায় না কেন ডেনার? আসলে, কুকুর যেমন হাড় পাহারা দেয়, লোকটাও জিনিসগুলো পাহারা দিচ্ছে কাছে কাছে থেকে।

'নাহ্, এভাবে চলতে পারে না,' তৃতীয়দিন বললো কিশোর।

কিছু একটা করা দরকার। আজ ডেনার বাজারে গেলেই ঢুকবো। আমরা আবার তার কটেজে খুঁজে দেখবো।'

'যদি ধরা পড়ি?' মুসা প্রশ্ন তুললো।

'পড়লে কি করবে? সে নিজেই এখন শেরিফের ভয়ে অস্থির। বেশি বাড়াবাড়ি করলে বলবো, আমরা সব জানি। চুপ হয়ে যাবে।'

বললো বটে কিশোর, কিন্তু কথাটা তার নিজেরই পছন্দ হলো না। সত্যি কি চুপ হবে? ওরকম একজন লোক, এতোগুলো দামী জিনিসের জন্যে বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারে। হয়তো আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে তার কাছে, কে জানে!

কিন্তু পরিকল্পনায় অটল রইলো কিশোর।

সুযোগ মিললো সেদিন বিকেলেই। ওয়ালটার লজের এক প্রান্তের লনের ঘাস ছাঁটতে গেল ডেনার। অনেকক্ষণ লাগবে কাজ করতে। সোজা তার কটেজের দিকে

এগিয়ে গেল ছেলেমেয়েরা।

ঢুকতে অসুবিধে হলো না। নিচতলার একটা জানালা খোলা। চৌকাঠ ডিঙিয়ে টপাটপ ভেতরে ঢুকে পড়লো ওরা।

অনেক খোঁজাখুঁজি করলো। কিছুই পেলো না।

জোরে নিঃশ্বাস ফেলে বললো মুসা, 'পাবো কি? শেরিফের লোকেরা ট্রেনিং পাওয়া, চোরাই জিনিস কিভাবে খুঁজতে হয় ভালো করেই জানে। তারা যখন পায়নি, আমাদের আশা করাটাই বোকামি হয়েছে।'

'কিশোর,' রবিন জিজ্ঞেস করলো। 'কিছু বলবে?'

'আমার এখনও বিশ্বাস, ধারেকাছেই কোথাও রয়েছে ওগুলো। কটেজের ওধারে ছোট ছোট দুটো ঘর আছে না, ওগুলোতেও খুঁজতে হবে...'

থেমে গেল কিশোর। পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে।

'নিশ্চয়ই ডেনার!' কাঁপা গলায় বললো জিনা।

উঁকি দিয়ে দেখার জন্যে পা বাড়ালো টকার, তাকে আটকালো কিশোর। দ্রুত একবার সারা ঘরে চোখ বোলালো, ওদের কোনো চিহ্ন ফেলে যাচ্ছে কিনা দেখলো। তারপর সবাইকে নিয়ে আবার নিঃশব্দে জানালা দিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে।

ওরা বেরোতে আর সামান্য দেরি করলেই ধরা পড়ে যেতো। ডেনারই আসছে।

ফেরার পথে ছোট একটা পশুচারণভূমিতে, একটা ওক গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিতে বসলো ওরা।

'নিরাশ হলে চলবে না,' বললো কিশোর। 'কাল আবার খুঁজতে যাবো। আমি শিওর, দুর্গ আর লজের তলায় আরও সুড়ঙ্গ আছে। ওরকম কোনোটাতেই গুপ্তধন লুকিয়েছে ডেনার।'

পরদিন আবার গেল ওরা। ওয়ালটার লজে পাতাবাহারের বেড়া ছাঁটতে ব্যস্ত ডেনার। সেদিন আর তার কটেজে ঢুকলো না ওরা। বাগান, আর বাগানের কাছের ছড়ানো চত্বরে খুঁজতে লাগলো। একটা ছাউনি দেখা গেল, সামনের দিকে দেয়াল নেই। খোলা। ওটা লুকানোর জায়গা নয়। তবু তার ভেতরে খুঁজে দেখা হলো।

ছাউনি থেকে বেরিয়ে আরেকটা ছোট ছাউনিমতো দেখতে পেলো। ভেতরে পাথরে তৈরি কাপড় ধোয়ার জায়গা। জায়গাটাকে ঘিরে দেয়া হয়েছে ফুটখানেক উঁচু পাথরের দেয়াল দিয়ে।

পায়ে পায়ে সেদিকে এগোলো কিশোর। প্রত্যেকটা পাথর খুঁটিয়ে দেখলো। তারপর হাত নেড়ে ডাকলো, 'এই দেখে যাও।'

প্রায় ছুটে এলো সবাই।

'এই পাথরটা সরাতে হবে।'

'নিচে কিছু আছে ভাবছো?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'দেখাই যাক না সরিয়ে।'

সবাই হাত লাগালো। সহজেই সরিয়ে ফেললো পাথরটা। পুরনো মরচে ধরা একটা হ্যাণ্ডেল দেখা গেল। ওটা ধরে টানতেই কাজ করলো পুরনো মেকানিজম, কাপড় ধোয়ার জায়গাটার ওপর থেকে সরে গেল একটা বড় পাথর। বেরিয়ে পড়লো একটা গহ্বর। আরেকটা সুড়ঙ্গমুখ? নাকি কুয়া? কিন্তু কুয়ার ওপর এই বিশেষ ব্যবস্থায় ঢাকনা লাগাতে যাবে কেন?

'নিশ্চয় সুড়ঙ্গ,' অন্ধকারে গর্তটার ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখলো কিশোর। 'চলো, নেমে দেখি।'

দরকার পড়তে পারে। তাই টর্চ সঙ্গেই এনেছে ওরা।

'হ্যাঁ, সুড়ঙ্গই। সিঁড়িও আছে। একে একে নেমে পড়লো সবাই। রাফিয়ান নামলো জিনার পেছনে। কিশোর রয়েছে আগে।

সিঁড়ির পাশে দেয়ালে একটা লেভার দেখা গেল। কিসের লেভার? ওপরের পাথরের ঢাকনাটা নিচ থেকে বন্ধ করার?—ভাবলো কিশোর। চাপ দিলো। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল ওপরের ঢাকনা। উল্টো দিকে চাপ দিতেই খুলে গেল আবার।

ঠিক এই সময় শোনা গেল ভারি জুতোর আওয়াজ। এদিকেই আসছে।

তাড়াতাড়ি লেভার চেপে আবার ঢাকনা বন্ধ করে দিলো কিশোর। 'নিশ্চয় ডেনার। আমাদের দেখেছে বলে মনে হয় না। এখন এখানে এসে না ঢুকলেই বাঁচি।'

ডেনারের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলো না ওরা। সে দেখে ফেলবে, আগেই লুকানোর একটা জায়গা খুঁজে বের করার জন্যে সুড়ঙ্গ ধরে আগে বাড়লো, দ্রুত।

দুরুদুরু করছে সবার বুক। কিশোরের পেছনে রয়েছে রবিন, তার পেছনে টকার আর তার কাঁধে নটি। মুসা রয়েছে তার পেছনে। সবার পেছন জিনা আর রাফিয়ান।

তেরো

অসমতল, এবড়ো-খেবড়ো মেঝে। মাঝে মাঝে চোখা পাথর বেরিয়ে আছে। সাবধানে এগোতে হচ্ছে, নইলে হোঁচট খেয়ে পড়ার সম্ভাবনা।

সামনে মোড় নিয়েছে সুড়ঙ্গ। ওখানে এসে থামলো ওরা। কান পাতলো।

'না, কিছু শোনা যাচ্ছে না,' জোরে কথা বলতে ভয় পাচ্ছে মুসা। নীরব সুড়ঙ্গের দেয়ালে প্রতিহত হয়ে ফিসফিসানিই হয়ে উঠলো অনেক জোরালো।

কিন্তু মুসার সঙ্গে একমত হতে পারলো না যেন রাফিয়ান। কান খাড়া করে রেখেছে। মৃদু গরগর করছে।

রাফিয়ানই ঠিক। অতি মৃদু একটা শব্দ কানে এলো ওদের।

'পাথর সরাচ্ছে!' বলে উঠলো টকার।

'জলদি!' বলেই প্রায় দৌড় দিলো কিশোর।

এখানে ডেনার তাদেরকে দেখে ফেললে কি করবে বলা যায় না। হয়তো কিছুই করবে না, কিন্তু সন্দিহান হয়ে উঠবে। তাহলেও ওদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। গুপ্তধন সরিয়ে ফেলবে ডেনার—যদি এই সুড়ঙ্গের কোথাও থেকে থাকে। হয়তো নিয়ে পালাতেও পারে আগেভাগেই।

সকলের পাশ কাটিয়ে আগে চলে এলো রাফিয়ান। মাটিতে গন্ধ শুঁকে শুঁকে এগোলো। কোনো বিপদ থাকলে তার নাকে ধরা পড়বে।

পেছনে এগিয়ে আসছে ভারি জুতোর শব্দ। দ্রুত। এই সুড়ঙ্গ ডেনারের চেনা, কাজেই তাড়াতাড়ি চলতে তার কোনো দ্বিধা নেই। অসুবিধেও হচ্ছে না। এই হারে এগিয়ে এলে কিছুক্ষণের মধ্যেই ওদের কাছে চলে আসবে।

হঠাৎ থেমে গেল গোয়েন্দারা। ছোট গোল একটা গুহায় ঢুকেছে। মেঝেতে পাথরের ছড়াছড়ি। গুহার অন্য ধারের দেয়ালের ওপাশে আবার রয়েছে সুড়ঙ্গ। মাঝখানের পথ রুদ্ধ। লোহার পাল্লা, মোটা মোটা শিক।

পেছনে যাওয়ার উপায় নেই, সামনেও দরজা বন্ধ। ফাঁদে আটকা পড়লো ওরা!

গোঁ গোঁ করে উঠলো রাফিয়ান। পাগলের মতো এদিক ওদিক তাকালো টকার, জিনা আর মুসা; লুকানোর জায়গা খুঁজছে। রবিনের স্নায়ুর জোর ওদের চেয়ে বেশি। আর কিশোর একেবারে শান্ত। সহজে মাথা গরম হয় না তার। একগাদা পুরনো বস্তা অযত্নে ফেলে রাখা হয়েছে এককোণে, সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে সে।

'কুইক!' বললো আচমকা। 'ওগুলোর তলায়ই লুকাতে হবে।'

ছুটে গেল সবাই। রাফিয়ানকে শুইয়ে বস্তা দিয়ে ঢেকে দিলো জিনা। এক এক করে সবাই শুয়ে পড়লো, গায়ের ওপর টেনে দিলো বস্তা। চুপ করে অনড় পড়ে রইলো। পারলে নিঃশ্বাসও বন্ধ করে রাখতে চায়। টর্চ নিভিয়ে দিয়েছে। ফলে গাঢ় অন্ধকার গুহার ভেতরে।

স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে ডেনারের জুতোর শব্দ। খানিক পরেই গুহায় ঢুকলো।

বস্তার তলা থেকেও তার হাতের লণ্ঠনের আলো দেখতে পেলো ওরা।

'এদিকে তাকাবে না তো ব্যাটা!' মুসা ভাবলো। 'তাহলে যা থাকে কপালে, পাথর দিয়ে মারবো মাথায় বাড়ি!'

তবে বাড়ি আর মারতে হলো না তাকে। হয় এদিকে তাকালোই না ডেনার, কিংবা তাকালেও বুঝলো না যে কেউ লুকিয়ে রয়েছে।

থেমে গেল পায়ের শব্দ। নিশ্চয় পাল্লার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ডেনার। আপন মনেই কথা বললো, 'বুদ্ধি ছিলো হামফ্রে ব্যাটার। এমনভাবে লাগিয়েছে, বোঝার উপায় নেই। হা-হাহ্!'

ক্লিক করে শব্দ হলো। ছেলেরা বুঝলো, দরজা খুলছে ডেনার। কিঁচকিঁচ আওয়াজ হলো, খুব সামান্য। কব্জাগুলোয় তেল দিয়ে রেখেছে হয়তো ডেনার।

আস্তে করে বস্তার একটা কোণ তুলে তাকালো কিশোর। এদিকে পেছন করে রয়েছে কেয়ারটেকার। পাল্লা খুলে গেছে। লণ্ঠন হাতে সুড়ঙ্গের ভেতরে ঢুকে গেল লোকটা।

'এবার কি করবো?' ফিসফিসিয়ে বললো মুসা। 'উঠে দৌড় দেবো?'

'না,' নিষেধ করলো কিশোর। 'কাছেই রয়েছে ডেনার। শুনে ফেলবে।' কান পেতে শুনলো এক মুহূর্ত। 'আমার মনে হয়, গুপ্তধনগুলো দেখতে গেছে সে। দেখে চলে যাবে। তখন আমরা গিয়ে খুঁজে বের করে ফেলবো।'

কিন্তু ডেনার আর আসে না।

ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে ওরা। পুরনো বস্তা, ধুলোময়লার নিচে শ্বাস নিতেও কষ্ট হয়। সময় যেন আর কাটতে চাইছে না। 'দুত্তোর!' বলে উঠে পড়তে যাচ্ছিলো মুসা, এই সময় শোনা গেল পাল্লা খোলার শব্দ।

নিজে নিজে কথা বলতে বলতে বেরিয়ে এলো ডেনার। 'হাহ্ হা, কি চমৎকার! সোনার মোহর! বড় লোক হয়ে যাবে তুমি, মিস্টার ডেনার। হোহ্ হো!'

ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল তার প্যায়ের আওয়াজ।

আরও কয়েক মিনিট অপেক্ষা করলো কিশোর। তারপর বস্তা সরিয়ে উঠে বসলো। 'শুনলে তো কি বললো? সোনার মোহর। এখানেই কোথাও লুকিয়েছে।'

বস্তার নিচ থেকে বেরিয়ে এলো সবাই। মুখে কাপড়ে লেগে থাকা ধুলো ঝাড়লো। বার কয়েক লাফঝাঁপ দিয়ে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করে নিলো রাফিয়ান। বানরটাও নাচলো তার সঙ্গে।

'এই, থামাও ওকে,' টকারকে বললো কিশোর। 'বেশি শব্দ করছে। কোত্থেকে আবার শুনে ফেলে ডেনার···হ্যাঁ, যা বলছিলাম, এখানেই আছি। ওটার ভেতরে,' পাল্লাটা দেখালো সে। 'লেভার-টেভার কিছু নিশ্চয় আছে।'

খুঁজতে শুরু করলো সবাই।

রবিনের আঙুলে লাগলো জিনিসটা। গোল একটা বোতামের মতো, পাল্লার পাশেই। জোরে চাপ দিতেই কিঁচকিঁচ করে খুলে গেল পাল্লাটা।

পাল্লার পরে সুড়ঙ্গ আর বেশি নেই। শেষ মাথায় খোলা। না, ঠিক খোলাও বলা চলে না। গোল মুখটা শেষ হয়েছে একটা কুয়ার দেয়ালে। বোধহয় মাঝামাঝি জায়গায়। ওপরের দিকে অনেক খানি উঠে গেছে সিলিণ্ডারের মতো গোল দেয়াল, নিচেও নেমে গেছে। কয়েক ফুট নিচে পানি।

'কুয়া আর পাল্লার মাঝেই কোথাও লুকিয়েছে,' মুসা বললো। 'এসো, খুঁজি।'

নিরাশ হতে হলো। যদিও সুড়ঙ্গের কোনো গর্ত, খাঁজ, ফাটল বাদ দিলো না। কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না গুপ্তধনের বাক্সটা।

'কোথায় রাখলো?' বিড়বিড় করলো রবিন। 'দেখবো নাকি আরেকবার খুঁজে?'

খোঁজা হলো আরেকবার। পাওয়া তো গেলই না, বরং একটা বিপদ বাধিয়ে বসলো টকার। হোঁচট খেয়ে গিয়ে পড়লো পাল্লার ওপর। ধাক্কা লেগে বন্ধ হয়ে গেল ওটা। 'এহ্হে, দিলাম তো সর্বনাশ করে!'

গুপ্তধন খোঁজা বাদ দিয়ে এখন পাল্লা খোলা নিয়েই ব্যস্ত হলো সবাই। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও এপাশে কোনো বোতাম বা লেভার পাওয়া গেল না। নেইই বোধহয়। শিক ধরে জোরে টানাটানি করে দেখলো। নড়লোও না মজবুত পাল্লা। শিকের ভেতর দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিলো মুসা—তার হাত আর সবার চেয়ে লম্বা—পাল্লার পাশের বোতামটা ধরার চেষ্টা করলো। নাগাল পেলো না। শেষে শিকের ফাঁক দিয়ে নটিকে ওপাশে ঠেলে বের করে দিলো টকার। ইশারায় বোঝালো, কি করে বোতামটা টিপতে হবে।

নির্দেশ মতোই কাজ করলো বানরটা। কিন্তু তার শক্তিতে কুলালো না। টিপে নামাতে পারলো না বোতাম।

আরেকবার শিক ধরে টানা হলো, ঝাঁকি দিয়ে দেখা হলো, বৃথা চেষ্টা। বন্ধই রইলো পাল্লা।

'হয়েছে, আর শক্তি খরচ করে লাভ নেই,' অবশেষে বললো কিশোর। 'খুলবে না।'

'ভালো জায়গায়ই আটকা পড়লাম!' বললো মুসা। 'কেউ জানে না আমরা এখানে আছি। সাহায্য করতে পারবে না।'

নিচের ঠোঁটে জোরে জোরে কয়েকবার চিমটি কাটলো কিশোর। তারপর ঘুরে এগিয়ে চললো কুয়ার দিকে। সুড়ঙ্গের মুখে এসে থামলো। ঝুঁকে টর্চের আলো

ফেললো পানিতে। কালো পানি। বোঝা গেল না, কতোখানি গভীর। যতোখানিই হোক, ওখান দিয়ে বেরোনোর পথ নিশ্চয় নেই। ওপর দিকে টর্চের মুখ ঘোরালো। দেখা গেল না কিছু। শেষ মাথায় পৌঁছলোই না ছোট টর্চের আলোকরশ্মি। নিভিয়ে দিলো টর্চ। দাঁড়িয়ে রইলো চুপচাপ। চোখে অন্ধকার সয়ে এলে দেখলো, অনেক ওপরে আবছামতো আলো দেখা যাচ্ছে।

'গুড,' বললো সে। 'কুয়ার মাথায় ঢাকনা, ফাঁক দিয়ে আলো আসছে। উঠে যেতে পারলে, হয়তো ঠেলে সরিয়ে ফেলা যাবে।'

'কিভাবে উঠবো?' গলা কাঁপছে টকারের। ভীষণ ভয় পেয়েছে। জীবনে এরকম অবস্থায় আর পড়েনি। নিজেকে দোষারোপ করছে মনে মনে।

'কিভাবে যাবো?' বলতে বলতেই আবার টর্চ জ্বাললো কিশোর। কুয়ার দেয়ালে আলো ফেলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলো। 'ওই যে, লোহার আঙটা লাগানো রয়েছে। ওঠানামা করার জান্যেই। একধরনের মই। বেয়ে উঠে যাবো।'

'যদি খসে পড়ে যায়?' জিনা বললো।

'পানিতে পড়বো। তাতে মরবো না। এখানে বসে থেকে তো লাভ নেই। চেষ্টা করা দরকার।'

'দাঁড়াও,' মুসা বললো। 'আমি আগে দেখি। আমার ভার সইলে সবারই সইবে।' একটা আঙটা ধরে হ্যাঁচকা টান দিলো সে। কিছু হলো না। ঝুলে পড়লো। তাতেও কিছু হলো না। খুব শক্ত করে গাঁথা হয়েছে পাথরের দেয়ালে।

আঙটা ধরে ধরে বেয়ে উঠে যেতে লাগলো মুসা। নিচ থেকে আলো ধরে রাখলো অন্যেরা। ওপরে উঠে দেখলো কাঠের ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে কুয়ার মুখ। নিচ থেকে হাত বাড়িয়ে ঠেলা দিতেই নড়ে উঠলো। সরিয়ে ফেলতে পারলো সহজেই।

বেরিয়ে এলো মুসা। ওয়ালটার লজের বাগানে বেরিয়েছে। একপলক দেখেই চিনলো জায়গাটা। কাছেই দেখা গেল সেই ঝোপটা, যার ভেতরে রয়েছে আরেকটা সুড়ঙ্গমুখ, যেটা দিয়ে সেদিন বেরিয়েছিলো।

কুয়ার দেয়ালে হাতের ভর রেখে ঝুঁকে ডাকলো, 'এই, উঠে এসো তোমরা।'

এক এক করে উঠে এলো টকার—কাঁধে নটি, জিনা, রবিন, কিশোর। রাফিয়ান রয়ে গেছে নিচে। সে মই বাইতে পারে না। এতো ভারি, তাকে বয়ে আনাও সম্ভব হয়নি।

নিচে চেয়ে চেঁচিয়ে জিনা বললো, 'রাফি, তুই থাক ওখানে। আমরা দড়ি নিয়ে আসছি।'

'ঘাউ' করে জবাব দিলো রাফিয়ান।

ডেনারকে কোথাও দেখা গেল না। লজের একটা ছাউনির ভেতরেই পাওয়া গেল দড়ির বাণ্ডিল।

ওটার একমাথা কোমরে বেঁধে আবার নিচে নেমে গেল মুসা। রাফিয়ানের কোমরে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বেঁধে দিয়ে উঠে এলো। তারপর সবাই মিলে দড়ি টেনে তুলে আনলো ভারি কুকুরটাকে।

কুণ্ডলি পাকিয়ে দড়িটা আবার আগের জায়গায় আগের মতো করে রেখে দিয়ে কটেজে ফিরে চললো ওরা।

অনেক কিছু দেখেছে, অনেক কষ্ট করেছে, কিন্তু গুপ্তধন পাওয়া যায়নি। আরও খুঁজতে হবে। কাজটা পরের দিনের জন্যে স্থগিত রাখা হলো। কিশোরের এখনও ধারণা, কুয়ার কাছাকাছিই কোথাও আছে ওগুলো। সুড়ঙ্গে নেই, এ-ব্যাপারে শিওর। তাহলে কোথায়? পানিতে নয় তো!

দিনের বেলা যাওয়া আর ঠিক হবে না। ডেনারের চোখে পড়ে যেতে পারে। সন্ধ্যার পর বেরোনোর সিদ্ধান্ত নিলো সে। কাজেই, রাতের খাওয়া শেষ করেই সাইকেল বের করলো। লিয়ারিকে বললো, ঘুরতে যাচ্ছে।

ওয়ালটার লজে পৌঁছে পাশের ছোট গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকলো। সাইকেলগুলো ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে সোজা চললো কুয়ার পাড়ে। সঙ্গে করে আজ বড় টর্চ এনেছে, আর শক্ত মোটা দড়ি।

দড়ির একমাথা কোমরে পেঁচিয়ে বাঁধলো কিশোর। কোনোরকম ঝুঁকি নিতে চায় না। বলা যায় না, পুরনো আঙটা বেশি ব্যবহারে খসে যেতে পারে। দড়ির আরেক মাথা বাঁধলো একটা গাছের সঙ্গে। তারপর সবাইকে ওপরে থাকতে বলে নামতে শুরু করলো।

পানির কাছাকাছি এসে থামলো। পকেট থেকে একটা পাথর বের করে ছেড়ে দিলো। টুপ করে ডুবে গেল পাথরটা। পাথরের সঙ্গে সুতো বাঁধা। খুব সামান্যই ছাড়তে হলো। তারমানে পানি বেশি নেই।

'গুড!' আনমনে বললো কিশোর! আঙটা ধরে ধরে আবার নামতে শুরু করলো। পানির নিচে তিন আঙটা নামতেই হাতে লাগলো কি যেন। ধরে দেখলো, দড়ি। পানিতে তার কোমর পর্যন্ত ডুবেছে। ওই অবস্থায় থেকেই এক হাতে টান দিলো দড়িতে। ভারি লাগলো। টেনে তুলতে লাগলো।

দড়ির মাথা বাঁধা বাক্সটা একনজর দেখেই চিনতে পারলো। তার অনুমান ঠিক। পানিতেই লুকিয়ে রেখেছে।

নিচে থেকেই চেঁচিয়ে বললো কিশোর, 'এইই, পেয়েছি! পেয়েছি!'

ওপর থেকে শোনা গেল উল্লসিত চিৎকার।

'উঠে আসছি,' আবার বললো কিশোর।

উঠতে উঠতে মাঝপথে এসে একবার রাফিয়ানের উত্তেজিত চিৎকার শুনতে পেলো কিশোর। ছেলেদের আনন্দে যোগ দিয়েছে হয়তো কুকুরটা, ভাবলো সে। এক হাতে বাক্স নিয়ে আঙটার মই বেয়ে উঠতে পারবে না। তাই কোমরের দড়ি খুলে বাক্সের দড়ির সঙ্গে বেঁধে রেখে এসেছে। ওপরে উঠে টেনে তুলবে।

কুয়ার বাইরে মাথা তুলেই স্থির হয়ে গেল কিশোর। ও, এজন্যেই হঠাৎ সবাই এতো চুপচাপ হয়ে গিয়েছে! পাশাপাশি এক সারিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে মুসা, রবিন, টকার, জিনা। রাফিয়ানের কলার চেপে ধরে রেখেছে জিনা। নটি চুপ করে বসে আছে টকারের কাঁধে। ওদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে ডেনার আর তার ভাইপো ডজ।

ডেনারের হাতে একটা দোনলা শটগান।

চোদ্দ

'উঠে এসো!' কড়া গলায় আদেশ দিলো ডেনার।

মুসার পাশে এসে দাঁড়ালো কিশোর।

দড়ি ধরে টেনে দেখলো ডজ। ভারি লাগলো। 'চাচা, বাক্সটা মনে হচ্ছে ঠিকই আছে। ওটার সঙ্গে বেঁধে রেখে এসেছে। ভারি বজ্জাত ছেলে।'

'আমাদের ছাড়বে না ওরা,' ভাবলো কিশোর, নিজের অজান্তেই কেঁপে উঠলো একবার। 'ছাড়লেই গিয়ে যদি শেরিফকে বলে দিই? আর তাই তো করবো!'

তার দিকে ফিরলো রবিন। সে-ও একই কথা ভাবছে। 'আমাদেরকে এখন কি করবে ওরা? মেরে কুয়ায় ফেলে দিলে কেউ খুঁজে পাবে না।'

অনেক দেরিতে আফসোস হলো কিশোরের, বাড়াবাড়িটা সে-ই বেশি করেছে। অন্যদের বিপদে ফেলার জন্যে সে-ই দায়ী।

চাপা গলায় গর্জাতে শুরু করলো রাফিয়ান।

'চুপ, রাফি!' তাড়াতাড়ি কুকুরটার মাথায় চাপড় দিয়ে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলো জিনা। ভয়, যদি রেগে গিয়ে গুলি করে ডেনার?

কথা মানলো রাফিয়ান।

গায়ে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে এলো ছেলেরা।

'ঠিকই আছে, চাচা,' বাক্সটা কিছুদূর তুলে টর্চের আলো ফেলে দেখে বললো ডজ। 'খোলার সময় পায়নি মনে হচ্ছে।' আবার বাক্সটা পানিতে নামিয়ে ওপর থেকে দড়ি কেটে দিলো সে। ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'বিচ্ছুগুলোকে কি

করা? ছেড়ে দেয়া তো যাবে না।'

'না। সর্বনাশ করে ফেলবে তাহলে। প্ল্যান বদলাতে হবে আমাদের। ওদের সরিয়ে দিয়ে...'

'সরিয়ে দিয়ে মানে? বন্দি করে রেখে?'

'থরথর করে কাঁপছে টকার তাকে সাহস দিয়ে মুসা বললো, 'আরে ভয়ের কি আছে? ব্যাটারা ছিঁচকে চোর, ডাকাত হওয়ার সাহস নেই।'

'এই, চুপ!' ধমক দিলো ডেনার। বন্দুকটা ওদের দিকে ধরে রেখে ভাইপোর সঙ্গে আলোচনা শুরু করলো।

'আমি বলি কি, চলো আজই পালিয়ে যাই,' পরামর্শ দিলো ডজ।

'তা করা যাবে না। লিংকার এখন হলিউডে নেই। আসবে আরও দু'দিন পর, খবর নিয়েছিলাম। এই বিচ্ছুগুলো দেখে ফেলায়ই যতো গণ্ডগোল হলো। হলিউডে মাল দিয়েই পালাতে হবে। নইলে ধরে ফেলবে পুলিশ।'

'দু'দিন এখানে বসে থাকলেও ধরে ফেলবে। এগুলোকে ছাড়লেই সোজা চলে যাবে শেরিফের কাছে।'

'ছাড়ছে কে? আটকে রাখবো।'

'কিন্তু কোথায়? রাতে ওরা না ফিরলেই হৈ-চৈ শুরু করবে লিয়ারি। শেরিফ খুঁজতে আসবে এখানে। তোমার কটেজে রাখা যাবে না, বাংলোতেও না। তাছাড়া ডাক্তাররাও এসে পড়তে পারে যে কোনো দিন।'

চুপ করে আছে ডেনার। ভাবছে।

'চাচা, পেয়েছি!' তুড়ি বাজিয়ে বলে উঠলো ডজ। 'সেদিন মোটর সাইকেল নিয়ে ঘুরছিলাম। সী-বীচ থেকে কিছু দূরে একটা ছোট দ্বীপ দেখেছি। দেখেই বোঝা যায়, লোক থাকে না ওখানে। ভাঙাচোরা দুর্গও আছে। এদেরকে ওখানে নিয়ে গিয়ে রেখে আসতে পারি। কিছু খাবার আর কম্বল দিয়ে এলেই হবে। মরবে না। তারপর লিংকার এলে মাল নিয়ে চলে যাবো আমরা। যাওয়ার আগে ফোন করে লিয়ারিকে বলে যাবো, ওরা কোথায় আছে। আইডিয়াটা কেমন?'

'ভালো,' একমত হলো ডেনার। 'ওয়ালটারদের বোটটা নিয়েই যেতে পারবো। চলো। এই, এসো তোমরা।'

আদেশ পালন করা ছাড়া উপায় নেই। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দৌড় দেয়ার কথা ভাবলো কিশোর, সঙ্গে সঙ্গেই বাতিল করে দিলো চিন্তাটা। বেপরোয়া হয়ে আছে এখন ডেনার। নির্দ্বিধায় গুলি চালাবে।

চলতে চলতে থেমে গেল ডেনার। 'ডজ, ভুল করছি না তো? হুট করে কিছু করা উচিত হবে না। চলো, কটেজে চলো আগে। আরও ভেবে দেখি, কি করা

যায়…'

ছেলেদেরকে কটেজে নিয়ে আসা হলো। দরজা-জানালা সব বন্ধ করে দিয়ে আলোচনায় বসলো চাচা-ভাতিজা।

'প্রথমেই ধরো লিয়ারির কথা,' ডেনার বললো। 'রাতে ছেলেদের ফিরতে না দেখলেই অস্থির হয়ে উঠবে। শিওর, শেরিফকে ফোন করবে।'

'ঠিকই বলেছো,' মাথা ঝাঁকালো ডজ। 'তাহলে?'

'বুড়িটাকে বোঝাতে হবে, ছেলেদের কোনো বিপদ হয়নি। ইয়ে করো, দড়ি দিয়ে ওদের হাত পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলো আগে।'

বন্দুক ধরে রইলো ডেনার, দ্রুত কাজ সারলো ডজ। রাগে দাঁতে দাঁত চাপলো জিনা, গালও দিলো। কিন্তু ডজ শুধু হাসলো। কেয়ারই করলো না।

'ইহ্, ধরে রাখতে রাখতে হাত ব্যথা হয়ে গেছে,' বন্দুকটা নামালো ডেনার। 'নাও, এটা ধরো। আমি আসছি।'

'কোথায় যাচ্ছো?'

'লিয়ারিকে ফোন করে আসি। বলবো, আমি পারকার। ছেলেমেয়েরা বাড়িতে এসেছে, থাকবে দু'তিন দিন।'

ঠোঁট কামড়ালো কিশোর। কোনো রকম ফাঁক রাখছে না ডেনার ব্যাটা!

'পাগল হয়েছো!' ডজ বললো। 'তোমার গলা চিনে ফেলবে না? বুড়িটা এতো বোকা না।'

'না, চিনবে না। রুমাল দিয়ে রিসিভার ঢেকে নেবো। 'দু'এক বার খুকখুক করে কাশবো। তাহলেই বুঝবে, ঠাণ্ডা লেগেছে। গলা অন্যরকম হয়ে গেছে। আমি আসলে পারকারই, আর কেউ নই, হাহ্ হাহ্-হা!'

'হেহ্ হেহ্ হে!' রেগে গিয়ে মুখ ভেঙচালো জিনা। রাফিয়ান ঘেউ করে উঠতেই বললো, 'এই, চুপ!'

ওদের দিকে ফিরেও তাকালো না চাচা-ভাতিজা।

'ভালোই বুদ্ধি করেছো, চাচা,' বললো ডজ। 'কাজ হবে।'

তাড়াতাড়িই ফিরে এলো ডেনার। 'হয়েছে,' ভাইপোর দিকে চেয়ে হাসলো। 'চলো, বেরোও ওদের নিয়ে। নৌকায়।'

'খাবার-টাবার আনোনি?'

'না। দরকার মনে করিনি। আরেকটা কথা ভেবেছি আমি। দূর থেকে দেখে তোমার মনে হয়েছে দ্বীপটাতে লোক থাকে না। ধরে নিলাম থাকে না। কিন্তু কারও পিকনিকে যেতে বাধা কোথায়? কিংবা দিনের বেলা জেলেরা যদি খুব কাছাকাছি চলে যায়? তারমানে ওপরে রাখা যাবে না ওদের। ভাঙা দুর্গ আছে বললে না?

মাটির তলায় নিশ্চয় সেলার-টেলার কিছু আছে...'

'কিংবা ডানজন।'

'তাহলে তো আরও ভালো। ভরে রাখবো ওখানে। বাইরে থাকছে না, ঠাণ্ডা লাগবে না, কাজেই কম্বলের দরকার নেই। আর খাবার-পানি ছাড়াই আটচল্লিশ ঘণ্টা বাঁচতে পারে মানুষ,' বলে আবার হাহ্ হাহ্ করে হাসলো সে। 'হয়েছে, চলো এবার।'

সাগর পারে নিয়ে আসা হলো ওদের। ওয়ালটারদের বোট হাউসে ছোট একটা মোটর লঞ্চে এনে তোলা হলো। এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে লঞ্চটা বোট হাউস থেকে বের করলো ডজ।

জিনার মুখে রহস্যময় হাসি দেখতে পেলো কিশোর, কিন্তু কোনো প্রশ্ন করলো না।

খুব শিগগিরই অবশ্য জিনার হাসি মুছে গেল। তীর থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে তখন লঞ্চ। কিনারে দাঁড়িয়ে আছে রাফিয়ান। সাবধান হওয়ার সামান্যতম সুযোগ না দিয়ে হঠাৎ এক ধাক্কায় তাকে পানিতে ফেলে দিলো ডজ। চেঁচিয়ে উঠলো জিনা।

খিকখিক করে হাসলো ডজ। তারপর একটানে টকারের কাঁধ থেকে বানরটাকে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিলো পানিতে।

'এই হারামীর বাচ্চা!' ভীষণ রাগে গাল দিয়ে উঠলো জিনা। 'এটা কি করেছিস। ভালো চাইলে জলদি তুলে আন!'

'না আনলে কি করবে?' হাসতে হাসতে বললো ডজ। 'না ফেলে উপায় ছিলো না। ঘাউ ঘাউ করে চেঁচাতো কুত্তাটা। জেলেরা শুনে ফেললে মুশকিলে পড়তাম। আর ওই বাঁদুরটাকে ট্রেনিং দেয়া আছে কিনা কে জানে? হয়তো তোমাদের বাঁধন খুলে দিতো। ওসব শয়তান জানোয়ার মরে যাওয়াই ভালো।'

'মরা তো উচিত তোর মতো হারামী জানোয়ারের,' ফুঁসে উঠলো জিনা। 'কুকুর আর বানর তো তোর চেয়ে অনেক ভালো।' দুটোকে ফেলে দেয়া হয়েছে, সে-জন্যে ভাবছে না সে, রাফিয়ান ডুবে মরবে না। খুব ভালো সাঁতার জানে। নটিও মরবে না। রাফিয়ানই তাকে বাঁচাবে। ভাবছে অন্য কারণে। পিছন পিছন আসছে কুকুরটা, মনিবকে সাহায্য করার জন্যে। এভাবে দ্রুত সাঁতরে এলে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। তখন বিপদ ঘটতেও পারে।

একটা দাঁড় তুলে নিয়ে রাফিয়ানকে শাসালো ডেনার। তা-ও আসছে দেখে শেষে বন্দুক তুলে নিলো।

চেঁচিয়ে বললো জিনা, 'এই রাফি, যা যা, চলে যা!'

চাঁদের আলোয় চোখ দেখা যাচ্ছে কুকুরটার। বিষণ্ন দৃষ্টি। থেমে গেল।

পানি এলো জিনার চোখে। অথচ সহজে কাঁদতে দেখা যায় না তাকে।

হাত বাঁধা না থাকলে এই মুহূর্তে বন্দুক কেন, কামান দেখিয়েও ঠেকানো যেতো না মুসাকে। ঝাঁপিয়ে পড়ে টুঁটি টিপে ধরতো ডজের। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ফেললো সে, প্রতিশোধ নেবো আমি, ডজ! তোকেও যদি না চুবাই, তো আমার নাম মুসা আমান নয়!

টকার কাঁদছে।

রবিন চুপ।

কিশোরও চুপ, পাথরের মতো নিথর। বোঝাই যায়, ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলেছে তার ক্ষুরধার মস্তিষ্কে।

কিছুক্ষণ পর দ্বীপের কিনারে এসে ভিড়লো বোট। জিনার রহস্যময় হাসির কারণ বোঝা গেল। দ্বীপটা গোবেল দ্বীপ, বন্দিদের অতি পরিচিত, টকার ছাড়া। জিনা হেসেছিলো, সে বুঝতে পেরেছিলো এই দ্বীপেই নিয়ে আসা হবে তাদেরকে। আশপাশে কয়েক মাইলের মধ্যে আর কোনো দ্বীপ নেই, যেটা মূল ভূখণ্ড থেকে দেখা যায়।

বন্দিদের নামার-আদেশ দিলো ডেনার। নিয়ে আসা হলো ভাঙা দুর্গের চত্বরে। সেখানে বন্দুক ধরে বসে রইলো ডেনার। ডজ গেল মাটির নিচে ঘর-টর আছে কিনা দেখতে।

প্রায় আধ ঘন্টা পর ফিরে এলো ডজ। ঘর পেয়েছে।

দুর্গের নিচে ডানজনে নিয়ে আসা হলো বন্দিদের। যে ঘরটায় আনলো, সেখানে এর আগেই একাধিকবার এসেছে জিনা আর তিন গোয়েন্দা।

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে টর্চের আলো ফেলে ঘরটা দেখলো ডেনার। সন্তুষ্ট হয়ে বললো, 'চমৎকার জায়গা। থাকো এখানেই দু'দিন। অন্ধকারে শুয়ে-বসে কাটিয়ে দিতে পারবে। গলা ফাটিয়ে চিল্লালেও কেউ শুনবে না, কেউ দেখতে আসবে না। তাতে শিক্ষা হবে। অন্যের ব্যাপারে নাক গলাবে না জীবনে...'

'নাক তো তোরা গলাচ্ছিস, শয়তানের বাচ্চা!' আবার গাল দিয়ে উঠলো জিনা।

'দু'দিন খেতে না পেলেই এই তেজ চলে যাবে,' শান্তকণ্ঠে বললো ডেনার। 'ডজ, চলো। আবার আসতে হবে এখানে...'

'নতুন কোনো আইডিয়া...'

'হ্যাঁ। এই ছেলেগুলো যখন খুঁজে পেয়েছে, ভালোমতো খুঁজলে শেরিফও পেয়ে যেতে পারে। লিয়ারিকে ফোন করে এসেছি বটে, কিন্তু বলা যায় না কি

ঘটবে। পারকার ফোন করতে পারে লিয়ারির কাছে, ছেলেমেয়েরা কেমন আছে জানার জন্যে। গোলমাল শুরু হবে তখন। বাক্সটা কুয়ায় রাখা আর ঠিক না। তার চেয়ে এই দ্বীপ অনেক বেশি নিরাপদ, এখানেই এনে রাখবো। তারপর লিংকার এলে তুলে নিয়ে চলে যাবো।'

পনেরো

বেরিয়ে গেল দুই শয়তান।

'গাধা, ব্যাটারা!' হেসে উঠলো মুসা। 'রাফিয়ানের চিল্লানী থামিয়েছে, অথচ আমাদেরকে বললো গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে। আরে হারামজাদারা, পাঁচজনের চিৎকার তো একটা কুকুরের চেয়ে অনেক বেশি হবে। যাকগে, ভালোই হয়েছে। আর এতোই আত্মবিশ্বাস, সব আলোচনা করেছে আমাদের সামনে। বাক্সটা যে এনে রাখবে, সে-কথাও।'

'ওরা জানে, আমরা এখান থেকে বেরোতে পারবো না,' বিষণ্ণ কণ্ঠে বললো টকার। 'যখন বেরোবো তখন ওরা পগার পার। ইস্, এতো শক্ত করে বেঁধেছে, হাত ঝিমঝিম করছে, আমার।'

জিনার রাগ কমেনি। বসে বসে ফুঁসছে। 'কে বললো বেরোতে পারবো না? রাফিয়ানকে ফেলে দিয়ে মনে করেছে বেঁচে গেল। ব্যাটারা জানেই না, আরামসে সাঁতরে গিয়ে তীরে উঠবে রাফি। আর এই দ্বীপটা যে আমার, তা-ও জানে না।'

কিশোর কোনো কথা বললো না। চুপচাপ উঠে চলে গেল দেয়ালের কাছে। বেরিয়ে থাকা একটা চোখা পাথরে ঘষতে শুরু করলো হাতের দড়ি। চামড়া ছিললো, রক্ত বেরোলো, তবু থামলো না। বাঁধন-মুক্ত হতেই হবে।

দেখাদেখি অন্যেরা উঠে এসে একই ভাবে পাথরে দড়ি ঘষতে লাগলো।

কতোক্ষণ লাগলো বলতে পারবে না, তবে, অবশেষে সফল হলো ওরা। প্রায় একই সঙ্গে কিশোর আর মুসার দড়ি ছিঁড়ে গেল। তারপর অন্যদের বাঁধন খুলে দেয়াটা কিছুই না।

ডানজন থেকে বোরোনোর পথ ভালোমতোই জানা আছে ওদের। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো। বড় একটা পাথর চাপা দিয়ে সিঁড়ির মুখ বন্ধ, ওভাবেই বন্ধ করার ব্যবস্থা, জানে ওরা। কয়েকবার ওই পাথর সরিয়ে ঢুকেছে, বেরিয়েছে। নিচে থেকে সবাই মিলে ঠেলে সরাতে অসুবিধে হলো না।

বাইরে বেরিয়ে এলো ওরা। খোলা আকাশের নিচে।

পূর্ব দিগন্তে আলো ফুটেছে। জেগে উঠেছে দাঁড় কাকের দল। তাদের কর্কশ

চিৎকারে কান ঝালাপালা। এতোক্ষণে হাসি ফুটলো জিনার মুখে। ওদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো সে। হাততালি দিয়ে বললো, 'আরে, দেখো দেখো, রাফি! ঠিক বুঝে গেছে কোথায় আছি আমরা।'

বেশ দূরে রয়েছে এখনও রাফিয়ান। ঢেউয়ের ওঠানামার ফাঁকে ফাঁকে শুধু তার মাথাটা দেখা যাচ্ছে। একা নয়। পিঠে বসে আছে নটি। দেখে, আনন্দে ধেইধেই করে নাচতে আরম্ভ করলো টকার।

সূর্য উঠলো। ভোরের কাঁচা রোদে ঝিলমিল করে উঠলো সাগর, পানি তো নয়, যেন তরল সোনা।

তীরে পৌঁছলো রাফিয়ান।

হুল্লোড় করে ছুটে গেল ছেলেমেয়েরা।

ঝাড়া দিয়ে গা থেকে পানি ঝাড়ছে রাফিয়ান আর নটি। কুকুরটাকে জড়িয়ে ধরলো জিনা। টকার কোলে তুলে নিলো বানরটাকে।

'রাফি,' আদর করতে করতে বললো জিনা। 'কিচ্ছু ভাবিস না। তোকে কষ্ট দিয়েছে তো, ভেবেছে পার পেয়ে যাবে। ব্যাটারা আসবে আবার। যতো খুশি কামড়াস তখন, কিচ্ছু বলবো না।'

টকার বললো নটিকে, 'হ্যাঁ, চুল ছিঁড়ে দিস। কামড়ে কান কেটে ফেলিস। আমিও মানা করবো না।'

ওদের কথাবার্তা শুনে হাসতে শুরু করলো মুসা। তার হাসি সংক্রামিত হলো সবার মাঝে। হো হো করে হাসলো সবাই। কাছেই বসে কৌতূহলী চোখে দেখছিলো একটা কাক। সম্মিলিত হাসির শব্দে চমকে উড়ে গেল 'কা-কা' করে। ব্যস, শুরু হয়ে গেল তুমুল কা কা। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসতে লাগলো কাকেরা।

'এখানে আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই,' কিশোর বললো। বাক্সটা খুঁজে বের করতে হবে। চলো, দেখি।'

বেশি খুঁজতে হলো না। চত্বরের একধারের মাটিতে দাগ দেখতে পেলো রবিন। সদ্য খোঁড়া হয়েছে। রাফি আর নটিকে লাগিয়ে দিতেই খুঁড়ে বের করে ফেললো বাক্সটা। আধ হাত মাটির তলায় লুকিয়েই নিশ্চিন্তে ফিরে গেছে ডেনার আর তার ভাইপো। গর্তের কিনারে একটা কাঠিও পুঁতে রেখে গেছে, চিহ্ন, যাতে পরে এসে চিনতে পারে।

'চলো, নিচে ভাঁড়ারে লুকিয়ে ফেলি,' বললো কিশোর।

ডানজনের পাশেই ছোট একটা ঘরকে ভাঁড়ার বানিয়ে নিয়েছে জিনা। কিছু টিনের খাবার, চিনি, লবণ আর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সব সময় জমা রাখে ওখানে। যাতে দ্বীপে এলে দরকারের সময় কাজে লাগে। ওখানেই এনে

গুপ্তধনগুলো লুকিয়ে রাখলো ওরা।

তুরুপের তাস এখন ছেলেদের হাতে। বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়েছে। গুপ্তধনগুলো আবার উদ্ধার করেছে। আর রয়েছেও ধরতে গেলে একেবারে নিজেদের বাড়িতে। ইচ্ছে করলেই যে কোনো সময় তীরে ফিরে যেতে পারে। কিন্তু আপাতত যাওয়ার ইচ্ছে নেই।

'কিশোর, ব্যাটাদের শায়েস্তা করা দরকার,' জিনা বললো। 'কিভাবে করা যায়?'

'সেটা পরেও আলোচনা করতে পারবো,' বলে উঠলো মুসা। 'পেটের মধ্যে ছুঁচো নাচছে। আগে ওটাকে দাঁড়িয়ে নিই।'

ভাঁড়ারের আলমারি থেকে দুধ, চকোলেট, কোকা বের করা হলো। রুটি নেই, তবে বিস্কুট আছে অনেক। স্টোভ বের করলো রবিন। বললো, 'মুসা, টকার, দৌড়ে গিয়ে পানি নিয়ে এসো।'

নাস্তা ভালোই হলো। বিস্কুট আর চকোলেটের সঙ্গে গরম গরম কোকা মেশানো দুধ। খেয়েদেয়ে শান্ত হয়ে এরপর আলোচনায় বসলো ওরা।

'দ্বীপে থাকাটা কিছু না,' বললো রবিন। 'দুই তিন দিন সহজেই কাটিয়ে দিতে পারবো। তবে, কেরি আন্টিকে একটা খবর দেয়া দরকার, যে আমরা ভালোই আছি।'

'সেটাও কোনো সমস্যা নয়,' জিনা বললো। 'সাঁতরে চলে যেতে পারবো।'

'আরে কি বলো?' বুকে চাপড় দিয়ে বললো গোয়েন্দাসহকারী। 'এই মুসা আমান থাকতে তুমি কষ্ট করবে কেন? আমিই যাবো।'

'আর খবর না দিলেই বা কি?' মুচকি হাসলো কিশোর। 'ব্যাটাদের আগে শিক্ষা দিয়ে নিই। তারপর একবারেই সকলে মিলে যাবো দ্বীপে।'

'মানে?' চকচক করছে টকারের চোখ। ভয়-ডর সব চলে গেছে। বরং মজা পাচ্ছে এখন।

'মানে হলো, ডেনার, ডজ আর তাদের দোস্ত লিংকার এখানে এলে দেখবে, তাদের জন্যে ফাঁদ পাতা রয়েছে। এরকম কিছু ঘটতে পারে, আশাই করবে না ওরা, তাই সোজা এসে আমাদের ফাঁদে পা দেবে। এখন আমাদের ভাবতে হবে, ফাঁদটা কী হবে।'

হেসে উঠলো মুসা। উরুতে চাপড় দিয়ে বললো, 'দারুণ আইডিয়া। খুব ভালো হবে। ব্যাটাদের চেহারাটা তখন যা দেখতে লাগবে না!'

'হ্যাঁ, একেবারে চমকে যাবে,' বললো রবিন। 'কল্পনাও করবে না, আমরা ছাড়া পেয়ে গেছি। খেয়েদেয়ে রীতিমতো আরামেই আছি...'

'আর রাফি আর নটিও বেঁচে আছে,' যোগ করলো টকার।

'সেই সঙ্গে গুপ্তধন গায়েব,' আনন্দে দাঁত বের করে হাসলো জিনা।

'এখন একটা ছক করে ফেলা দরকার,' কিশোর বললো। 'কড়া নজর রাখবো আমরা, পালা করে। ওরা যেন আগে আমাদেরকে দেখে না ফেলে সেই ব্যবস্থা করতে হবে।'

কিভাবে কি করবে, ঠিক করা হলো। আরও কিছু কাজ করলো, তাতেই যেন উড়ে চলে গেল সকালটা। লাঞ্চের আয়োজন করলো রবিন আর জিনা। টিনজাত সেদ্ধ সীম আর ভাজা মাংস আছে। ওগুলো বের করে গরম করলো। টিনের সংরক্ষিত কিছু ফলও বের করলো। এক প্যাকেট লেমোনেড ক্রিস্টাল আছে। ওগুলো থেকে কিছু নিয়ে ঝর্নার পানিতে মেশাতেই তৈরি হয়ে গেল লেমোনেড। পেটে হাত বোলাতে বোলাতে মুসা বললো, 'জিনা, কসম খোদার, এরপর ঝগড়া লেগে যদি তুমি আমার মাথার চুল সব ছিঁড়ে ফেলো, কোনোদিন কিচ্ছু বলবো না।'

'তোমার চুল থাকলে তো ছিঁড়বো? সব তো কোঁকড়া তার, খুলি কামড়ে রয়েছে।'

'তাহলে অন্য কিছু করো। এই যেমন, চিমটি কাটা, কিল মারা। চাইলে হাত কামড়েও দিতে পারো...'

'আমি কি রাফি নাকি, যে কামড়াবো?'

'রাফি না হও, ওর ঘনিষ্ঠ দোস্ত তো...'

'দোস্ত তো তুমিও...'

বাকযুদ্ধে কিছুতেই জিনাকে ঘায়েল করতে পারলো না মুসা। হাসলো সবাই। টকার বেশি হাসছে। এ-রকম রোমাঞ্চের স্বাদ জীবনে এই প্রথম পাচ্ছে। এ-রকম অ্যাডভেঞ্চারও কপালে জোটেনি কখনও। খুব ভালো লাগছে তার। গাড়ি হওয়ার কথা ভুলেই গেছে। ওটা এখন তার কাছে মনে হচ্ছে 'ফালতু'।

খাওয়ার পর একটা উঁচু জায়গা বেছে নিয়ে পাহারায় বসলো ওরা। ওখান থেকে সাগরের অনেকখানি দেখা যায়। কেউ এলে ওদের চোখ এড়িয়ে আসতে পারবে না।

সাঁঝ হলো। নামলো অন্ধকার রাত। বেশ কিছু কম্বলও রাখা আছে, পলিথিন দিয়ে মুড়ে রেখেছে জিনা। খুলে নিয়ে আসা হলো ওগুলো। আকাশে মেঘ নেই, কিন্তু বাতাস কনকনে ঠাণ্ডা। দুর্গের যে একটিমাত্র ঘর আছে, যেটার ওপরে ছাত, তাতে ঢুকে শুয়ে পড়লো সবাই, একজন বাদে। সে পাহারায় রইলো উঁচু জায়গাটায়। কয়েক ঘন্টা পাহারা দিয়ে এসে আরেকজনকে তুলে দেবে ঘুম থেকে।

প্রথম পাহারায় রয়েছে জিনা। পাশে রাফিয়ান। যেখানে বসেছে, তার খানিক দূর দিয়ে সরু পথ নেমে গেছে দ্বীপের ছোট সৈকতে।

জিনার পরে পাহারা দিলো মুসা। তারপর কিশোর। সব শেষে রবিন। কিন্তু চোরেরা এলো না।

পরের দিনও সারাটা দিন সাগরের দিকে চোখ রাখলো ওরা।

সেদিন সন্ধ্যার পর প্রথম পাহারায় বসলো টকার। বয়েস কম, এধরনের কাজে অভিজ্ঞতা নেই, তাই প্রথমে রাজি হতে চায়নি কিশোর। কিন্তু মুখ কালো করে যখন টকার বললো—ছোট বলে আমাকে অবহেলা করছো—আর রাজি না হয়ে পারলো না গোয়েন্দাপ্রধান। বললো, 'বেশ থাকো। তবে চোখ খোলা রাখবে। খবরদার, ঘুমোবে না।'

ঘুমালো না টকার। তার সঙ্গে রয়েছে নটি আর রাফিয়ান। বিপদের গন্ধ পেলে সাবধান করে দেবে তাকে।

আটটা বাজলো, ন'টা। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো টকার, 'এই, জলদি এসো! একটা মোটর বোট!'

ছুটে এলো সবাই। দেখলো।

'হুঁ, ওরাই,' বললো কিশোর। 'গুড!'

'এসো দোস্তরা, এসো,' হাত নেড়ে ডাকলো মুসা। 'এসে দেখো, ধান-দুর্বা সাজিয়ে রেখেছি তোমাদের জন্যে।'

ষোল

হ্যাঁ, ডেনার আর ডজই। সঙ্গে আরেকজন লোক, মোটা, বেঁটে, নিশ্চয় লিংকার। পাহাড়ের চূড়ায় উপুড় হয়ে শুয়ে তাকিয়ে আছে ছেলেরা। চাঁদ উঠছে, ফিকে হয়ে আসছে অন্ধকার, ফলে দেখতে অসুবিধে হচ্ছে না ওদের।

'ভালো জায়গাতেই লুকিয়েছো দেখা যাচ্ছে,' কর্কশ কণ্ঠে বললো লিংকার, ওর গলাটা খসখসে। 'চট করে বের করে ফেলো। নিয়ে কেটে পড়ি।'

'আমি যাচ্ছি,' ডজের হাতে টর্চ। 'চাচা, ছেলেমেয়েগুলোকে কি করবো? দু'দিন অন্ধকারে থেকে, না খেয়ে, আমার মনে হয় কাবু হয়ে গেছে।'

'ওদেরকে?' গুরুত্বই দিলো না ডেনার। 'থাকুক। আমরা নিরাপদে বেরিয়ে যাই আগে। তারপর একটা ফোন করে দেবো মেয়েটার বাপের কাছে। আরও কিছুক্ষণ থাকুক, শিক্ষা হোক কিছুটা। অনেক উৎপাত করেছে।'

'উৎপাত তো কিছুই করিনি, উৎপাত দেখবে এখন,' মনে মনে বললো মুসা।

'এই শুরু হলো।' ছোট একটা পাথর তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারলো। নিখুঁত নিশানা। ডেনারের মাথায় গিয়ে পড়লো পাথরটা।

'উফ!' করে উঠে চাঁদিতে হাত রাখলো ডেনার। 'কি পড়লো?'

'ও কিছু না, ছোট পাথর,' বললো তার ভাতিজা। 'পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়েছে। খামোকা চিল্লাচ্ছো।'

কয়েক পা এগিয়েই দড়াম করে আছাড় খেলো সে। পাথরে বাড়ি লেগে চুরমার হয়ে গেল টর্চের কাচ।

'কি হলো?' চেঁচিয়ে বললো তার চাচা।

'কিসে যেন পা পড়লো। পিছলে গেল।'

'দেখে চলতে পারো না? কিসে পিছলালো?'

'কি জানি!'

কিসে পিছলেছে বলে দিতে ইচ্ছে হলো মুসার। কুকর্মটা সে-ই করেছে। পাথুরে পথের ওপর রান্নার তেল ঢেলে পিছলা করে দিয়েছে। তাতে পা পড়লেই দড়াম।

উঠে এগোলো আবার ডজ। পেছনে এলো তার চাচা। ওই জায়গাটাতে আসতেই ভাতিজার চেয়ে জোরে আছাড় খেলো। তাকে তুলতে এসে ডেনারের গায়ের ওপরই পড়লো লিংকার।

জোরে জোরে হাসলো ডজ। 'অন্যকে বলার বেলায় তো খুব···তোমরা দেখে চলতে পারো না?'

গালাগাল করতে করতে উঠে দাঁড়ালো দু'জনে। খাড়াই বেয়ে উঠে আসতে লাগলো আবার।

তেলের ওপর পা পড়ে আরেক জায়গায় আবার আছাড় খেলো ডজ। তার চাচাও। কিছু দূর এগিয়ে আবার।

হাসতে হাসতে দুর্গের ঘরে ফিরে এলো ছেলেরা।

চত্বরে পৌঁছলো তিন চোর।

'ওই যে, ওখানে,' সদ্য খোঁড়া গর্তের ধারে কাঠিটা দেখিয়ে বললো ডেনার 'ডজ, খোঁড়ো।'

খালি হাতেই ওপরের আলগা মাটি খুঁড়ে সরিয়ে ফেললো ডজ। 'এই যে,' বলতে বলতে টেনে তুললো একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ। ভেতর থেকে বের করলো ভারি বাক্সটা। লিংকারের দিকে বাড়িয়ে দিলো, 'এই যে, নিন।'

বাক্সটা মাটিতে রেখে বসে পড়লো লিংকার। ডালা তুলে চেঁচিয়ে উঠলো। সোনার মোহর আর অলঙ্কার কোথায়? এ তো মস্ত এক সী-গালের কঙ্কাল, আর

পাথর! রাগে গর্জে উঠলো, 'এই তোমাদের গুপ্তধন!'

টর্চের আলোয় বাক্সের জিনিসগুলোর দিকে বোবা হয়ে চেয়ে আছে ডেনার। ডজও হাঁ হয়ে গেছে।

ঠিক এই সময় লাফ দিয়ে ডেনারের কাঁধে নামলো ছোট একটা জীব। দোল খেয়ে বাহুতে নেমে ছোঁ মেরে টর্চটা কেড়ে নিয়েই দিলো দৌড়।

'কী ওটা?' চিৎকার করে বললো ডেনার। 'বানর না? এখানে বানর এলো কোত্থেকে…আরে ডজ, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? ধর না!'

বানরটার পেছনে দৌড় দিলো ডজ।

কিছুদূর এগিয়ে থেমে ফিরে তাকালো নটি। যেন ডজের কাছে আসার অপেক্ষা করছে। তারপর ঘুরে আবার ছুটলো। ডজকে টেনে নিয়ে চললো ভাঙা দুর্গের ধ্বংসস্তূপের দিকে। ঢুকে পড়লো একটা দরজা দিয়ে।

সোজা তার পেছনে ছুটে এলো ডজ। দরজায় পেতে রাখা ফাঁদ দেখতে পেলো না। আড়াআড়ি ভাবে একটা শক্ত দড়ি বেঁধে রাখা হয়েছে। তাতে পা বেধে উড়ে গিয়ে ধুড়ুস করে পড়লো। কাদায় পড়া মাছের মতো কঠিন মেঝেতে পিছলে গেল দেহটা। বিশাল এক পাথরে বাড়ি লাগলো মাথা। প্রচণ্ড আঘাতে সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারালো সে।

নিঃশব্দে তাকে তুলে নিয়ে একটা অন্ধকার কোণে সরে গেল ছেলেরা। দ্রুত হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখলো একটা দেয়ালের আড়ালে।

বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ডেনার আর লিংকার। অবাক হয়ে ভাবছে, ডজ এখনও আসছে না কেন? হঠাৎ ডজের বিকৃত জোরালো চিৎকার কানে এলো, 'চাচা, চাচা, মেরে ফেললো! বাঁচাও, চাচা!'

পাকা অভিনেতা কিশোরের কণ্ঠস্বর ধরতেই পারলো না ডেনার, ভাবলো, ডজই বুঝি চিৎকার করছে। লিংকারকে বললো, 'তুমি দাঁড়াও এখানে। আমি দেখি কি হয়েছে?'

দৌড়ে এলো ডেনার। ভাতিজার মতোই দড়িতে পা বেধে খেলো আছাড়। ভারি শরীর ময়দার বস্তার মতো পড়লো। একটা পা বেকায়দা ভাবে মুচড়ে গিয়ে পড়লো পেটের তলায়। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, 'গেছিরে, মরে গেছি! হায় হায় রে, আমার পা শেষ। এক্কেবারে ভেঙে গেছে!'

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে নীরব হাসিতে ফেটে পড়লো ছেলেমেয়েরা।

'দুটো বেকার,' ফিসফিসিয়ে বললো কিশোর। 'টকার, দাও নটিকে লেলিয়ে।'

বানরটাকে নির্দেশ দিয়ে ছেড়ে দিলো টকার।

'হুফ!' করে উঠলো রাফিয়ান। সে-ও কিছু করার অনুমতি চাইছে জিনার

কাছে।

'যা। যা ইচ্ছে কর গিয়ে,' খুশিমনে অনুমতি দিয়ে দিলো জিনা।

জিনার কথা শেষ হওয়ার আগেই ছুটলো রাফিয়ান।

ডেনারকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসছিলো লিংকার। দরজার কাছে পৌঁছার আগেই দেখলো, বিরাট এক জীব মস্ত একটা ছায়ার মতো ছুটে আসছে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে।

আর কি দাঁড়ায় চোরাই মালের ব্যবসায়ী? ভারি শরীর নিয়ে এমনভাবে ঘুরলো, যেন পালকের মতো হালকা। দিগগজ দৌড়-বিদদের সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ করে ছুটলো প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে। সামনে একটা গাছ দেখে চোখের পলকে তাতে চড়ে বসলো।

নিচে থেকে ঘেউ ঘেউ করতে লাগলো রাফিয়ান, লাফঝাঁপ দিতে লাগলো। লিংকারকে ধরতে না পারায় ভীষণ খেপে গেছে।

গাছে উঠে যখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো লিংকার, এলো আরেক বিপদ। ঝুপ করে তার কাঁধের ওপর লাফিয়ে পড়লো একটা বানর। চুল খামচে ধরে কামড় বসালো কানে।

'ওরে বাবারে, খেয়ে ফেললো রে!' বলে চেঁচিয়ে বানরটাকে সরাতে গিয়ে ডাল থেকে ছুটে গেল হাত। ওপর থেকে পড়লো আবার নিচে, একেবারে রাফিয়ানের মুখের কাছে। আচ্ছামতো কয়েকটা কামড় খেয়ে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে আবার উঠলো গিয়ে গাছে।

হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলো ছেলেমেয়েরা। বানরটাকে ডেকে নামালো টকার। গলার বেল্ট ধরে জোর করে টেনে রাফিয়ানকে সরালো জিনা।

'বোটে চলো সবাই,' আদেশ দিলো কিশোর। 'কুইক!'

ঢালু পথ বেয়ে দৌড় দিলো সবাই। টকারের কাঁধে নটি। মুসার কাঁধে গুপ্তধনের ব্যাগ। কোথায় তেল ফেলেছে, জানা আছে ওদের। ওগুলো এড়িয়ে গেল, আছাড় খেতে হলো না। এক এক করে লাফিয়ে উঠলো বোটে। গাছের দিকে ফিরে জোরে আরেকবার ঘেউ ঘেউ করে রাফিয়ানও উঠে পড়লো।

এঞ্জিন স্টার্ট দিলো মুসা। জিনা ধরলো হুইল। তিন মিনিট পর খোলা সাগরে বেরিয়ে এলো ওয়ালটারদের মোটর বোট। ছুটলো মূল ভূখণ্ডের দিকে।

দূর থেকেই গোবেল ভিলায় আলো দেখা গেল, স্টাডিরুমে।

'দুই প্রফেসর নিশ্চয় মাথার ঘাম বের করে ফেলছেন,' হেসে বললো মুসা। 'আমাদের এই অবস্থায় দেখলে কি যে...'

'জিনা,' বাধা দিয়ে বললো কিশোর। 'আগে শেরিফের ওখানে যাও।'

বোটের মুখ ঘুরিয়ে দিলো জিনা।

ছেলেমেয়েদের দেখে অবাক হলেন শেরিফ আর তাঁর ডেপুটি। সব কথা শুনলেন। গুপ্তধনগুলো রেখে দিলেন নিরাপদ জায়গায়।

'মনে হলো ডাক্তার ওয়ালটার এসেছেন,' বললেন শেরিফ। 'একটু আগে ওপথেই আসছিলাম। বাড়িতে আলো দেখলাম।'

শেরিফের অফিসে বসেই লিয়ারিকে টেলিফোন করলো কিশোর। মিসেস পারকারকে ফোন করে সংক্ষেপে সব কথা জানালো। শেরিফ ফোন করলেন ডাক্তার ওয়ালটারকে। তারপর নিজেদের লঞ্চ আর লোকজন নিয়ে দ্বীপে চললেন চোরগুলোকে ধরে আনার জন্যে। ছেলেমেয়েরাও চললো সঙ্গে।

তিন চোরকে নিয়ে ফিরে এসে ওরা দেখলো, শেরিফের অফিসে বসে আছেন ডাক্তার ওয়ালটার আর তাঁর মিসেস। ছেলেদের মুখে গুপ্তধনের গল্প শুনে তো অবাক।

ডজকে হাজতে ভরা হলো। মাথার একপাশ গোল আলুর মতো ফুলে আছে। ডেনার পায়ের ব্যথায় ককাচ্ছে। লিংকারের সারা গায়ে কামড় আর আঁচড়ের ক্ষত, রক্তাক্ত। দু'জনকে কড়া পাহারায় পুলিশ হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেন শেরিফ।

এই সময় এসে অফিসের সামনে থামলো আরেকটা গাড়ি। নামলেন মিসেস পারকার আর দুই বিজ্ঞানী।

অফিসে ঢুকেই জিনার দিকে চেয়ে ভুরু কুঁচকে বলে উঠলেন মিস্টার পারকার, 'তোমাদের জ্বালায় শান্তিতে কাজ করার জো নেই। কেন জড়ালে এসবে?'

'আহ্, তুমি থামো তো,' মৃদু ধমক দিলেন মিসেস পারকার। 'ঠিকই তো করেছে। চোখের সামনে অন্যায় ঘটতে দেখেও পালিয়ে আসবে নাকি?'

'কিন্তু মারাও যেতে পারতো,' বললেন প্রফেসর কারসওয়েল।

'যায়নি যখন আর বলে লাভ কি?' টকারকে কাছে টানলেন মিসেস পারকার। 'কেমন ছিলি? খুব কষ্ট হয়েছিলো?'

'আরে না, কি যে বলো, আন্টি,' মাথা নেড়ে বললো টকার। 'দারুণ মজা পেয়েছি। বাবা, তোমাকে আর জ্বালাবো না। গাড়ি হতে আর ভালো লাগে না এখন আমার। গোয়েন্দা হবো।'

'গোয়েন্দা হয়ে করবিটা কি শুনি?' বললেন কারসওয়েল। 'হলে বিজ্ঞানী হবি।...এই হ্যারি, চলো চলো, পরীক্ষাটা শেষ করে ফেলি। এরা ভালোই আছে।'

'চলো।'

অফিস থেকে বেরিয়ে গেলেন দুই বিজ্ঞানী।

লিয়ারিও এসে হাজির হলো। জানালো, ছেলেদের—বিশেষ করে মুসার—

জন্যে তৈরি হয়ে পড়ে আছে বিশাল এক ফ্রুট কেক।

পরদিন লাঞ্চে দাওয়াত করলেন সবাইকে মিসেস ওয়ালটার। লিয়ারি, পারকার দম্পতি, প্রফেসর কারসওয়েল, শেরিফ, আর ছেলেমেয়েদেরকে তো অবশ্যই।

দাওয়াতে গেল সবাই। চমৎকার খাওয়া-দাওয়া হলো। ছেলেমেয়েদের সবাইকে একটা করে সোনার মোহর উপহার দিলেন ওয়ালটার, স্যুভনির হিসেবে রেখে দেয়ার জন্যে। বাকি গুপ্তধনগুলো রাখবেন না, জানালেন। ডাকাতি করে এনেছিলো তাঁর পূর্বপুরুষ। ওসব লুটের মাল রাখতে চান না তিনি। দান করে দেবেন কোনো রিসার্চ সেন্টারে। মানুষের উপকারে লাগবে ওই গুপ্তধন বিক্রির টাকা।

ঃ শেষ ঃ
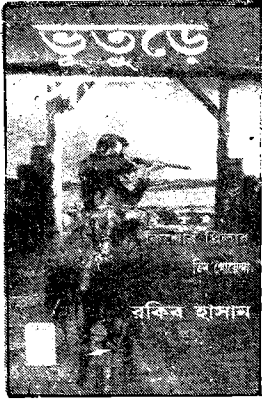
ভূতুড়ে সুড়ঙ্গ

প্রথম প্রকাশঃ অক্টোবর, ১৯৮৯

গোধূলি বেলায় উপত্যকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়লো অদ্ভুত গোঙানি!

'ওই,' ফিসফিস করে বললো মুসা আমান। 'শুরু হলো আবার!'

হারভে র‍্যাঞ্চের কাছে একটা উঁচু শৈলশিরার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে তিন গোয়েন্দা। কয়েক শো' ফুট দূরে প্রশান্ত মহাসাগরের তটরেখা।

আবার শোনা গেল গোঙানি। যেন কোনো দানবের দীর্ঘশ্বাস, লম্বিত, কাঁপা, ভয়াল।

ঠাণ্ডা শিহরণ বয়ে গেল মুসার শিরদাঁড়া বেয়ে। 'কাজে আসে না বলে দোষ দেয়া যায় না র‍্যাঞ্চের শ্রমিকদের।'

'হয়তো লাইটহাউস থেকে আসছে,' নিচু কণ্ঠে বললো রবিন। 'আসার পথে যেটা দেখে এলাম। ফগহর্ন।'

মাথা নাড়লো কিশোর। 'আমার তা মনে হয় না। ফগহর্নের শব্দ ওরকম নয়। তাছাড়া এখন কুয়াশা নেই, ফগহর্ন বাজাবে কেন?'

'তাহলে কি...,' বলতে গিয়ে থেমে গেল রবিন।

কিশোর তার জায়গায় নেই। উঠে শৈলশিরার ডান পাশ ধরে ছুটতে শুরু করেছে। তাকে অনুসরণ করলো দুই সহকারী গোয়েন্দা। পর্বতের ওধারে হারিয়ে গেছে সূর্য, আবছা বেগুনী আলো এখন উপত্যকায়।

পঞ্চাশ গজমতো এসে থেমে গেল গোয়েন্দাপ্রধান। আবার সেই গোঙানি। কানের পেছনে হাত রেখে ভালো করে শুনলো শব্দটা।

চোখ বড় বড় করে মুসা বললো, 'কিশোর, কি করবো?'

জবাব দিলো না কিশোর। হঠাৎ ঘুরে হাঁটতে শুরু করলো, উল্টোদিকে একশো গজ দূরে এসে থামলো।

'এই কাজই করবো নাকি খালি আমরা।' পাশে এসে বললো রবিন। 'পাহাড়ের ওপরে খালি হাঁটাচলা?' গোয়েন্দাপ্রধানের কাণ্ড দেখে মুসার মতোই সে-ও অবাক হয়েছে।

এবারও জবাব দিলো না কিশোর। কান পেতে শুনলো গোঙানির আওয়াজ। শব্দটা থেমে যাওয়ার পর ঘুরলো রবিনের দিকে। বললো, 'না, নথি, পরীক্ষাটা শেষ করলাম।'

'কিসের পরীক্ষা?' জিজ্ঞেস করলো মুসা। 'হাঁটলাম আর দৌড়ালাম তো শুধু, আর কি করলাম?'

'বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে শব্দটা শুনলাম,' ব্যাখ্যা করলো কিশোর। 'মনে মনে জ্যামিতি…মানে, কতগুলো কল্পিত রেখা এঁকেছি। শব্দটা কোত্থেকে আসে তার একটা ধারণা নেয়ার চেষ্টা করেছি। রেখা এঁকেছি মোট তিনটে। যেখানে সবগুলো এক জায়গায় ক্রস করেছে, শব্দটা সেখান থেকেই আসে।'

বুঝে ফেললো রবিন। 'ঠিক বলেছে ও, মুসা। একে বলে ট্রাই-অ্যাঙ্গুলেশন। এঞ্জিনিয়াররা হরদম এই পদ্ধতি কাজে লাগায়।'

'বুঝেছো তাহলে,' বললো কিশোর। 'নিখুঁত ভাবে করতে পারিনি। তবে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে।'

'কিসের উদ্দেশ্য?' কিশোরের সহজ ইংরেজিও এখন হীব্রু ভাষা বলে মনে হচ্ছে মুসার কাছে। 'কি বের করতে চাইছো?'

'শব্দটা কোথা থেকে আসে। পর্বতের ওই গুহা থেকে। হেনরি ফিগারোর গুহা।'

'এটা তো জানিই আমরা,' নিরাশ মনে হলো মুসাকে। 'মিস্টার হারভেই বলেছেন।'

মাথা নাড়লো আবার কিশোর। 'তাতে কি হয়েছে? ভালো গোয়েন্দা কক্ষণো অন্যের কথায় নির্ভর করে না। নিজে তদন্ত করে যাচাই করে দেখে। অন্যের চোখে দেখা আর নিজের চোখে দেখার মাঝে অনেক ফারাক।' গাল চুলকে নিলো। 'শিওর হলাম, শব্দটা হেনরি ফিগারোর গুহা থেকেই আসে। এখন জানতে হবে গোঙানিটা কিসের, আর…'

তাকে থামিয়ে দিলো সেই বিচিত্র আওয়াজ। ঘন ছায়া নামছে উপত্যকায়। গুড়ি মেরে যেন এগিয়ে আসছে অন্ধকারের দানব। শব্দটা শুনে এইবার গোয়েন্দা-প্রধানও কেঁপে উঠলো।

ঢোক গিললো মুসা। 'খাইছে, কিশোর! মিস্টার হারভে আর শেরিফ গুহাটা তন্নতন্ন করে খুঁজেছেন। কিছু পাননি।'

'হয়তো কোনো ধরনের জানোয়ার,' রবিন বললো।

'জানোয়ারের মতো কি লাগছে?' প্রশ্ন করলো কিশোর। 'আর, মিস্টার হারভে বা শেরিফ কোনো অস্বাভাবিক জন্তুর পায়ের ছাপও পাননি। ভালো করেই জানো,

ওঁরা দু'জনেই অভিজ্ঞ শিকারী, দক্ষ ট্র্যাকার।'

'অস্বাভাবিক জন্তু?' অস্বস্তি বোধ করছে মুসা।

'এমন কোনো জন্তু, যার নাম শুনেনি মানুষ।' মুসার দিকে তাকালো গোয়েন্দাপ্রধান, চোখে আলো ঝিলিক দিয়ে উঠলো। 'কে জানে, হেনরি ফিগারোও এসবের কারণ হতে পারে!'

আঁতকে উঠলো মুসা। 'আল্লাহরে! বলো কি, কিশোর? ভূত-টুত তো বিশ্বাস করি না আমরা, করি?'

'তুমি করো,' হাসলো কিশোর। 'কিন্তু ভূতের কথা বলছি না আমি।'

'তাই তো বললে। হেনরি ফিগারো মারা গেছে একশো বছর আগে,' প্রতিবাদ করলো রবিন। 'তার ভূত না হলে আর কি?'

জবাব দেয়ার সুযোগই পেলো না কিশোর। ঠিক ওই সময় উপত্যকা ছাড়িয়ে ওপাশের আকাশ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো লাল আলোয়। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে থরথর করে কেঁপে উঠলো যেন সমস্ত এলাকা।

'কী, কিশোর?' জিজ্ঞেস করলো রবিন।

মাথা নাড়লো কিশোর। 'জানি না।'

বিস্ফোরণের আওয়াজ পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলে মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে। একে অন্যের দিকে তাকালো তিন কিশোর।

নার্ভাস ভঙ্গিতে আঙুল মটকালো রবিন। 'বোধহয় নেভি! ওই যে যাদের নৌবহর দেখলাম। নিশ্চয় চ্যানেল আইল্যাণ্ডস-এ প্র্যাকটিস করছে।'

নিষ্প্রাণ হাসি হাসলো মুসা। 'ঠিকই বলেছো। বছরে দু'বার এখানে এসে প্র্যাকটিস করে ওরা। খবরের কাগজে পড়েছি। নির্জন দ্বীপগুলোয় আস্তানা গেড়ে গোলাগুলির মহড়া চালায়।'

'হ্যাঁ,' কিশোর বললো। 'কালকের পেপারেও ছিলো। নাইট ফায়ারিং প্র্যাকটিস। চলো, র‍্যাঞ্চে। এই উপত্যকার কথা আরও জানতে হবে।'

দ্বিতীয়বার বলতে হলো না রবিন আর মুসাকে। পেছনে, পাহাড়ের নিচে রেখে এসেছে সাইকেল, সেদিকে রওনা হলো।

হঠাৎ, উপত্যকার এক প্রান্ত থেকে শোনা গেল পাথর পড়ার ভারি শব্দ, সেই সাথে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ।

দুই

শব্দটা মিলিয়ে গেল গোঙানি উপত্যকার—মোনিং ভ্যালির বাংলা নাম রেখেছে

কিশোর—ওপর দিয়ে।

'ওটা তো গুহা থেকে আসেনি!' বলে উঠলো মুসা।

'না।' একমত হলো কিশোর। 'মানুষের চিৎকার!'

'বিপদে পড়েছে,' যোগ করলো রবিন। 'চলো তো দেখি।'

তটরেখা আর পর্বতের মাঝের উপত্যকা থেকে এসেছে শব্দটা। পর্বতের নাম ডেভিল মাউনটেইন, কারণ, দু'দিকের দুটো চূড়া দূর থেকে দেখায় কল্পিত শয়তানের শিঙের মতো।

দৌড় দিলো তিন গোয়েন্দা। ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ে অনেকগুলো পাথর জমা হয়েছে পাহাড়ের গোড়ায়, ধুলো উড়ছে এখনও।

'আআহ!' যন্ত্রণায় কাতরালো কেউ।

সবার আগে লোকটার পাশে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসলো মুসা। ধূসর চুল মানুষটার, কোমরের নিচের অংশ পাথরের তলায়। ব্যথায় মুখ বিকৃত। 'চুপ করে শুয়ে থাকুন,' বলে কিশোরের দিকে ফিরলো মুসা। 'মনে হচ্ছে পা-টা ভেঙেছে।'

লোকটার পরনে পুরনো কাউবয় পোশাক। দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করছে। কোনোমতে বললো, 'আ-আমি হারভে র‍্যাঞ্চে কাজ করি। মিস্টার হারভেকে গিয়ে বলো, কাউকে এখানে পাঠিয়ে দিতে। প্লীজ!'

হতবাক হয়ে পরস্পরের দিকে তাকালো তিন গোয়েন্দা। আরেকটা দুর্ঘটনা! আহত হলো মিস্টার হারভের আরেকজন শ্রমিক!

হারভে দম্পতির সঙ্গে দুই হপ্তার ছুটি কাটাতে র‍্যাঞ্চে এসেছিলো মুসা। র‍্যাঞ্চটার নতুন মালিক মিস্টার হারভে। বিখ্যাত একজন রোডিয়ো-রাইডার, মুসার বাবা মিস্টার রাফাত আমানের সঙ্গে অনেকগুলো ওয়েস্টার্ন ছবিতে কাজ করেছেন। জন্তুজানোয়ার, বিশেষ করে ঘোড়ার খেলা দেখাতেন। সেই কাজ ছেড়ে জমানো টাকা দিয়ে কিছুদিন আগে এই র‍্যাঞ্চ কিনে শেষ জীবনটা কাটাতে এসেছেন এখানে। নষ্ট হয়ে যাওয়া পুরনো র‍্যাঞ্চটার মেরামত সবে শেষ করে এনেছেন, এই সময় শুরু হলো গণ্ডগোল।

মোনিং ভ্যালির নামকরণ হয়েছে প্রাচীন ইণ্ডিয়ানদের একটা রোমাঞ্চকর লোককাহিনী আর পুরনো স্প্যানিশ ঔপনিবেশিকদের নিষ্ঠুরতার ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে। গুজব রটতে শুরু করেছে এখনঃ পঞ্চাশ বছর নীরব থাকার পর আবার জেগে উঠেছে মোনিং ভ্যালি, গোঙাতে আরম্ভ করেছে। র‍্যাঞ্চ শ্রমিকদের তাড়ানোর জন্যে যেন গোঙানিই যথেষ্ট নয়, তাই ঘটতে শুরু করেছে দুর্ঘটনা।

প্রথম দুর্ঘটনাটা ঘটে কিছু দিন আগে। দু'জন শ্রমিক ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলো

মোনিং ভ্যালির কাছ দিয়ে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। হঠাৎ এক অদ্ভুত গোঙানি শুনে চমকে উঠলো তাদের ঘোড়া, ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠে দিলো দৌড়। এর জন্যে তৈরি ছিলো না লোক দু'জন। ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেল। একজনের হাত ভাঙলো, আরেকজনের হাড়গোড় ঠিক থাকলেও শরীরের নানা জায়গা ছিলেছুলে গেল। দু'জনেই র‍্যাঞ্চে ফিরে এলো। জানালো, ভূতের উপদ্রব শুরু হয়েছে উপত্যকায়। তার কয়েকদিন পরে, কোনো কারণ ছাড়াই রাত দুপুরে উন্মাদ হয়ে গেল যেন র‍্যাঞ্চের গরুর পাল। নানারকম অঘটন ঘটিয়ে ছাড়লো। তারপর এক সন্ধ্যায় উপত্যকার ওদিকে বেড়াতে গিয়ে নাকি বিরাট এক দানব দেখে এলো আরেক শ্রমিক। কসম খেয়ে বললো, ডেভিল মাউনটেইনের গোড়ায় হেনরি ফিগারোর গুহা থেকে বেরিয়েছে দানবটা। তার দিন কয়েক পরে, কাউকে কিছু না জানিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল দু'জন শ্রমিক। খোঁজ নিয়ে এসে শেরিফ জানালেন, তাদেরকে সানতা কারলায় দেখা গেছে, কিন্তু অনেক শ্রমিকই বিশ্বাস করলো না তাঁর কথা।

দিন কয়েক র‍্যাঞ্চে থেকেই মুসা বুঝে গেল, ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছেন হারভে দম্পতি। ফিগারোর গুহায় অনেক খোঁজাখুঁজি করা হয়েছে, রহস্যময় কিছুই পাওয়া যায়নি, রহস্যেরও সমাধান হয়নি। ইণ্ডিয়ান লোককাহিনী আর ভূতের পেছনে তাড়া করার উপায় নেই, কাজেই কোনো সাহায্য করতে পারলেন না শেরিফ। তিনি, এবং হারভে দু'জনেই বিশ্বাস করেন, ভূত-ফুত সব বাজে কথা, নিশ্চয় কোনো সহজ ব্যাখ্যা আছে এসবের। কিন্তু বুঝতে পারছেন না, সেটা কী।

কিশোরকে ছাড়া হবে না, বুঝে, হারভে দম্পতির অনুমতি নিয়ে তাকে আর রবিনকে আসার জন্যে খবর পাঠালো মুসা। বাড়িতে জরুরি কাজ ফেলে ছুটে এসেছে দু'জনে। এরকম একটা রহস্যের কথা শোনার পর কি আর স্বস্তিতে কাজ করা যায়? অন্তত কিশোর পাশার পক্ষে সম্ভব নয়। আর মুসা নেই, কিশোর থাকবে না, একলা কি আর মন টেকে রবিনের? গোল্লায় যাক 'জরুরি কাজ', বলে সোজা রওনা হয়ে পড়লো দু'জনে।

ক্যালিফোরনিয়া উপকূলে রকি বীচ থেকে একশো মাইল উত্তরে, আর আধুনিক হলিডে রিসোর্ট সানতা কারলার মাইল দশেক দূরে এই হারভে র‍্যাঞ্চ। পার্বত্য অঞ্চল। বড় বড় পাহাড়-পর্বত, গুহা, গভীর গিরিখাত, অসংখ্য উপত্যকা আর একধারে প্রশান্ত মহাসাগর এখানে। মুসা এসেছিলো ছুটিয়ে ঘোড়ায় চড়তে, সাঁতার কাটতে আর মাছ ধরতে। কোনোটাই করা হলো না। জড়িয়ে পড়লো জটিল রহস্যে, দুই দোস্তকেও ডেকে আনলো।

'ভূতের আসর হয়েছে এই উপত্যকায়,' বিড়বিড় করলো আহত লোকটা।

'আসাই উচিত হয়নি···ওই গোঙানি, গোঙানিই যতো নষ্টের মূল!'

'না,' দৃঢ় কণ্ঠে বললো কিশোর। 'নেভির ফায়ারিঙের শব্দে কেঁপে উঠে ওই পাথরের ধস নেমেছে।'

'আমি বলছি সেই গোঙানি!'

'ওসব কথা পরে হবে,' বললো মুসা। 'কিশোর, আগে···'

তার কথা শেষ হলো না। কাছেই ডেকে উঠলো ঘোড়া। ফিরে চেয়ে দেখলো ছেলেরা, তিনজন ঘোড়সওয়ার এগিয়ে আসছে। তাদের একজন রাশ ধরে টেনে আনছে চতুর্থ আরেকটা ঘোড়াকে—পিঠে আরোহী নেই; যে লোকটা পড়ে ব্যথা পেয়েছে বোধহয় তারই ঘোড়া। দলের আগে আগে রয়েছেন মিস্টার হারভে।

'তোমরা এখানে?' কাছে এসে ঘোড়া থেকে নামতে নামতে জিজ্ঞেস করলেন তিনি। লম্বা, ইস্পাতকঠিন দেহ, গায়ে উজ্জ্বল লাল শার্ট, পরনে রঙচটা নীল জিনসের প্যান্ট, পায়ে হাই-হীল কাউবয় বুট। রোদেপোড়া তামাটে চামড়া। চেহারায় উৎকণ্ঠার ছাপ।

আহত লোকটাকে কিভাবে পেয়েছে জানালো ছেলেরা।

'বেশি ব্যথা পেয়েছো, পোরটিকো?' লোকটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসলেন মিস্টার হারভে।

'হাড্ডি ভেঙে গেছে!' বললো পোরটিকো। 'সব ওই ভূতের কারবার···গুহার ভূত! আমি আর এখানে থাকছি না!'

'আমার ধারণা,' কিশোর বললো। 'ফায়ারিঙের শব্দে ধস নেমেছে।'

'সেটা সম্ভব,' মাথা দোলালেন মিস্টার হারভে।

আহত লোকটার গায়ের ওপর থেকে পাথর সরিয়ে ফেলা হলো। দু'জন লোক গিয়ে র‍্যাঞ্চের ট্রাক নিয়ে এলো। সাবধানে তাতে তোলা হলো পোরটিকোকে। তারপর রওনা হলো সানতা কারলায়, হাসপাতালে।

তিন গোয়েন্দা ফিরে চললো তাদের সাইকেলের কাছে।

র‍্যাঞ্চ হাউসে পৌঁছতে পৌঁছতে পুরোপুরি আঁধার হয়ে গেল। মোট পাঁচটা বাড়িঃ শ্রমিকদের থাকার জন্যে একটা বাংকহাউস, একটা বড় গোলাঘর, একটা ছোট গোলাঘর, একটা রান্নাঘর, আরেকটা মূল বাড়ি। ওই বাড়িটা দোতলা। কাঠের বড় বড় বীম রয়েছে, অ্যাডোব আছে, আর বাড়ি ঘিরে রয়েছে চওড়া, ছাউনিওয়ালা বারান্দা। দিনের বেলায়ও সেখানে ছায়া থাকে, ঠাণ্ডা থাকে। জানালার যেখানেই সুযোগ পেয়েছে লতিয়ে উঠেছে আঙুর লতা। বাড়ির চারপাশে রক্তলাল বোগানভিলিয়ার ছড়াছড়ি। পাঁচটা বাড়ির চারপাশে তৈরি হয়েছে বেড়া দেয়া কয়েকটা কোরাল।

রান্নাঘরের কাছে লোকের ছোট ছোট জটলা। দুর্ঘটনার কথা আলোচনা করছে। নিচু কণ্ঠ, চেহারায় ভয় আর রাগের মিলিত ছাপ।

মূল বাড়িতে ঢুকতে যাবে, অন্ধকার থেকে শোনা গেল ভারি, খসখসে একটা কণ্ঠ।

'কোথায় ছিলে তোমরা?' জানতে চাইছে র‍্যাঞ্চের ফোরম্যান ডেভিড কোহেন।

বারান্দায় মৃদু নড়াচড়া। আলোয় বেরিয়ে এলো কোহেন। দেহের তুলনায় মুখটা ছোট, খাড়া নাক, রোদে পোড়া চামড়া। 'গেছিলে কোথায়?' আবার জিজ্ঞেস করলো সে। 'জায়গা ভালো না। হারিয়ে যেতে যদি?'

'পাহাড়-পর্বত অনেক দেখা আছে আমাদের, মিস্টার কোহেন,' জবাব দিলো কিশোর। 'ভাববেন না।'

আরেক কদম এগোলো ফোরম্যান। 'তোমরা কি করতে গিয়েছো, শুনলাম। গোঙায় কিসে, জানতে। দেখো, জায়গাটা ভালো না। বাচ্চাদের জন্যে আরও খারাপ। ওই গুহার ধারেকাছে যাবে না।'

ছেলেরা কিছু বলার আগেই বাড়ির একটা দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে এলেন ছোটখাটো একজন মহিলা। ধূসর চুল। রোদে পুড়ে তামাটে হয়েছে এককালের লালচে চামড়া। গালের গোলাপি আভাও আর নেই এখন, হাত-পায়ের মতোই তামাটে। 'কি আজেবাজে বকছো, ডেভিড?' ধমক দিয়ে বললেন মিসেস হারভে। 'ওরা বাচ্চা নয়। আমার বিশ্বাস, অনেকের চেয়ে বুদ্ধিশুদ্ধিও বেশিই রাখে।'

'মোনিং ভ্যালি ভালো জায়গা নয়,' মিনমিন করে বললো কোহেন।

'তুমিই তো বাচ্চা ছেলের মতো কথা বলছো। ভূতের ভয়ে কাবু। গুহাটাকে ভয় পাও!'

'ভয় পাই না আমি!' আরেক দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো কোহেন। 'তবে সত্যকে "কিছু না" বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না। সারা জীবন এখানে কাটালাম, জানেনই। সেই ছোট বেলা থেকে শুনে আসছি মোনিং ভ্যালির গল্প। তখন বিশ্বাস করতাম না, এখন করি।'

'যত্তোসব ফালতু কথা! কুসংস্কার!' বললেন বটে মিসেস, কিন্তু গলায় জোর নেই। বোঝা যাচ্ছে, তিনিও শিওর নন। কণ্ঠের উৎকণ্ঠা ঢাকতে পারলেন না।

কিশোর জিজ্ঞেস করলো, 'মিস্টার কোহেন, গোঙানির কারণটা বলতে পারবেন?'

দ্বিধা করলো ফোরম্যান। 'না। কেউ জানে না। আমিও অনেক খুঁজেছি, কিছু পাইনি। মানে, দেখিনি!' শেষ শব্দটার ওপর বিশেষ জোর দিলো সে। আবছা

অন্ধকারে চকচক করে উঠলো তার চোখ। 'ইণ্ডিয়ানরা বলে··কেউ নাকি দেখতে পায় না। ভূ···,' শুধরে নিয়ে বললো। 'বুড়ো মানুষটাকে!'

তিন

'ডেভিড!' চেঁচিয়ে উঠলেন মিসেস হারভে।

পরোয়া করলো না কোহেন। 'আমি ওই গল্প বিশ্বাস করি না। কিন্তু আজব ঘটনা তো ঘটছে গুহায়। অস্বীকার করতে পারেন? আবার গোঙাতে শুরু করেছে গুহাটা, কেউ জানে না, কেন। কেউ কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারছে না। বুড়ো মানুষটা না হলে আর কে?'

বলে আর দাঁড়ালো না ফোরম্যান। বারান্দা থেকে নেমে সোজা বাংকহাউসের দিকে হাঁটা দিলো।

সেদিকে তাকিয়ে রইলেন মিসেস হারভে। 'সবার মনেই ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে! ডেভিডের মতো সাহসী লোক আমি কমই দেখেছি, তারই যখন এই অবস্থা···ওরকম করে কখনও কথা বলেনি।'

'আমাদেরকে বুড়ো মানুষটার কথা শোনালো কেন?' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো কিশোর।

জোর করে উৎকণ্ঠা ঝেড়ে ফেলে হাসলেন মিসেস হারভে। 'বোধহয় ও টায়ারড। সারাদিন এতো বেশি পরিশ্রম করতে হয়···তো, তোমাদের খিদে পায়নি? দুধ আর বিস্কুট চলবে?'

'নিশ্চয়ই,' তাড়াতাড়ি বলে উঠলো মুসা।

আরামদায়ক লিভিংরুমে বসে খাচ্ছে ছেলেরা। সুদৃশ্য ইনডিয়ান কার্পেটে ঢাকা মেঝে, পুরনো আমলের আসবাবপত্র। মস্ত এক ফায়ারপ্লেস এক দিকের দেয়ালের প্রায় সবটা জুড়ে রয়েছে। দেয়ালে দেয়ালে শোভা পাচ্ছে শিকার করা হরিণ, ভালুক আর পার্বত্য সিংহের মাথা।

'ওই বুড়ো মানুষটা কে?' মিসেস হারভেকে জিজ্ঞেস করলো কিশোর। আরেকটা বিস্কুট তুলে নিলো।

'ও কিছু না। ইনডিয়ানদের উপকথা। অনেক আগে স্প্যানিশরা যখন এলো, তখনকার ইনডিয়ানদের মাঝে একটা গল্প চালু ছিলো। ডেভিল মাউনটেইনের গভীরে একটা খাঁড়িতে নাকি কালো, চকচকে একটা দানব থাকে।'

চোখ মিটমিট করলো মুসা। 'কোহেন যে বললো কেউ দেখেনি? দেখেই যদি না থাকবে, জানলো কি করে কালো আর চকচকে! আর দানবকে মানুষই বা বলা

কেন?'

'তাহলেই বোঝো,' হাসলেন মিসেস হারভে। 'কোনো যুক্তি নেই। গল্প গল্পই।'

'দানবকে মানুষ বলে বোধহয় শ্রদ্ধা করে,' কিশোর বললো। 'বাংলাদেশে সুন্দরবনের বাঘকে স্থানীয় লোকেরা সম্মান করে বলে বড় মিয়া। ভয়ে। তাদের বিশ্বাস, ওরকম করে ডাকলে বাঘ তাদের কিছু বলবে না। ওসব কুসংস্কার। যারা বলে তাদের কেউ কি বাঘের পেটে যায় না?'

আগের কথার খেই ধরে রবিন জিজ্ঞেস করলো, 'স্প্যানিয়ার্ডরা কি বলতো?'

'অনেক আগের কথা তো,' বললেন মিসেস হারভে। 'তখনকার স্প্যানিয়ার্ডরাও ওই ইনডিয়ানদের চেয়ে কিছু কম ছিলো না, কুসংস্কার ছিলো ওদের মাঝেও। মুখে বলতো বিশ্বাস করে না, কিন্তু উপত্যকার ধারেকাছেও যেতো না। হেনরি ফিগারো অবশ্য ওসব পরোয়া করতো না। সে গুহার ভেতরেও ঢুকতো।'

'হেনরি ফিগারোর সম্পর্কে কিছু বলতে পারবেন?' অনুরোধ করলো কিশোর।

এই সময় ঘরে ঢুকলেন মিস্টার হারভে। সঙ্গে বেঁটে, রোগাটে একজন লোক। চোখে ভারি পাওয়ারের চশমা। ছেলেরা আগেই পরিচিত হয়েছে তাঁর সঙ্গে। প্রফেসর হারকসন। তিনিও এই র‍্যাঞ্চে মেহমান।

'এই যে, ছেলেরা,' বললেন প্রফেসর। 'শুনলাম রহস্যময় মোনিং ভ্যালিতে গিয়েছিলে।'

'রহস্য না কচু!' মুখ বাঁকালেন মিস্টার হারভে। 'অতি সাধারণ ঘটনাগুলোকে বাড়িয়ে দেখছে সবাই। কোনো র‍্যাঞ্চে কি দুর্ঘটনা ঘটে না, ওরকম হাত-পা ভাঙে না?'

'কথাটা তুমি ঠিকই বলেছো,' প্রফেসর বললেন। 'আসলে, অশিক্ষিত তো ওরা। ভাবছে, না জানি কি! ভয় পেয়ে গেছে।'

'কারণটা জানলেই ওদের এই ভয় ভেঙে যেতো। আজকের ঘটনায় আরও লোক হারাবো, চলে যাবে। কোনো কিছুর লোভ দেখিয়েই ধরে রাখতে পারবো না। ছেলেগুলোও বুঝতে পারছে, ভূতের কাণ্ড নয়। নেভির গানফায়ারিঙের জন্যেই ধস নেমেছে। অথচ বোকা গাধাগুলোকে বোঝানো যাচ্ছে না। আমি শিওর, সহজ কোনো ব্যাখ্যা আছে ওই গোঙানির।'

'সেটা কি?' প্রশ্ন করলেন মিসেস হারভে।

নাক টানলেন মিস্টার হারভে। 'পুরনো সুড়ঙ্গগুলোর ভেতর দিয়ে জোরে বাতাস বয়ে যাওয়ার সময় ওরকম শব্দ হয়।'

হাতের বিস্কুটটা খেয়ে শেষ করলো কিশোর। 'আপনি আর শেরিফ নাকি

ঢুকেছিলেন গুহায়? ভালোমতো দেখেছিলেন?'

'এমাথা-ওমাথা কিছুই বাকি রাখিনি। ভূমিকম্পে ধস নেমে কিছু কিছু সুড়ঙ্গ বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু যেগুলোতে ঢোকা যায়, সব ক'টাতে ঢুকেছি।'

'নতুন কোনো অদল-বদল চোখে পড়েছে?'

'অদল-বদল?' ভ্রূকুটি করলেন মিস্টার হারভে। 'না তো। কি বোঝাতে চাইছো?'

'গোঙানি শুরু হয়েছে মাত্র এক মাস আগে থেকে। পঞ্চাশ বছর পর। বাতাসের কারণেই যদি হয়ে থাকবে, এতোদিন বন্ধ থাকলো কেন? হতে পারে, সুড়ঙ্গের ভেতরে কিছু একটা বদলে দেয়া হয়েছে, যার ফলে আবার শুরু হয়েছে শব্দ।'

'ভালো বলেছো তো!' নাকের ডগায় নেমে আসা চশমাটা ঠেলে পেছনে সরালেন প্রফেসর। 'চমৎকার যুক্তি! রক, বুদ্ধি আছে ছেলেগুলোর। মনে হচ্ছে এ-রহস্যের সমাধান করেই ফেলবে।'

'একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন, আওয়াজটা সন্ধ্যায় হয় কিংবা রাতে হয়, দিনের বেলা হয় না। কেন? তারমানে শুধু বাতাস নয়, আরও কোনো ব্যাপার আছে। আরেকটা ব্যাপার, গত এক মাসে রাতে যতো দিন ঝড়ো বাতাস বয়েছে, রোজই কি ওই শব্দ শোনা গেছে?'

'না, যায়নি,' আগ্রহী হয়ে উঠছেন মিস্টার হারভে। 'ঠিকই বলেছো। শুধু বাতাসের কারণে হলে, বাতাস বইলেই ওই শব্দ হতো। তা যখন হয় না, আরও কোনো কারণ নিশ্চয় আছে।'

হেসে বললেন প্রফেসর, 'কি জানি, হয়তো হেনরি ফিগারোই এর জন্যে দায়ী। রাতে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরতে বেরোয়।'

ঢোক গিললো মুসা। 'আপনিও বলছেন, স্যার? কিশোরও একথা বলেছে।'

'ভূত বিশ্বাস করো নাকি তুমি, ইয়াং ম্যান?' কিশোরকে জিজ্ঞেস করলেন প্রফেসর।

'না,' মাথা নাড়লো কিশোর।

'আমিও না,' বললেন প্রফেসর। 'অনেকের ধারণা, বিশেষ করে এখানকার স্প্যানিশদের, দরকারের সময় নিশ্চয় বেরিয়ে আসবে হেনরি ফিগারো। অনেক রিসার্চ করেছি আমি। জোর গলায় বলতে পারবো না যে সে বেরোবে না।'

'রিসার্চ?'

'উনি ইতিহাসের প্রফেসর,' বুঝিয়ে বললেন মিসেস হারভে। 'সানতা কারলায় বছরখানেক যাবত আছেন ক্যালিফোর্নিয়ার ইতিহাস নিয়ে স্পেশাল রিসার্চ

করছেন।' স্বামীকে দেখিয়ে বললেন, 'ওর ধারণা, মোনিং ভ্যালির রহস্য ভেদ করতে পারবেন প্রফেসর।'

'যদিও এখনও কিছুই করতে পারিনি,' স্বীকার করলেন প্রফেসর। 'হেনরি ফিগারোর কথা শুনতে চাও? ওর চমকপ্রদ জীবন নিয়ে একটা বই লিখছি আমি।'

'শোনালে তো খুবই ভালো হয়, স্যার!' সামনে ঝুঁকে বসলো রবিন।

'আমিও শুনতে চাই,' কিশোর বললো।

চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে বসলেন প্রফেসর। শোনালেন হেনরি ফিগারোর বিখ্যাত অ্যাডভেঞ্চারের রোমাঞ্চকর কাহিনীঃ

ক্যালিফোর্নিয়ার শুরুতে আজকের এই হারভে র‍্যাঞ্চছিলো র‍্যাঞ্চো ফিগারোর একটা অংশ। স্প্যানিশ সেটলাররা তখন সবে আসতে শুরু করেছে এই অঞ্চলে। সবার আগে এসেছিলো ফিগারো পরিবার, স্পেনের রাজার কাছ থেকে জমির দখল-সত্ত্ব নিয়ে। বিশাল এলাকা জুড়ে বসেছিলো তারা। আমেরিকার পূর্বাঞ্চলে তখন ইংরেজদের ভিড়, দলে দলে এসে উপনিবেশ গড়ছে। ক্যালিফোর্নিয়ায় স্প্যানিশরা তেমন করে দল বেঁধে আসেনি, আসতো একজন, দু'জন করে। ফলে কয়েক পুরুষ ধরে র‍্যাঞ্চো ফিগারোর সীমানার কোনো রদবদল হলো না।

তারপর হঠাৎ করেই পুব থেকে সেটলাররা দলে দলে আসতে শুরু করলো ক্যালিফোর্নিয়ায়। আস্তে আস্তে হাতছাড়া হতে লাগলো ফিগারোদের জমি, জবর-দখল হয়ে যেতে লাগলো। মেকসিকো যুদ্ধের পর ক্যালিফোর্নিয়া যোগ হয়ে গেল যুক্তরাজ্যের সঙ্গে। তখন আরও বেশি আমেরিকান সেটলার চলে এলো এই এলাকায়, বিশেষ করে ১৮৪৯ সালের ঐতিহাসিক গোল্ড রাশ-এর পর। ১৯০০ সাল নাগাদ ফিগারোদের প্রায় সমস্ত জমিই হাতছাড়া হয়ে গেল, শুধু ছোট একটা অংশ বাদে, তার মধ্যে পড়লো হারভে র‍্যাঞ্চ আর ওই অভিশপ্ত মোনিং ভ্যালি।

ফিগারোদের শেষ বংশধরের নাম হেনরি ফিগারো। দুর্ধর্ষ, দুঃসাহসী, বেপরোয়া এক তরুণ, আমেরিকানদের দু'চোখে দেখতে পারতো না। তাদেরকে চোর-ডাকাত মনে করতো। ফিগারোদের টাকার গরমও আর নেই তখন, ক্ষমতাও শেষ। প্রতিশোধের আগুন সব সময় দাউদাউ করে জ্বলতো তরুণ হেনরির মনে। ভাবতো, যে করেই হোক আবার তার পূর্বপুরুষদের সম্পত্তি নিজের দখলে আনবে। বেশ কিছু পুরনো স্প্যানিশ আর মেকসিকান পরিবার তখনও ছিলো ক্যালিফোর্নিয়ায়, তাদেরকে দলে টানার চেষ্টা করলো সে। আমেরিকানদের বিরোধিতা করে হয়ে গেল আউট-ল, পর্বতের গভীরে ঘাঁটি করলো। স্প্যানিশদের কাছে হয়ে গেল এক নতুন রবিন হুড, আর আমেরিকানদের কাছে ডাকাত।

তাকে ধরার জন্যে অনেক চেষ্টা করলো আমেরিকানরা, পারলো না। এই

অঞ্চলের পাহাড়-পর্বত সব চেনা হেনরির, কোথায় কখন লুকিয়ে থাকে বুঝতেই পারলো না কেউ। তার বিরুদ্ধে অভিযোগঃ করের টাকা চুরি, ট্যাক্স কালেকটরদের ভয় দেখিয়ে মেরে-পিটে তাড়িয়ে দেয়া, আমেরিকান সরকারের বিভিন্ন অফিসে চড়াও হয়ে তাদের টাকা লুটপাট, স্প্যানিশ-ভাষী ক্যালিফোর্নিয়ানদের সাহায্য করা আর আমেরিকানদের আতঙ্কিত করে রাখা।

তবে, বছর দুই পরে ১৯০৮ সালে সানতা কারলার শেরিফের হাতে ধরা পড়ে গেল সে। বেঁধে নিয়ে যাওয়া হলো তাকে আদালতে। বিচারে ফাঁসীর আদেশ হলো তার। স্প্যানিশ-ভাষীরা বলে বিচারের নামে প্রহসন হয়েছে। যা-ই হোক, ফাঁসীর দুই দিন আগে কয়েকজন বন্ধুর সহায়তায় দিনের আলোয় সবার চোখের সামনে দিয়ে পালিয়ে গেল হেনরি। আদালতের ছাতে উঠে, লাফিয়ে পাশের আরেকটা ছাতে গিয়ে পড়লো। সেখান থেকে লাফ দিয়ে নামলো তার বিখ্যাত কালো ঘোড়ার পিঠে—ঘোড়াটাকে তার জন্যেই দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিলো সেখানে।

পালানোর সময় গুলিতে আহত হলো হেনরি। পেছনে তাড়া করে এলো শেরিফ আর তার দলবল। সোজা পর্বতের দিকে ছুটলো হেনরি, মোর্নিং ভ্যালিতে গিয়ে ঢুকে পড়লো একটা গুহায়। শেরিফের জানামতে যতোগুলো সুড়ঙ্গমুখ ছিলো, ওই গুহা থেকে বেরোনোর, সব বন্ধ করে দেয়া হলো। ভেতরে ঢুকলো না কেউ, কিংবা ঢোকার সাহস করলো না। বাইরে পাহারায় রইলো। শেরিফ মনে করলো, হেনরি আহত, ক্ষতের যন্ত্রণা তো আছেই, তার ওপর ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাহিল হয়ে এক সময় না এক সময় নিশ্চয় বেরিয়ে আসবে।

দিনের পর দিন বসে রইলো ওরা, হেনরি বেরোলো না। সারাক্ষণ গুহার ভেতর থেকে একটা অদ্ভুত গোঙানি কানে এসেছে ওদের। অবশেষে তার লোকদের গুহায় ঢোকার আদেশ দিলো শেরিফ। নিজেও ঢুকলো। গুহা আর যতোগুলো সুড়ঙ্গ চোখে পড়লো সবগুলোতে খুঁজলো, চার দিন ধরে, হেনরিকে পেলো না। বেরিয়ে এসে আশপাশের এলাকায় তন্নতন্ন করে খুঁজলো। কিন্তু কিছুই পেলো না। না জীবন্ত হেনরি, না তার লাশ, না তার কাপড়-চোপড়। ঘোড়া, পিস্তল, টাকা, কিচ্ছু পেলো না।

এরপর আর কেউ দেখেনি হেনরিকে। কেউ কেউ বলে, তাকে পালাতে সাহায্য করেছিলো তার প্রেমিকা নোরিটা। গোপন সুড়ঙ্গ পথে গুহায় ঢুকে বের করে নিয়ে এসেছিলো আহত মানুষটাকে। দু'জনেই পালিয়ে চলে গেছে দক্ষিণ আমেরিকায়। আবার কেউ বলে, তার স্প্যানিশ-ভাষী বন্ধুরা তাকে বের করে এনে বছরের পর বছর ধরে তাদের র‍্যাঞ্চে লুকিয়ে রেখেছিলো, আজ এখানে কাল ওখানে করে করে।

তবে বেশির ভাগেরই ধারণা, গুহা থেকে বেরোয়নি হেনরি। এমন জায়গায় লুকিয়েছিলো, আমেরিকানরা খুঁজেই পায়নি। তারপর থেকে অনেক বছর পর্যন্ত, ওই এলাকায় কোনো চুরি-ডাকাতি বা খুনখারাপী হলে আর আসামী ধরা না পড়লে সব দোষ চাপিয়ে দেয়া হতো হেনরির ঘাড়ে। অন্ধকার রাতে নাকি তার কালো ঘোড়ায় চড়ে ঘুরতে বেরোয় সে। যে গুহাটায় থাকতো, সব সময় সেটার ভেতর থেকে শোনা যেতো বিচিত্র গোঙানির আওয়াজ।

'তারপর,' উপসংহার টানলেন প্রফেসর। 'হঠাৎ একদিন বন্ধ হয়ে গেল গোঙানি। স্প্যানিশ-ভাষীরা বলে, এখনও নাকি ওই গুহার ভেতরেই রয়েছে হেনরি ফিগারো। তাদের বিশেষ প্রয়োজনের সময় নিশ্চয় বেরিয়ে আসবে।'

'খাইছে!' বলে উঠলো মুসা। 'এখনও আছে!'

'কি করে থাকে?' রবিনের জিজ্ঞাসা।

'দেখো,' বললেন প্রফেসর। 'অনেক রিসার্চ করেছি আমি, অনেক খোঁজখবর করেছি হেনরি ফিগারোর। অনেক কিছু জেনেছি। তার মধ্যে ভুল তথ্যও অনেক আছে। এই যেমন ধরো, ওর যতো পুরনো ছবি আছে, সবগুলোতে দেখা যায় পিস্তলের খাপ কোমরের ডান দিকে ঝোলানো, অথচ আমি শিওর সে বাঁইয়া।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝোঁকালো কিশোর। 'কিংবদন্তীতে অনেক সময়ই ভুল তথ্য থাকে। বিশেষ করে এধরনের বিখ্যাত মানুষদের সম্পর্কে।'

'ঠিক বলেছো,' তর্জনী নাচালেন প্রফেসর। 'অফিশিয়াল রেকর্ড বলে, পালানোর দিনই রাতে গুহার ভেতরে মারা গিয়েছে হেনরি। ভালোমতো খুঁটিয়ে পড়েছি আমি সমস্ত রেকর্ড, গবেষণা করেছি। পরিষ্কার বুঝেছি গুলির আঘাত মারাত্মক ছিলো না। তখন তার বয়েস ছিলো আঠারো বছর। কাজেই, এখনও তার বেঁচে থাকাটা অসম্ভব কিছু নয়!'

চার

'কি বাজে বকছো!' প্রায় ফেটে পড়লেন মিস্টার হারভে। 'তারমানে একশোর কাছাকাছি তার বয়েস। ওরকম বয়সের একজন লোক ওভাবে ঘোড়ায় চড়ে বেড়ায় কি করে?'

'পারে, পারে,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন প্রফেসর। 'শুনলে অবাক হবে, রাশিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলে, ককেস্যাস পর্বতমালার উপজাতীয় লোকেরা একশো বছর বয়েসেও ঘোড়ায় চড়ে, লড়াই করে।'

'তা ঠিক, স্যার,' বললো কিশোর।

'কিংবা এমনও হতে পারে,' বললেন প্রফেসর। 'হেনরির কোনো বংশধর আছে। ছেলে, কিংবা নাতি। হেনরির ইচ্ছা পূরণ করতে এসেছে।'

কিছুটা বিমনা মনে হলো মিস্টার হারভেকে। 'হ্যাঁ, তা হতে পারে। আমাদের আগে যারা ছিলো, তারা মোনিং ভ্যালির কাছে যেতো না। কিন্তু আমি ঠিক করেছি ওখানে একটা কোরাল বানাবো। হয়তো হেনরির ছেলে বা নাতি চায় না গুহার ঐতিহ্য নষ্ট হোক।'

'হ্যাঁ, এটাই জবাব!' চেঁচিয়ে উঠলেন মিসেস হারভে। 'রক, মনে আছে, র‍্যাঞ্চের পুরনো কয়েকজন মেকসিকান শ্রমিক বিরক্ত হয়েছিলো? কাজ ছেড়ে চলে গিয়েছিলো। তারা চায়নি মোনিং ভ্যালিতে কোরাল উঠুক। তারপর থেকেই তো শুরু হলো গোঙানি।'

'মনে আছে। ওরাই প্রথম গেছে। কালই দেখা করবো আমি শেরিফের সাথে। হেনরির কোনো বংশধর আছে কিনা খোঁজখবর নিতে বলবো।'

'একটা ছবি দেখাচ্ছি,' পকেট থেকে ছোট একটা ফটোগ্রাফ বের করে দিলেন প্রফেসর।

হাতে হাতে ঘুরতে লাগলো ছবিটা। ছিপছিপে এক তরুণের ছবি। কালো চোখের তারায় যেন আগুনের ঝিলিক, গর্বিত মুখ। চওড়া কার্না আর উঁচু-চূড়াওয়ালা, কালো ভ্যাকুয়েরো সমব্রেরো হ্যাট মাথায়। গায়ে খাটো কালো জ্যাকেটের নিচে কালো উঁচু কলারের শার্ট, পরনে কালো আঁটো প্যান্ট, নিচের দিকটা ছড়ানো। পায়ে কালো চকচকে পয়েন্টেড বুট। ক্যামেরায় তোলা জীবন্ত হেনরির ছবি নয়, একটা পেইন্টিঙের ফটোগ্রাফ।

'সব সময়ই কি কালো পরতো?' জানতে চাইলো রবিন।

'সব সময়,' জবাব দিলেন প্রফেসর। 'শোকের চিহ্ন। তার পরিবার আর দেশের জন্যে শোক করতো।'

'চোরের আবার দেশপ্রেম! সাধারণ একটা ডাকাত ছাড়া আর কিছুই ছিলো না ব্যাটা,' ক্ষোভ ঢেকে রাখতে পারলেন না আমেরিকান র‍্যাঞ্চার। বলেই বুঝলেন, কথাটা খারাপ হয়ে গেছে। হেসে সামাল দিলেন। 'বসে বসে কিচ্ছা শুনলে র‍্যাঞ্চ চলবে না, অনেক কাজ আছে আমার। আজ রাতেই সেগুলো সারতে হবে।' ছেলেদের দিকে তাকালেন। 'তোমরা নিশ্চয় খুব টায়ারড। কাল খাটাবো তোমাদেরকে। মুসার বাবা বলে দিয়েছে, কি করে র‍্যাঞ্চ চালাতে হয় তার ছেলেকে যেন শিখিয়ে দিই।'

'মোটেই টায়ারড নই আমি,' তাড়াতাড়ি বললো কিশোর। 'তোমরা?'

'আমিও না,' রবিন বললো।

'আমিও না,' প্রতিধ্বনি করলো যেন মুসা।

'সবে তো সন্ধ্যা হয়েছে,' বললো কিশোর। 'আকাশও ভালো। সুন্দর রাত। র‍্যাঞ্চের আশপাশে ঘুরে দেখতে চাই। রাতের বেলা নাকি এখানকার সৈকতে নানা রকম সামুদ্রিক জীব উঠে আসে। দেখার সুযোগ কে ছাড়ে?'

'রাতের বেলা...,' মিসেস হারভে ঠিক মেনে নিতে পারছেন না।

'নিশ্চয়ই,' তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন মিস্টার হারভে। 'দেখতে এসেছো, দেখবে। ঘুমিয়ে কাটানোর জন্যে তো নিজের বাড়িই আছে, র‍্যাঞ্চে কেন?'

'বেশ,' অনিচ্ছা সত্ত্বেও বললেন মিসেস হারভে। 'তবে দশটার বেশি দেরি করবে না। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠি আমরা এখানে।'

আর এক মুহূর্ত দেরি করলো না ওখানে তিন গোয়েন্দা। বেরিয়ে এলো।

বাইরে বেরিয়েই নির্দেশ দিলো কিশোর, 'মুসা, গোলাঘর থেকে এক বাণ্ডিল দড়ি নিয়ে এসো। রবিন, তুমি গিয়ে আমাদের চক আর টর্চ আনো। আমি সাইকেলগুলো পরীক্ষা করে দেখি, কোনো গোলমাল আছে কিনা।'

'গুহায় যাচ্ছি নাকি আমরা?' জিজ্ঞেস করলো রবিন।

'হ্যাঁ। গোঙানির রহস্য ভেদ করতে হলে গোঙানি উপত্যকায়ই যেতে হবে।'

'গুহায় ঢুকবে?' শুকনো গলায় বললো মুসা। 'এই রাতে না গিয়ে দিনে গেলে হতো না?'

'না। রাতের বেলায়ই গোঙানি শোনা যায়। আর গুহার ভেতরে দিন-রাতের তফাৎ কি? সব সময়ই অন্ধকার, এক রকম। আজ গোঙাতে শুরু করেছে গুহাটা, কাল হয়তো থেমে যাবে। তারপর আবার কয় দিন অপেক্ষা করতে হবে ঠিক আছে? যাও।'

কয়েক মিনিট পর সাইকেল চালিয়ে র‍্যাঞ্চের গেট দিয়ে বেরিয়ে এলো তিন কিশোর। মুসার সাইকেলের ক্যারিয়ারে দড়ির বাণ্ডিল। সরু একটা কাঁচা রাস্তা ধরে চললো ওরা।

র‍্যাঞ্চটা সাগরের কিনারে বটে, কিন্তু বেরোলেই সাগর চোখে পড়ে না। কয়েক মাইল পর্যন্ত আড়াল করে রেখেছে উপকূলের পাহাড়। চাঁদ উঠেছে। জ্যোৎস্নায় নীরব প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন পাথুরে পাহাড়ের উঁচু চূড়াগুলো। সবুজ ওক গাছগুলোকে এখন দেখাচ্ছে ফ্যাকাশে শাদা, কেমন যেন ভূতুড়ে। সাইকেল চালাতে চালাতে ছেলেদের কানে এলো বিচিত্র শব্দ, চারণক্ষেত্রে অস্থির হয়ে উঠেছে গরুর পাল। নাক দিয়ে শব্দ করছে ঘোড়া, চঞ্চল।

হঠাৎ, কোনো রকম জানান না দিয়েই শুরু হলো গোঙানি, ছড়িয়ে পড়লো সারা উপত্যকায়।

চমকে উঠলো রবিন আর মুসা।

'গুড,' বললো কিশোর। 'থামেনি। আজ চলবে মনে হচ্ছে।'

নীরবে সাইকেল থেকে নামলো তিনজনে, স্ট্যাণ্ডে তুললো। উঁচু শৈলশিরায় উঠে তাকালো চন্দ্রালোকিত উপত্যকার ওধারে হেনরি ফিগারোর কালো গুহামুখের দিকে।

'কিশোর,' বলে উঠলো রবিন। 'কি যেন নড়ছে!'

'আমি খুটখাট শুনছি,' মুসা বললো।

'হ্যাঁ,' মাথা দোলালো কিশোর। 'আসলে কল্পনা করছো। এরকম জায়গায় এই পরিবেশে স্বাভাবিক জিনিসকেও অস্বাভাবিক লাগাটা স্বাভাবিক,' শুরু হলো তার লেকচার। 'অতি সাধারণ জিনিসও চমকে দেবে। আতঙ্কিত করে তুলবে। ওসব আলোচনা এখন থাক। রবিন, টর্চগুলো আরেকবার পরীক্ষা করো।'

পরীক্ষা করলো রবিন। দড়ির বাণ্ডিলে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে কাঁধে ঝোলালো মুসা। যার যার চক নিয়ে পকেটে ভরলো। কিশোরের শাদা চক, মুসার নীল, রবিনের সবুজ।

'এসব এলাকার পুরনো গুহাগুলো খুব বিপজ্জনক,' বললো কিশোর। 'সুড়ঙ্গের কোথায় যে চোরাখাদ লুকিয়ে থাকে বোঝা মুশকিল। পা ফেলেছো কি ধপাস, এক্কেবারে তলায়। দড়ি ছাড়া তোলা প্রায় অসম্ভব। সে-জন্যেই দড়ি নিয়েছি।'

'চক দিয়ে চিহ্ন আঁকতে আঁকতে যাবো?' জিজ্ঞেস করলো রবিন।

'নিশ্চয়।'

'চলো। গেলে আর দেরি করে লাভ নেই।'

'হ্যাঁ, চলো।'

ঢাল বেয়ে নিচে নামতে শুরু করলো ওরা, উপত্যকায়।

আবার সেই অদ্ভুত গোঙানি ঢেউ তুললো যেন রাতের শান্ত নীরবতায়।

গুহার কাছাকাছি চলে এলো ওরা। এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস এসে গায়ে লাগলো। হাঁ করে থাকা কালো সুড়ঙ্গমুখের কাছে এসে টর্চ জ্বাললো কিশোর, ঠিক এই সময় কানে এলো চাপা শব্দ।

'কিসের?' চেঁচিয়ে উঠলো রবিন।

বাড়ছে শব্দটা, জোরালো হচ্ছে। উপত্যকার চারপাশেই ঘিরে আছে পাহাড়, সেগুলোতে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুললো। ফলে বোঝা গেল না ঠিক কোনখান থেকে আসছে। মনে হচ্ছে, চার পাশ থেকেই হচ্ছে শব্দ।

'ওই দেখো!' ওপর দিকে হাত তুলে জোরে চিৎকার করে উঠলো মুসা।

ডেভিল মাউনটেইনের ওপর থেকে ঢাল বেয়ে নেমে আসছে বিশাল এক

পাথর, ওটার ধাক্কায় ঝুরঝুর করে বৃষ্টির মতো ঝরতে আরম্ভ করেছে অসংখ্য ছোট পাথর।

'সরো!' আবার চেঁচিয়ে উঠলো মুসা।

পাথরটা ওদের ওপরই পড়বে মনে হচ্ছে। এক লাফে পাশে সরে গেল রবিন।

কিশোর দাঁড়িয়েই রইলো, যেন জমে গেছে। চেয়ে রয়েছে পাথরটার দিকে। তার ওপরেই এসে পড়বে।

পাঁচ

ঝাঁপ দিলো মুসা। কিশোরকে নিয়ে গড়িয়ে পড়লো মাটিতে। ধুড়ুম করে পড়লো পাথরটা। গুহামুখের কাছ থেকে সরতে আর এক মুহূর্ত দেরি হলেই ভর্তা হয়ে যেতো গোয়েন্দাপ্রধান।

'এই, এই তোমাদের কিছু হয়েছে?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো রবিন।

'না, আমার কিছু হয়নি,' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে জবাব দিলো মুসা। 'কিশোর?'

খুব ধীরে ধীরে উঠলো কিশোর। কাপড় থেকে ধুলো ঝাড়লো। চোখ দেখে মনে হচ্ছে যেন এ-জগতে নেই সে। গভীর ভাবনায় ডুবে গেছে। 'নড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলাম,' বিড়বিড় করে বললো। 'হয় এরকম। আশ্চর্য এক মানসিক প্রতিক্রিয়া। সাময়িক ভাবে পঙ্গু করে দেয় শরীরকে। শিকার ধরার আগে ছোট ছোট জানোয়ারকে এভাবেই সম্মোহিত করে ফেলে বিশাল সাপ...'

'আরে ধ্যাত্তোর! রাখো তোমার লেকচার!' অধৈর্য হয়ে হাত নাড়লো মুসা। 'বৃলি, ঠিকঠাক আছো? না ভেঙেছে কিছু?'

ফিরেও তাকালো না কিশোর। চাঁদের আলোয় আলোকিত ডেভিল মাউনটেইনের ওপর দিকে চেয়ে রয়েছে, চোখে পলক পড়ছে না। 'দেখে মনে হচ্ছে অনেক আলগা পাথর আছে ওখানে,' আনমনে বললো সে। 'পাহাড়ের ঢালও খটখটে শুকনো। এখানে ওভাবে পাথর গড়িয়ে পড়া স্বাভাবিক। বহু জায়গার পাথরই বোধহয় আলগা করে দিয়েছে নেভির কামান।'

তিনজনেই এগোলো বিশাল পাথরটার দিকে। সুড়ঙ্গমুখের কয়েক গজ দূরে মাটিতে বসে গেছে।

'দেখো, দাগ,' পাথরটা দেখিয়ে বললো রবিন। 'কিশোর, কেউ ঠেলে ফেলেনি তো?'

'কিছু দাগ আছে,' ভালোমতো পাথরটা দেখে সোজা হলো কিশোর। 'এতে

অবাক হওয়ার কিছু নেই।'

'পড়ার সময় ঘষা খেয়েছে,' মুসা বললো। 'দাগ তো হবেই।'

'ওপরে কিন্তু কাউকে দেখিনি আমরা,' বললো রবিন।

মাথা ঝাঁকালো কিশোর। 'দেখিনি। দেখা দিতে চায়নি বলেই হয়তো দেখিনি।'

'ফিরে গিয়ে দেখবো নাকি আবার?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'না। আরও সাবধান থাকতে হবে আমাদের। গুহার ভেতরে অবশ্য সে-ভয় নেই। অন্তত মাথার ওপর পাথর খসে পড়বে না।'

গুহায় ঢুকলো তিনজনে। কিশোর আগে আগে রয়েছে। দেয়ালে আশ্চর্যবোধক আর একটা তীর চিহ্ন আঁকলো রবিন। সুড়ঙ্গমুখের কাছেই।

টর্চের আলোয় দেখা গেল, লম্বা অন্ধকার একটা সুড়ঙ্গ সোজা ঢুকে গেছে ডেভিল মাউনটেইনের গভীরে। মসৃণ দেয়াল। ছাত মুসার মাথার চেয়ে সামান্য উঁচুতে। কিশোর আর রবিন তার চেয়ে বেঁটে, ফলে হাঁটতে অসুবিধে হলো না কারোই।

চল্লিশ ফুট মতো সোজা এগিয়ে গেল পথটা। শেষ মাথায় বিরাট এক গুহা।

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলো ফেলে দেখলো ছেলেরা। যেমন বড় ঘর, তেমনি উঁচু তার ছাত। আবছা দেখা যাচ্ছে ওপাশের দেয়াল।

'আরিব্বাবা!' বললো রবিন। 'এতো বড় গুহা আর দেখিনি।' কেমন যেন শূন্য, দূরাগত শোনালো তার কথাগুলো।

'হাল্লো!' চেঁচিয়ে বললো মুসা।

'হাল্লো···হাল্লো···হাল্লো-ও-ও-ও-ও-ও!' প্রতিধ্বনি হলো।

হেসে উঠলো মুসা। রবিনও। মজা পেয়ে দু'জনেই হাল্লো হাল্লো শুরু করলো। গুহাটাও যেন রসিকতা শুরু করলো তাদের সঙ্গে।

কিশোর ওদের সঙ্গে যোগ দিলো না। টর্চের আলোয় গভীর মনোযোগে কি যেন দেখছে। ডাকলো, 'এই, দেখে যাও।'

ওদের বাঁয়ে, দেয়ালে কালো একটা ছোট ফোকর। আরেকটা সুড়ঙ্গমুখ। ওরকম আরও অনেকগুলো ফোকর দেখতে পেলো ওরা। কমপক্ষে দশটা সুড়ঙ্গ ঢুকেছে গিয়ে পর্বতের ভেতরে।

'খাইছে!' বলে উঠলো মুসা। 'কোনটা দিয়ে যাবো?'

সব ক'টা ফোকরই প্রায় একরকম। মুসার সমান উঁচু, চার ফুট চওড়া।

ভ্রূকুটি করলো কিশোর। 'মনে হচ্ছে সারা পর্বতের তলায়ই ছড়িয়ে আছে সুড়ঙ্গ।'

'এ-জন্যেই বোধহয় ফিগারোকে খুঁজে পায়নি শেরিফ। এতো সুড়ঙ্গ, কয়টাতে খুঁজবে? ওরা একদিকে গেলে ফিগারো আরেক দিকে সরে গেছে। লুকিয়ে থেকেছে।'

'হতে পারে।'

'এই গুহা আর সুড়ঙ্গ তৈরি হলো কিভাবে?' অবাক হয়ে দেখছে মুসা।

'পানি,' বললো রবিন। 'বইয়ে পড়েছি। নানারকম পাথর দিয়ে তৈরি হয় এসব পর্বত। কিছু পাথর শক্ত, কিছু নরম। পানিতে ক্ষয় হয়ে, কিংবা গলে গিয়ে ধুয়ে চলে যায় নরম পাথরগুলো, শক্তগুলো থেকে যায়। ফাঁকগুলোতে তৈরি হয়েছে সুড়ঙ্গ। কোটি কোটি বছর লেগেছে এসব হতে। অনেক অনেক আগে এই এলাকার বেশির ভাগ অঞ্চলই পানির তলায় ছিলো।'

'তবে সব সুড়ঙ্গই যে প্রাকৃতিক,' কিশোর বললো। 'তা নয়। মানুষেও বানিয়েছে কিছু। হয়তো হেনরি ফিগারোর লোকেরা।'

'কিংবা মাইনাররা। সোনার লোভে খুঁড়েছে।'

এক ফোকর থেকে আরেক ফোকরে আলো সরাচ্ছে মুসা। 'কোনটা থেকে শুরু করবো?'

'সবগুলো দেখতে হলে তো কয়েক মাস লেগে যাবে।'

'কাজেই সবগুলোতে দেখা যাবে না,' বললো কিশোর। 'শুধু যেটা থেকে গোঙানি আসে সেটায়। প্রত্যেকটা ফোকরের কাছে গিয়ে কান পাতবো। যেটা থেকে শোনা যাবে...'

'কিশোর!' বাধা দিলো রবিন। 'একটা ব্যাপার খেয়াল করোনি? গুহায় ঢোকার পর থেকে আর শুনছি না!'

স্থির দাঁড়িয়ে কান পেতে রইলো তিনজনে। রবিন ঠিকই বলেছে। কবরের নীরবতা গুহার মধ্যে। কোনো শব্দ নেই।

'এর মানে কি?' মুসার কণ্ঠে অস্বস্তি।

এর পর আরও দশ মিনিট পেরিয়ে গেল। গোঙানি শোনা গেল না।

'পাথর পড়ার পর থেকেই আর আওয়াজটা শুনিনি,' রবিন বললো।

'হ্যাঁ,' বললো কিশোর। 'এতো বেশি উত্তেজিত ছিলাম, খেয়ালই করিনি কখন থেমে গেছে।'

'কি করবো এখন?' মুসার প্রশ্ন।

'শুরু হতে পারে আবার,' আশা করলো কিশোর। 'মিস্টার হারভে বলেছেন আওয়াজটা অনিয়মিত, নির্দিষ্ট সময় পর পর শুরু হয় না। না হোক, ইতিমধ্যে যে ক'টা সুড়ঙ্গ পারি দেখে ফেলি আমরা।'

মুসা আর রবিন রাজি। এই দুঃসহ অন্ধকারে শুধু শুধু দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে যা-ই হোক কিছু একটা করা ভালো। একটা সুড়ঙ্গে ঢোকার আগে চক দিয়ে দেয়ালে চিহ্ন এঁকে দিলো রবিন।

সাবধানে এগোলো ওরা। অন্ধকারের কালো চাদর ফুঁড়ে বেরোচ্ছে যেন টর্চের আলো। তিরিশ ফুট মতো এগিয়েই শেষ হয়ে গেল সুড়ঙ্গটা। সামনে দেয়াল নয়, পাথর পড়ে বন্ধ হয়েছে।

গুহায় ফিরে এলো ওরা।

পাশাপাশি চারটে সুড়ঙ্গে ঢুকে দেখলো। ঢোকার আগে অবশ্যই মুখের কাছে চক দিয়ে চিহ্ন এঁকে রাখলো। কোনোটা দিয়েই বেশি দূরে এগোতে পারলো না। পাথর পড়ে পথ বন্ধ।

'অযথা সময় নষ্ট করছি,' অবশেষে বললো কিশোর। 'এক কাজ করা যাক। তিনজনে একসঙ্গে না ঢুকে আলাদা আলাদা সুড়ঙ্গে ঢুকি। তাতে সময় বাঁচবে, দেখাও হবে বেশি। খোলা সুড়ঙ্গ যে-ই দেখতে পাবো, ফিরে এসে অপেক্ষা করবো এখানে অন্য দু'জনের জন্যে।'

তিনজনে ঢুকে পড়লো তিনটে সুড়ঙ্গে।

কিশোর যেটাতে ঢুকলো, শুরুতে সেটা প্রাকৃতিকই মনে হলো। অল্প কিছু দূর পর্যন্ত। তারপর চোখে পড়লো কড়ি-বরগা আর থাম। মাইন শ্যাফট। খনির কাজে খোঁড়া হয়েছিলো। সাবধানে এগিয়ে গেল আরও কয়েক গজ।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হলো। সামনে বন্ধ। পাথরের স্তূপ। পড়ে থাকা একটা পাথর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো তার। এখানকার অন্যান্য পাথরের চেয়ে আলাদা। তুলে নিয়ে ওটা পকেটে রেখে দিলো, পরে ভালোমতো দেখার জন্যে।

এই সময় শোনা গেল মুসার চিৎকার। 'কিশোর! রবিন! জলদি এসো!'

সুড়ঙ্গ পেরিয়ে রবিন তখন আরেকটা গুহায় ঢুকেছে। এটাও প্রথম গুহাটার মতোই। হাঁ করে তাকিয়ে দেখছে। এটাতেও প্রথমটার মতোই অসংখ্য সুড়ঙ্গমুখ। ফেরার জন্যে সবে ঘুরেছে, এই সময় কানে এলো মুসার চিৎকার। দিলো দৌড়।

কিশোরও দৌড় দিয়েছে। আচমকা অন্ধকার থেকে কি যেন একটা এসে পড়লো তার ওপর। চিত হয়ে পাথুরে মেঝেতে পড়ে গেল সে। তার গলায় খামচি মারার চেষ্টা করলো কয়েকটা আঙুল।

'বাঁচাও! বাঁচাও!' আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠলো একটা কণ্ঠ।

'রবিন! আরে আমি, কিশোর।'

ঢিল হলো আঙুলগুলো। একে অন্যের ওপর টর্চের আলো ফেললো ওরা।

'আমি ভাবছিলাম, কিসের গায়ে জানি পড়লাম!' বললো রবিন।

'আমিও তাই ভেবেছি। মুসার চিৎকারে চমকে গিয়ে···চলো, চলো।'

মুসা যে-সুড়ঙ্গে ঢুকেছে সেটাতে ঢুকলো দু'জনে। এ-পর্যন্ত যে-কটাতে ঢুকেছে ওরা, সবগুলোর চেয়ে এটা লম্বা মনে হলো। সামনে টর্চের আলো নাচছে। মুসার হাতে।

'এই যে, আমি এখানে,' ডাকলো সে।

আরেকটা বড় গুহায় এসে ঢুকলো কিশোর আর রবিন। মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে মুসা। চেহারা ফ্যাকাশে। টর্চের আলো ফেলেছে বাঁ দেয়ালে।

'ওখানে···ওখানে কি যেন দেখলাম! কালো! চকচকে!'

রবিন আর কিশোরও আলো ফেললো। কিছুই দেখলো না।

'আমি শিওর দেখেছি,' জোর দিয়ে বললো মুসা। 'ঢুকে প্রথমে আওয়াজ শুনলাম। লাইট ফেলে দেখি···ওটা! ওই দেয়ালের কাছে। বিরাট। হাত থেকে টর্চ পড়ে গিয়েছিলো আমার। আবার তুলে আলো ফেলে দেখলাম, নেই!'

সন্দেহ জাগলো রবিনের। 'কল্পনা করেছো। বেশি নার্ভাস হলে হয় এরকম। আলাদা হওয়া উচিত হয়নি আমাদের।'

দেয়ালটার কাছে এগিয়ে গেল কিশোর। নিচু হয়ে কি দেখলো। 'মুসা ভুল দেখেনি, রবিন। দেখে যাও।'

দ্রুত এগিয়ে গেল রবিন আর মুসা। পাথুরে মেঝেতে বড় বড় দুটো দাগ। পায়ের ছাপ। টর্চের আলোয় চকচক করছে।

'কি···,' কেঁপে গেল রবিনের গলা। 'কি ওগুলো, কিশোর?'

'ভেজা ভেজা লাগছে,' জবাব দিলো কিশোর। 'পানি।'

'খাইছে!' জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভেজালো মুসা।

সমস্ত মেঝেটায় আলো ফেলে ফেলে দেখলো কিশোর। আর ছাপ নেই। ছাতে আলো ফেললো। খটখটে শুকনো।

'পানির চিহ্নও তো দেখছি না। এলো কোত্থেকে?' বললো সে। 'মুসা ঠিকই বলেছে। কিছু একটা দাঁড়িয়ে ছিলো ওখানে। ভেজা ছাপ রেখে গেছে।'

'এতো বড়?' রবিন বললো। 'দু-তিন ফুটের কম লম্বা হবে না।'

'বড়, ভেজা, চকচকে। দেখে মনে হয়···'

'দানবের!' কিশোরকে কথা শেষ করতে দিলো না মুসা।

'বুড়ো মানুষটা!' বললো রবিন।

পরস্পরের দিকে তাকালো ওরা। চোখে অস্বস্তি। দানবে বিশ্বাস করে না, কিন্তু তাহলে ছাপগুলো কার?

তীব্র আলো এসে পড়লো তিনজনের গায়ে। পাথরের মূর্তি হয়ে গেল যেন ওরা।

আলোর পেছনে থেকে শোনা গেল খসখসে কণ্ঠ, 'কি, হচ্ছে কি এখানে?'

ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো একটা মূর্তি। সামান্য কুঁজো, বাঁকা পিঠ। শাদা ধবধবে লম্বা চুল-দাড়ি, উসকো-খুসকো, বহুদিন ওগুলোতে চিরুনি কিংবা নাপিতের কাঁচি লাগেনি।

হাতে লম্বা নলওয়ালা পুরনো আমলের রাইফেল।

ছয়

কালো সুড়ঙ্গমুখগুলোর দিকে ইঙ্গিত করলো বুড়ো মানুষটা।

'অনেক ভেতরে ঢুকেছে ওগুলো,' ভাঙা ভাঙা কণ্ঠস্বর। 'সহজেই হারিয়ে যাবে ওর মধ্যে ঢুকলে।'

দুষ্টুমি করে একটা লাল চোখ টিপলো বুড়ো। 'চিনি তো জায়গাগুলো, ভালো করেই চিনি। পঞ্চাশ বছর ধরে আছি, মুণ্ডু কাটা যায়নি একবারও। শত্রুর সঙ্গে কতো লড়াই করলাম।'

'মুণ্ডু কাটা যায়নি?' চোখ মিটমিট করলো মুসা। 'ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়াই করেছেন? এখানে?'

রাইফেলটা নাড়লো বুড়ো। 'ইনজুনস! ইনজুনসদের অনেক গল্প শোনাতে পারি তোমাদেরকে। সারা জীবন ওদের সাথে এখানে কাটালাম। লোক ভালো ওরা, তবে খুব খারাপ শত্রু। দু'বার মুণ্ডু প্রায় গিয়েছিলো আমার। ইউটি আর অ্যাপাচিদের দেশে গিয়ে। ভীষণ পাজি ওই অ্যাপাচিরা। কোনোমতে পালিয়ে বেঁচেছি।'

'এখন আর এখানে কোনো ইনডিয়ান নেই, স্যার,' ভদ্রভাবে বললো কিশোর। 'আর আমরাও সুড়ঙ্গে ঢুকে হারাবো না।'

কিশোরের ওপর স্থির হলো বুড়োর দৃষ্টি, যেন এই প্রথম তার ওপর চোখ পড়লো। 'এখন? না এখন আর ইনজুনসরা নেই। তা তোমরা কি পাগল? এই গুহায় ঢুকতে সাহস করেছো? নতুন নাকি?' কণ্ঠস্বর অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছে। চোখের বন্য দৃষ্টিও কোমল হয়েছে।

রবিন জবাব দিলো, 'হ্যাঁ, স্যার, রকি বীচ থেকে।'

'মিস্টার হারভের র‍্যাঞ্চে উঠেছি, মিস্টার…?' জিজ্ঞাসু চোখে লোকটার দিকে তাকালো কিশোর।

'ডিন মারটিন,' নাম বললো বুড়ো। 'ডিন বলে ডাকবে আমাকে। তো, হারভের ওখানে, অ্যাঁ? ভালো লোক ওরা। বাইরে দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ চিৎকার শুনলাম। তোমাদেরই কেউ?'

'হ্যাঁ, স্যার,' বললো কিশোর। 'তবে হারিয়ে গিয়ে সাহায্যের জন্যে চেঁচাইনি। নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন দেয়ালে, দাগ দিতে দিতে এসেছি।'

'তাই? বুদ্ধি আছে। আরও একশো বছর আগে জন্মানো উচিত ছিলে তোমাদের, আরামে কাটাতে পারতে। তা এখানে কি করছো?'

'কিসে গোঙায় দেখতে এসেছি,' রবিন বললো।

'আমরা ঢুকতেই থেমে গেল,' বললো মুসা।

হঠাৎ কুঁকড়ে গেল লোকটা। চোখে ভয় ফুটলো। পরিবর্তনটা এতোই প্রকট, ছেলেদের মনে হলো অন্য একজন মানুষের দিকে তাকিয়ে আছে এখন। আগের বুড়ো নয়। 'গোঙানি, না?' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে কণ্ঠস্বর। 'লোকে বলে, হেনরি ফিগারো ফিরে এসেছে। আমি বিশ্বাস করি না। গোঙান ওই ভদ্রলোক, "বুড়ো মানুষটা"। বুঝেছো?' থামলো এক মুহূর্ত। ভয়ে ভয়ে তাকালো এদিক-ওদিক। 'শ্বেতাঙ্গরা এই এলাকায় আসার আগে থেকেই আছেন তিনি। সময়, বা বয়েস তাঁর কাছে কিছুই নয়। তিনি আছেন, থাকবেন। বাঁচতে চাইলে, তাঁকে রাগাতে না চাইলে আর কক্ষণো এখানে ঢুকো না। আমি ঢুকি বটে, কিন্তু গোঙানির কারণ জানার চেষ্টা করি না। শেরিফ আর তার লোকেরাও তাঁকে ভয় পেতো। ওদের সবাইকেই ধরেছেন তিনি! ঢুকতে বারণ করে দেবে। এখানকার শেরিফও যেন না ঢোকে। ঢুকলে সবাইকে ধরবেন তিনি, কাউকে ছাড়বেন না।'

ভীত চোখে কিশোরের দিকে তাকালো রবিন আর মুসা। কিন্তু সে তাকালো না। চেয়ে আছে বুড়োর দিকে। ভাবছে কি যেন। 'তাঁকে আপনি কখনও দেখেছেন, মিস্টার মারটিন? বুড়ো মানুষটাকে? এই গুহায়?'

'তাঁকে?' দ্রুত চারপাশে তাকালো মারটিন। 'এসো আমার সঙ্গে, বাইরে দিয়ে আসি। খবরদার, এখানে ঢুকে আর কখনও চিল্লাবে না। তিনি সহ্য করবেন না।'

মাথা কাত করলো কিশোর। 'হ্যাঁ, বেরোনো যায় এখন। অনেক কিছুই দেখলাম। আপনি ঠিকই বলেছেন। এখানে সহজেই হারিয়ে যাওয়া যায়।'

বৈদ্যুতিক লণ্ঠনটা তুলে নিলো বুড়ো। ছেলেদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো গুহার বাইরে, উপত্যকায়। সঙ্গে সঙ্গে চললো, একেবারে সাইকেলের কাছে পৌঁছে দেবে। কান খাড়া রেখেছে কিশোর। কিন্তু গোঙানি আর শোনা গেল না।

ডিন মারটিনকে ধন্যবাদ দিলো ছেলেরা, 'গুড-নাইট' জানালো।

'তোমরা খুব ভালো ছেলে, চালাক,' বললো মারটিন। 'তবে বুড়ো মানুষটা

তোমাদের চেয়ে চালাক, সবার চেয়েই চালাক। তোমরা সাবধানে থাকবে। হারভেকেও হুঁশিয়ার করে দেবে। বলবে, বুড়ো মানুষটা সবার ওপরই চোখ রাখছেন।' খনখনে হাসি হাসলো সে।

চাঁদের আলোয় কাঁচা সড়ক ধরে সাইকেল চালিয়ে চলেছে তিন গোয়েন্দা। এখনও যেন কানে বাজছে বুড়োর হাসি। হঠাৎ থেমে গেল কিশোর।

ধাঁই করে হ্যাণ্ডেল আরেক দিকে ঘুরিয়ে দিলো মুসা, অল্পের জন্যে কিশোরের সাইকেলের ওপর পড়লো না।

রবিনও ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষলো। 'কি ব্যাপার?'

'কাজ শেষ হয়নি এখনও,' বলতে বলতেই আবার সাইকেল ঘোরালো কিশোর।

'র‍্যাঞ্চে ফিরে গেলেই ভালো,' বললো রবিন।

'আমিও তাই বলি,' তাড়াতাড়ি বললো মুসা।

'কোনো কাজে হাত দিলে শেষ না করে ছাড়ে না তিন গোয়েন্দা,' ঘোষণা করলো যেন কিশোর।

'কিন্তু ভোটে হেরে যাবে,' রবিন বললো। 'দু'জন আর একজন...'

ঠেকানো গেল না কিশোরকে। প্যাডেল ঘোরাতে শুরু করেছে।

দীর্ঘ এক মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে রইলো দুই সহকারী গোয়েন্দা। তারপর নীরবে অনুসরণ করলো। জোরে জোরে প্যাডেল করে চলে এলো কিশোরের পাশে।

পথের মোড়ে ছায়ায় এসে থামলো কিশোর। ভালো করে দেখে বললো, 'অল ক্লীয়ার। এসো।'

'এবার কি করতে হবে?' জিজ্ঞেস করলো রবিন।

'আপাতত সাইকেলগুলো লুকাতে হবে। তারপর হেঁটে যাবো। চুপে চুপে।'

'চুপে চুপে হেঁটে কোথায় যাবো?' জানতে চাইলো মুসা।

'একটু আগে দেখলাম, এই পথটা ডেভিল মাউনটেইনের পাশ ঘুরে সাগরের দিকে গেছে। সাগরের দিক থেকে ঢোকার আর কোনো পথ আছে কিনা দেখবো।'

পাহাড়ের ছায়া পথের ওপর। কিশোরের পিছু পিছু চললো রবিন আর মুসা। চাঁদের আলোয় পাহাড় আর পাথরের বিচিত্র সব ছায়া পড়েছে উপত্যকায়, দেখলে কেমন যেন গা ছমছম করে। পথের ধারে কখনও গাছপালা, কখনও পাথরের চাঁই। কখনও বা সরু গিরিপথের মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে পথটা।

'তিনটা প্রশ্ন,' হাঁটতে হাঁটতে বললো কিশোর। 'আমরা ঢোকার পরই কেন বন্ধ হয়ে গেল গোঙানি? বাতাস তো আগাগোড়া একই রকম বইছে। তারমানে

শুধু বাতাসের কারণে হয় না শব্দ।'

'অন্য কিছু?' রবিন বললো।

'হ্যাঁ।'

'কী?' জানতে চাইলো মুসা।

'আমাদের ওপর চোখ রেখেছে এমন "কিছু" কিংবা "কেউ"। দ্বিতীয় প্রশ্ন, ডিন মারটিন আমাদেরকে গুহা থেকে বের করে দেয়ার জন্যে এতো ব্যস্ত হলো কেন?'

'বার বার তার বদলে যাওয়া ভালো লাগেনি!' শেষ দিকে কেঁপে গেল রবিনের গলা।

'হ্যাঁ,' আনমনা হয়ে গেল কিশোর, ক্ষণিকের জন্যে। 'এক আজব বুড়ো! মনে হলো, দু'জন ভিন্ন লোক ভিন্ন সময়ে বাস করছে। অভিনয়ই করলো কিনা কে জানে!'

'আমাদের ভালোই হয়তো চেয়েছে, তাই বের করে দিয়েছে,' মুসা বললো। 'দেখলে না, বুড়ো মানুষের কথা বলার সময় কেমন ভয় ফুটলো চোখে। দানবটাকে দেখেছেও বোধহয়।'

'হয়তো। তিন নম্বর প্রশ্নটা হলো, কালো চকচকে যে জিনিসটা তুমি দেখলে। কি দেখেছো? কোনো সন্দেহ নেই আমার, পানিতে ভিজে ছিলো বলেই ছাপগুলো পড়েছে। পর্বতের ভেতরে কোথাও হ্রদ-টদ কিংবা খাঁড়ি যেমন থাকতে পারে, তেমনি পারে সাগর থেকে গুহায় ঢোকার কোনো গোপন পথ। সেটাই দেখতে চলেছি।'

আর কিছু দূর এগোতেই সামনে লোহার গেট চোখে পড়লো। পথটা ওখানে শেষ। তার পরে পাহাড়ের প্রায় খাড়া ঢাল বেয়ে ডানে-বাঁয়ে নেমে গেছে দুটো সরু পথ। অনেক নিচে ঢেউয়ের ফেনা শাদা রেখা সৃষ্টি করেছে চাঁদের আলোয়। গেট ডিঙিয়ে এসে পাড়ের ওপরে দাঁড়িয়ে নিচে তাকালো ছেলেরা।

'ডানে যাবো, গুহাটা ওদিকেই,' বললো কিশোর। 'পর্বতারোহীদের মতো কোমরে দড়ি বেঁধে নেবো। মুসা, তুমি আগে যাবে, আমি থাকবো পেছনে। সারি দিয়ে এগোবো। পথ যেখানে বেশি খারাপ একজন একজন করে পেরোবো। পা পিছলালেও অন্য দু'জনে যাতে তাকে টেনে তুলতে পারি।'

দ্রুতহাতে কোমরে দড়ি বেঁধে নিলো ওরা। সরু পথ ধরে আগে আগে চললো মুসা। নিচে বড় বড় পাথরে আছড়ে ভাঙছে ঢেউ। কালো পাথরগুলো রুপোলি দেখাচ্ছে জ্যোৎস্নায়। মাঝে মাঝে পথ এতো নিচে নেমে যাচ্ছে, আছড়ে ভাঙা ঢেউয়ের পানির ছিটে এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে ওদেরকে। তিনবার থামতে হলো। পথ এতো খারাপ ওসব জায়গায়. একজন একজন করে পেরোতে হলো।

শেষ দিকে প্রায় খাড়া ভাবে সোজাসুজি নেমে গেছে পথটা। নিচে ছোট এক টুকরো সৈকত, ঝকঝকে শাদা বালি। এখন নির্জন। তবে লোকজন যে আসে, সাঁতার কাটে, পিকনিক করে, তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। বিয়ারের খালি টিন, ফান্টা-কোকাকোলার বোতল, খাবারের বাক্স পড়ে আছে এদিক-ওদিক।

'ভালোমতো চোখ রাখবে,' বললো কিশোর। 'ফোকর-টোকর থাকতে পারে।'

ঢালের গোড়ার কাছটায় ঘন হয়ে জন্মে আছে ঝোপঝাড়। মাঝে মাঝে বড় তর গাছ, কোনো কারণে বেড়ে ওঠা ব্যাহত হয়েছে ওগুলোর। ফাঁকে ফাঁকে বড় পাথরের চাঁই।

টর্চের আলো ফেলে দেখছে ওরা। বিশেষ করে চাঁইগুলোর পেছনে।

'আমার মনে হয় না এখানে কিছু আছে,' মুসা বললো।

'তাহলে কোথায় আছে?' প্রশ্ন করলো রবিন।

'কি জানি! কেউ তো বলেনি, এদিকেও সুড়ঙ্গমুখ আছে। আমরা আন্দাজ করছি। থেকে থাকলেও খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে।'

'থাকলে কাছাকাছিই কোথাও আছে। কারণ, পথটা শেষ হয়েছে এখানেই।'

'ঠিকই বলেছো,' মুখ খুললো কিশোর। 'রবিন, তুমি আমার সাথে এসো। ডান দিকে খুঁজবো। মুসা, তুমি বাঁয়ে যাও।'

পানির কিনারের পাথরগুলো পিচ্ছিল হয়ে আছে শ্যাওলায়। তাতে কামড়ে রয়েছে অসংখ্য শামুক-গুগলি। ওগুলোর ওপর দিয়ে হাঁটার সময় খুব সাবধান হতে হচ্ছে রবিন আর কিশোরকে।

অবশেষে এমন একটা জায়গায় এসে থামলো, আর এগোনোর উপায় নেই। তাহলে পানিতে নামতে হবে। হতাশ হয়ে ঘুরতে যাবে এই সময় শোনা গেল মুসার চিৎকার। 'এই, পেয়েছি!'

ভেজা পাথরগুলো কোনোমতে পেরিয়ে এসে সৈকতে নেমেই দৌড় দিলো রবিন আর কিশোর। বাঁ দিকের প্রায় শেষ মাথায় চ্যাপ্টা বড় একটা পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে মুসা। মস্ত দুটো পাথরের চাঁইয়ের মাঝে টর্চের আলো ফেলেছে। ছোট একটা মুখ, পানি থেকে বড়জোর ফুট খানেক ওপরে।

'এই, শুনছো?' কান পাতলো মুসা। 'আবার শুরু হয়েছে।'

অন্য দু'জনও শুনলো।

গোঙানিটা আসছে খোলা সুড়ঙ্গমুখ দিয়ে। মৃদু শব্দ, যেন পর্বতের অনেক গভীর থেকে আসছে।

আরেকটু এগিয়ে মুখের ভেতরে আলো ফেললো মুসা। কালো, ভেজা, সরু পথ। সোজা চলে গেছে সুড়ঙ্গ, শেষ কোথায় বোঝা যাচ্ছে না।

সাত

'খাইছে রে! কি অন্ধকার!' বললো মুসা।

'কিছু দূর গিয়েই বোধহয় শেষ হয়ে গেছে,' রবিন অনুমান করলো।

'না,' দৃঢ় কণ্ঠে বললো কিশোর। 'নিশ্চয় ওই গুহায় যাওয়া যায় এটা দিয়ে। নইলে গোঙানি শুনতে পেতাম না।'

'দেখে কিন্তু তা মনে হয় না,' মুসার কণ্ঠে সন্দেহ।

ঝুঁকে ভেতরে তাকালো কিশোর। 'ঢোকা যাবে। সাবধান থাকতে হবে আরকি। রবিন, তুমি যাও। যে রকম সরু ওটা, তোমার জন্যেই সহজ। কোমরে দড়ি বেঁধে নামো, আমরা দড়ি ধরে রাখছি।'

'আমি? একা! তিনজনে একসাথে যাওয়া যায় না?'

'বোকামি হবে। এরকম অচেনা সুড়ঙ্গে একলা গেলেই ভালো। আমরা বাইরে থাকছি। তুমি কোনো বিপদে পড়লে দড়ি ধরে টেনে বের করে আনতে পারবো। তিনজন একসাথে বিপদে পড়লে তিনজনেই মরবো।'

'হ্যাঁ, সিনেমায় দেখেছি,' মুসা বললো। 'ওই যে, জেলখানা থেকে পালায়, ওসব ছবিতে। অচেনা সুড়ঙ্গে আগে একজনকে পাঠায়। ও গিয়ে দড়িতে একবার হ্যাঁচকা টান দিলে বাইরের ওরা বোঝে, বিপদে পড়েছে, কিংবা নিরাপদ নয়; তাড়াতাড়ি দড়ি টেনে লোকটাকে বের করে নিয়ে আসে।'

'তুমিও একবারই টেনো,' রবিনকে বললো কিশোর। 'টেনে বের করে নিয়ে আসবো।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোমরে শক্ত করে দড়ি বেঁধে নেমে পড়লো রবিন। হামাগুড়ি দিয়ে এগোলো।

ভেতরে খুব ঠাণ্ডা। অন্ধকার তো বটেই। ছাত এতো নিচু, উঠে দাঁড়াতে পারবে না। দেয়াল ভেজা, সবুজ শ্যাওলায় পিচ্ছিল। চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে একটা জন্তুর মতো এগিয়ে চললো সে, সাবধানে, ইঞ্চি ইঞ্চি করে। অনেক কাঁকড়া আছে ভেতরে। টর্চের আলো পড়লেই বিচিত্র ভঙ্গিতে দাঁড়া নেড়ে তাড়াহুড়ো করে গিয়ে ঢুকছে ভেজা পাথরের আড়ালে।

তিরিশ ফুট মতো এগিয়ে হঠাৎ ওপরে উঠে গেছে ছাত। উঠে দাঁড়ালো রবিন। সামনে এখনও খোলা সুড়ঙ্গ। বাধা নেই। ছাত উঁচু হয়েছে, দেয়াল দু'দিকে সরে গিয়ে মাঝখানটা চওড়া হয়েছে, কোণাকুণি উঠে গেছে পথটা। ভেজা নয় আর, শুকনো।

'কিশোর! মুসা!' চেঁচিয়ে বললো সে। 'ঠিকই আছে সব। এসো।'

ওরা দু'জনও তার পাশে এসে দাঁড়ালো।

'বেশ শুকনো তো এখানে,' বললো মুসা।

'জোয়ারের পানি উঠতে পারে না, তাই,' কিশোর বললো।

এগিয়ে চললো ওরা। প্রতি দশ ফুট পর পর চিহ্ন আঁকছে কিশোর। চল্লিশ ফুট পর বড় একটা গুহা পাওয়া গেল। দেয়ালে এতো বেশি ফোকর, যেন মৌমাছির বিরাট এক বাসা। কোনটা দিয়ে ঢুকবে?

পরস্পরের দিকে তাকালো ওরা।

'আবার সেই সমস্যা,' মুসা বললো।

'পাহাড়টার তলায় সুড়ঙ্গ ছাড়া যেন আর কিছু নেই,' নিরাশ হয়ে মাথা নাড়লো রবিন। 'কোনটায় ঢুকবো?'

গুহা, কিংবা ফোকরগুলোর দিকে বিশেষ নজর নেই কিশোরের। কান পেতে রয়েছে। 'শব্দ কই?'

তাই তো! মুসার দিকে চেয়ে ভুরু নাচালো রবিন। 'নেই!'

'না, নেই!' মুসাও মাথা নাড়লো।

'আমি সুড়ঙ্গে ঢোকার পর থেকেই কিন্তু শুনিনি,' রবিন বললো।

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝোঁকালো কিশোর। 'আমরা ঢুকলেই বন্ধ হয়ে যায়। আশ্চর্য! একবার নয়, দু'বার ঘটলো একই ঘটনা। কাকতালীয় আর বলা যায় না।'

'কি বলতে চাইছো?' অবাক মনে হলো মুসাকে। 'আমরা ঢুকলেই কিছু একটা গড়বড় হয়ে যাচ্ছে? তাতে থেমে যাচ্ছে গোঙানি?'

'হতে পারে।'

'আরও একটা ব্যাপার হতে পারে,' বললো রবিন। 'ঢুকলেই আমাদের কাউকে দেখে ফেলছে।' নিজেই প্রশ্ন তুললো আবার, 'কিন্তু কিভাবে?'

মাথা নাড়লো কিশোর। 'বুঝতে পারছি না। হয়তো…'

শোনা গেল শব্দটা। মৃদু, বহুদূর থেকে আসছে। ঘোড়ার খুরের খটাখট।

'ঘোড়া!' চেঁচিয়ে উঠলো রবিন।

মাথা ঘুরিয়ে শুনছে কিশোর। গুহার দেয়ালের ভেতর দিয়ে যেন আসছে শব্দটা। 'মনে হচ্ছে…পর্বতের অনেক গভীর থেকে আসছে!'

রবিন বললো, 'হেনরি ফিগারোর গুহা থেকে…'

'উঁহুঁ! ওটা এখন আমাদের বাঁয়ে। সোজাসুজি ঢুকেছি আমরা, পাহাড়ের দিকে মুখ করে আছি। তুমি যেদিকের কথা বলছো, সেদিকে কোনো সুড়ঙ্গ নেই, দেখো।'

'সব চেয়ে ভালো হয়, এখান থেকে বেরিয়ে চলে গেলে,' মুসা বলে উঠলো।

'চলো, বেরিয়েই যাই। সেই ভালো।'

পেছন ফিরে প্রায় দৌড়ে চললো ওরা। সুড়ঙ্গের সরু মাথাটার কাছে আগে পৌঁছলো মুসা। হামাগুড়ি দিয়ে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব এগোলো। পেছনে রবিন আর কিশোর।

বেরিয়ে এলো সুড়ঙ্গ থেকে।

'এখন কি করবো?' জিজ্ঞেস করলো রবিন।

'এক রাতে যথেষ্ট হয়েছে,' জবাব দিলো কিশোর। 'র‍্যাঞ্চে ফিরে যাবো।'

দুই সহকারীর মনের কথা বলেছে গোয়েন্দাপ্রধান। সানন্দে ফিরে চললো ওরা। কোমড়ে দড়ি বেঁধে উঠে চললো বিপজ্জনক পাহাড়ী পথ বেয়ে। নিরাপদেই উঠে এলো ওপরে।

আগে রয়েছে কিশোর। গেটের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালো কিশোর। তার পিঠের ওপর এসে পড়লো মুসা। 'কি ব্যাপার?'

জবাব দিলো না কিশোর। চেয়ে রয়েছে ডেভিল মাউনটেইনের দুই চূড়ার দিকে, একই রকম দেখতে চূড়া দুটো, যেন জমজ।

'কি হয়েছে?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো রবিন।

ধীরে ধীরে বললো কিশোর, 'কি যেন নড়তে দেখলাম ওখানে…'

শোনা গেল ঘোড়ার খুরের শব্দ। খট-খট খটা-খট খট-খট…

'আবার!' গুঙিয়ে উঠলো রবিন।

'গুহার মধ্যে এই শব্দই শুনেছিলাম না?' মুসা বললো।

'তাই তো মনে হয়,' বললো কিশোর। 'পাহাড়ের কোনো ফাটল দিয়ে ঢুকেছিলো শব্দটা।'

গেটের কাছে একটা ঘন ঝোপে লুকিয়ে পড়লো ওরা।

এগিয়ে আসছে খুরের আওয়াজ। বড় একটা কালো ঘোড়া দেখা গেল, পর্বতের ঢালের পথ ধরে। দুলকি চালে চলে গেল ছেলেদের কয়েক ফুট দূর দিয়ে।

'মানুষ কই?' রবিনের প্রশ্ন।

'ধরবো নাকি?' মুসা বললো।

'না।' ঘোড়াটার দিকে চেয়ে রয়েছে কিশোর। 'দেখি, কি করে?'

ঝোপের ভেতরেই বসে আছে ওরা।

হঠাৎ আঙুল তুলে দেখালো মুসা। ঢাল বেয়ে দ্রুত নেমে আসছে একজন মানুষ। কাছে এলে চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখলো ওরা। লম্বা, বাদামী চামড়া, চোখা নাক। ডান গালে একটা কাটা দাগ। বাঁ চোখের ওপর কালো পট্টি।

'পট্টিটা দেখলে?' ফিসফিসিয়ে বললো মুসা।

'আর গালের কাটা,' যোগ করলো রবিন।

'আমি দেখেছি ওর স্যুট,' কিশোর বললো। 'বিজনেস স্যুট। মনে হলো

কোটের নিচে পিস্তলও আছে।'

'এবার তাহলে যেতে পারি আমরা?' মুসা বললো।

'হ্যাঁ। দারুণ কাটলো সময়।'

সাইকেলের কাছে আসতে আসতে বার বার পেছনে ফিরে তাকালো ওরা। কিন্তু আর কিছু চোখে পড়লো না।

তবে, সাইকেল চালিয়ে মোনিং ভ্যালি পেরোনোর সময় আবার রাতের নীরবতা ভাঙলো সেই আজব গোঙানি।

আট

চোখেমুখে রোদ লাগতে ঘুম ভাঙলো মুসার। চোখ মেলে তাকালো। অপরিচিত লাগলো ঘরটা। কোথায় রয়েছে? বাইরে ঘোড়া নাক টানলো, একটা গরু হাম্বা করে উঠলো। মনে পড়লো তার, হারভে র্যাঞ্চের দোতলায় একটা বেডরুমে শুয়েছে। ওপরের বাংক থেকে ঝুঁকে নিচে তাকালো, কিশোরের বাংকের দিকে। সে কি করছে দেখার জন্যে। গোয়েন্দাপ্রধান নেই।

এক লাফে উঠে বসতে গিয়ে ছাতে মাথা ঠুকে গেল মুসার। উফ করে উঠলো।

ওধারের বাংক থেকে সাড়া দিলো রবিন। হাত তুলে জানালা দেখালো।

জানালার কাছে বুদ্ধদেবের মতো আসন করে বসেছে কিশোর, গায়ে ওরকমই একটা চাদর জড়ানো। তার সামনে মেঝেতে বিছানো কাগজের বড় একটা শীট, ওটার ওপর চারটে বই। পেন্সিল দিয়ে অনেকগুলো লাইন টেনেছে কাগজট্যাতে।

হাঁ করে চেয়ে রইলো মুসা। বুঝতে পারলো, বই দিয়ে মোনিং ভ্যালির একটা মডেল বানিয়েছে কিশোর। পেন্সিল দিয়ে এঁকেছে সুড়ঙ্গমুখ।

'এক ঘন্টা ধরে বসে আছে ওভাবে,' রবিন জানালো।

'খাইছে! দশ মিনিটও পারবো না আমি!' মাঝে মাঝে তাদের তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি বন্ধুটির আচার-আচরণ খুবই অবাক করে মুসা আর রবিনকে।

ধ্যান ভাঙলো অবশেষে। কথা বললো কিশোর পাশা। 'গোঙানি উপত্যকার সঠিক টপোগ্রাফিকেল অ্যারেঞ্জমেন্ট নির্ণয়ের চেষ্টা করলাম। জায়গাটার ফিজিকাল প্যাটার্নের মধ্যেই রয়েছে রহস্যের চাবিকাঠি।'

'গ্রীক বললে!'

'ও বোঝাতে চাইলো,' বুঝিয়ে দিলো রবিন। 'জায়গাটার গঠনের ওপর নির্ভর করছে রহস্যের সমাধান।'

'এরকম সহজ করে বললেই পারতো।'

মুসার কথায় কান দিলো না কিশোর। 'গোঙানি উপত্যকার আসল রহস্য, আমরা ঢুকলেই কেন ওটার গোঙানি বন্ধ হয়ে যায়? কাল রাতে দু'বার ঘটেছে ঘটনাটা। অথচ আমরা ফেরার সময়ও আবার শুরু হলো, একটা খবরের কাগজ দেখালো। 'নতুন করে গোঙানি শুরু হওয়ার রিপোর্ট বেরিয়েছে এটাতে। শেরিফের সাক্ষাৎকার নিয়েছে। শেরিফ বলেছেন, কারণটা জানা যাচ্ছে না তার আরেকটা কারণ, কেউ গুহায় ঢুকলেই নাকি ওই আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়।' কাগজটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বললো, 'আমি এখনও শিওর, কাকতালীয় কোনো ব্যাপার নয় ওটা।'

'হয়তো তোমার অনুমানই ঠিক,' রবিন বললো। 'এমনভাবে ঘটেছে, যেন আমাদের ওপর কেউ চোখ রেখেছিলো।'

'তো, তোমার মডেল কিভাবে সাহায্য করছে আমাদের?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

বই দিয়ে বানানো মডেলটার দিকে তাকালো কিশোর। 'কাল রাতে যতো জায়গায় গিয়েছি, সবগুলো জায়গায় চিহ্ন দিয়েছি এখানে। দু'বার দু'দিক দিয়ে ঢুকেছি, দু'বারই গোঙানি বন্ধ হয়ে গেছে। রবিন ঠিকই বললো, যেন আমাদের ওপর কেউ চোখ রেখেছিলো।'

মাথা ঝাঁকালো রবিন। 'আমরা ঢোকার আগেই দেখে ফেলছিলো আমাদের।'

'হ্যাঁ। আর এই মডেলটা বানিয়ে বুঝলাম, যতো জায়গায়ই গিয়েছি আমরা, আমাদের দেখেছে। ডেভিল মাউনটেইনের চূড়া থেকে।'

'তাহলে তো হয়েই গেল,' বললো মুসা। 'মিস্টার হারভেকে গিয়ে বলবো একথা। চূড়া থেকে ধরে ফেলা হবে লোকটাকে।'

'না, মুসা,' মাথা নাড়লো কিশোর। 'লোকটাকে ধরা এতো সহজ নয়। ওপর থেকে দেখে সে। ধরতে আসছে বুঝতে পারলেই পালাবে।'

'তাহলে...,' শুরু করলো রবিন।

'কিভাবে...,' একই সময় বললো মুসা।

'নজর রাখবো আমরা,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর। 'গুহায় আসলে কি ঘটছে জানার চেষ্টা করবো। তারপর জানাবো সবাইকে।'

'গুহায় কি ঘটছে কিছুই জানি না আমরা,' মুসা বললো। 'জানি?'

'না। তবে একটা প্ল্যান করেছি আমি। একটা সূত্র পেয়েছি।'

'পেয়েছো? কি?'

কাল রাতে গুহার ভেতর এটা পেয়েছি,' বলে পাথরের টুকরোটা বের করে দেখালো কিশোর। 'একসময় খনিতে ঢোকার পথ ছিলো ওই সুড়ঙ্গ। পাথর পড়ে যেখানে বন্ধ হয়েছে, ওখানে পেয়েছি।'

বাংক থেকে নেমে গিয়ে পাথরটা হাতে নিলো রবিন। দেখলো। তুলে দিলো মুসার হাতে।

'কি এটা, কিশোর?' মুসা বুঝতে পারছে না। 'আমার কাছে তো পিছলা একটা পাথর ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছে না।'

'জানালার কাচে ঘষা দাও ওটা দিয়ে।'

'কী?' আরও অবাক মুসা। 'তাতে কি হবে...'

'দিয়েই দেখো না।'

বাংক থেকে নেমে গিয়ে কাচে ঘষা দিলো মুসা। কেটে গেল কাচ। শিস দিয়ে উঠলো মুসা।

'কিশোর!' চেঁচিয়ে বললো রবিন। 'তারমানে...'

'হীরা,' কথাটা শেষ করে দিলো কিশোর। 'হ্যাঁ, আমার তাই মনে হয়। আনকাট ডায়মণ্ড। বড় বটে, কিন্তু জাত ভালো নয়, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্টোন সম্ভবত। তবে এটা হীরা।'

'হেনরি ফিগারোর গুহাটা হীরার খনি?' পাথরটা নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছে না রবিন। 'এখানে, এই ক্যালিফোর্নিয়ায়?'

'গুজব তো রয়েছে। হয়তো...'

বাধা পেয়ে থেমে গেল কিশোর। দরজায় থাবা দিয়ে জোরে জোরে ডাকলেন মিসেস হারভে, 'এই ছেলেরা, জলদি ওঠো। নাস্তা দেয়া হয়েছে।'

খাবারের কথা শুনে পেট মোচড় দিয়ে উঠলো। এতোক্ষণ বুঝতেই পারেনি ওরা, কতোটা খিদে পেয়েছে। কাপড় পরে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই চলে এলো র‍্যাঞ্চের বিরাট রান্নাঘরে। ওদের দিকে চেয়ে হাসলেন মিস্টার হারভে আর প্রফেসর হারকসন।

'বাহ্,' মন্তব্য করলেন প্রফেসর। 'মোনিং ভ্যালির রহস্যও দেখি তোমাদের খিদে কমাতে পারেনি।'

বড় বড় পাত্রে করে খাবার এনে রাখছেন মিসেস হারভে।

খাওয়া শুরু করলো ছেলেরা।

'কাজটাজ করবে কিছু আজ?' জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার হারভে।

'নিশ্চয় করবে,' ওদের হয়ে জবাব দিলেন মিসেস হারভে। 'উত্তরের মাঠে যাবে না খড় কাটতে? ওদেরও নিয়ে যাও।'

'ভালো বলেছো। খড় কাটা শেষ হলে ম্যাভারিক জড়ো করবো। সাহায্য করতে পারবে।'

র‍্যাঞ্চ জীবনের ওপর মোটামুটি পড়াশোনা আছে রবিনের। ম্যাভারিক মানে জানে। পশুর মূল পাল হতে সরে যাওয়া গরু ছাগল-ভেড়াকে বলে ম্যাভারিক।

'তো, কাল রাতে সৈকতে কেমন লাগলো?' জিজ্ঞেস করলেন প্রফেসর। 'কি কি দেখলে?'

'চমৎকার,' জবাব দিলো কিশোর। 'এক আজব বুড়োর সঙ্গে দেখা হলো। নাম বললো ডিন মারটিন। লোকটা কে, স্যার?'

'ডিন মারটিন আর তার বন্ধু কার্ল বেইরি ছিলো প্রসপেকটরস,' বললেন মিস্টার হারভে। 'যৌবনে সমস্ত পশ্চিম চুঁড়ে বেরিয়েছে সোনা রূপা আর হীরার সন্ধানে।'

'অনেক বছর আগে এখানে এসেছিলো দু'জনে, ।মিসেস হারভে বললেন। 'তখন গুজব ছিলো, এই অঞ্চলে সোনা পাওয়া গিয়েছে। আসলে যায়নি, কিন্তু ডিন আর কার্ল আশা ছাড়েনি। খোঁজ চালিয়েই যাচ্ছে। পর্বতের ঢালে একটা ছাউনি তুলে থাকে। তাদের ঘরে কারও যাওয়া পছন্দ করে না। মাঝে মাঝে র‍্যাঞ্চের কাজকর্ম করে দিয়ে তার বিনিময়ে খাবার নেয় আমাদের কাছ থেকে।'

'এখানে ওদেরকে সবাই চেনে,' জানালেন প্রফেসর।

'অনেক গল্প জানে মারটিন, আর বলতেও পারে,' হাসলেন মিস্টার হারভে। 'খেয়ালি লোক,গল্পগুলোও বেশির ভাগ বানানো,কিংবা রঙ চটানো। যেমন, শুরুতেই বলবে, ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে ফাইট করেছিলো। কিন্তু আমার সন্দেহ আছে।'

'মিথ্যে বলে?' মুখ ভরতি খাবার চিবাতে চিবাতে বললো মুসা।

মিস্টার হারভে জবাব দেয়ার আগেই ঝটকা দিয়ে পেছনের দরজা খুলে গেল। ঘরে ঢুকলো ফোরম্যান ডেভিড কোহেন। থমথমে চেহারা। বললো, 'পেদ্রো পড়ে ছিলো মোনিং ভ্যালিতে।'

'পেদ্রো?'উদ্বিগ্ন হলেন মিস্টার হারভে।

'কাল রাতে ঘোড়া থেকে পড়ে গেছে। সারারাত ওখানেই পড়ে ছিলো।'

'কেমন আছে ও?' মিসেস হারভেও উদ্বিগ্ন হলেন।

'ডাক্তার বললো ঠিক হয়ে যাবে। সানতা কারলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

'এখুনি যাচ্ছি দেখতে!' লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠলেন মিস্টার হারভে।

'শ্রমিকেরা ভীষণ ভয় পেয়েছে,' জানালো কোহেন। 'আরও দু'জন বলেছিলো, এখানে আর কাজ করবে না। পেদ্রো বলেছে, মোনিং ভ্যালিতে নাকি কি নড়তে দেখে দেখার জন্যে যায়। হঠাৎ গোঙানি শুনে ভয় পেয়ে যায় ঘোড়াটা। পেদ্রোকে পিঠ থেকে ফেলে দিয়ে ছুটে পালায়। সারা শরীর জখম হয়েছে বেচারার, গোড়ালি মচকে গেছে।'

পরস্পরের দিকে তাকালেন মিস্টার এবং মিসেস, চোখে চোখে কথা হয়ে গেল।

কিশোর জিজ্ঞেস করলো, 'ঘোড়াটা কি কালো? বড়?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালো ফোরম্যান। 'নাম ব্ল্যাকি। খুব ভালো জানোয়ার। আজ সকালে কোরালে ফিরেছে। একা। তখনই পেদ্রোর খোঁজ শুরু করলাম।'

'কেন, কাল রাতে তোমরা ঘোড়াটাকে দেখেছিলে?' তীক্ষ্ণ হলো মিস্টার হারভের দৃষ্টি।

'হ্যাঁ, স্যার। পিঠে লোক ছিলো না।'

'র‍্যাঞ্চের নিয়ম জানো? আরোহী ছাড়া কোনো ঘোড়া দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে এসে রিপোর্ট করতে হয়। তোমাদের তা-ই করা উচিত ছিলো। তাহলে কাল রাতেই পেদ্রোকে হাসপাতালে পাঠানো যেতো।'

'নিয়মটা জানতাম না, স্যার। তা-ও এসে জানাতাম, যদি খালি ঘোড়া দেখতাম। ওটার পেছনে একজন লোককে দৌড়ে যেতে দেখেছি। ভাবলাম, ওই লোকটাই বুঝি ঘোড়ার সওয়ারি। লম্বা, ডান গালে কাটা দাগ, চোখে পট্টি।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন মিস্টার হারভে। 'ওরকম চেহারার কাউকে তো চিনি না।'

'লম্বা, চোখে পট্টি?' ভুরু কোঁচকালেন প্রফেসর। 'শুনে সুবিধের লোক মনে হচ্ছে না। তবে নিশ্চয় হেনরি ফিগারো নয়। ফিগারো লম্বা নয়, আর চোখে পট্টিও লাগাতো না।'

দরজার দিকে এগোলেন মিস্টার হারভে। 'ডেভিড, শ্রমিকদের গিয়ে ঠাণ্ডা করো। পেদ্রোকে দেখে উত্তরের মাঠে চলে আসবো আমি। আর লোকটার কথাও জানিয়ে আসবো শেরিফকে।'

'স্যার,' উঠে দাঁড়ালো কিশোর। 'শহরে গেলে আমাকেও নিয়ে যান। রকি বীচে যাবো।'

'কেন, কিশোর?' মিসেস হারভে বললেন, 'আজই যাবে কেন? আর ক'টা দিন থাকো না।'

'চলে আসবো আবার। আমাদের ডুবুরির পোশাকগুলো আনতে যাবো। কাল রাতে সৈকতের ওদিকে কয়েকটা স্পট দেখেছি। ভালো ভালো অনেক নমুনা পাওয়া যাবে, বুঝেছি। ইসকুলের ম্যারিন বায়োলজিতে ভালো নম্বর তুলতে পারবো।'

হাঁ করে ওর দিকে চেয়ে রয়েছে রবিন আর মুসা। ম্যারিন বায়োলজি ওদের বিষয় নয়। কিন্তু কিছু বললো না। কোনো কারণ ছাড়া যে মিথ্যে বলে না কিশোর, জানা হয়ে গেছে এতোদিনে।

'কিন্তু রকি বীচে তো আজ যেতে পারবো না...'

'যেতে হবে না, স্যার। আমি বাসে চলে যাবো।'

'বেশ। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও।'

রবিন আর মুসার দিকে চেয়ে হাসলেন মিসেস হারভে। 'পালের গোদাই তো চলে গেল। সময় কাটাবে কি করে? যে ঝামেলা বাধলো, মিস্টার হারভে আজ র‍্যাঞ্চের কাজ দেখানোর সময় পাবেন না।'

'দেখি, ব্যবস্থা একটা করে নেবো সময় কাটানোর,' রবিন বললো।

দুই সহকারীকে ইশারা করে বেডরুমে চলে এলো কিশোর। রবিন আর মুসা এলে বললো, 'আমি চলে গেলে তোমরাও সানতা কারলায় যাবে। বড় দেখে এক ডজন মোম কিনবে। আর তিনটে মেকসিকান সমব্রেরো হ্যাট। কোথায় যাচ্ছো জানতে চাইলে মিসেস হারভেকে যা হোক একটা কিছু বলে দেবে।'

'হ্যাট দিয়ে কি হবে?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'দরকার আছে, এখন বলার সময় নেই। রবিন তারপর পাবলিক লাইব্রেরিতে যাবে। ডেভিল মাউনটেইন আর মোনিং ভ্যালির সমস্ত ইতিহাস জানার চেষ্টা করবে।'

'ঠিক আছে, জানলাম। কিন্তু তুমি রকি বীচে যাচ্ছো কেন?'

'বললাম না, স্কুবা ইক্যুইপমেন্ট আনতে। তোমাদেরগুলোও নিয়ে আসবো। আর লস অ্যাঞ্জেলেসে গহনার দোকানে গিয়ে দেখিয়ে আনবো হীরাটা।'

নিচে থেকে ডাকলেন মিস্টার হারভে, 'কিশোর, তোমার হয়েছে?'

দ্রুত নেমে এলো তিনজনে। পিকআপ ট্রাকে মিস্টার হারভের পাশে ব্যাগ নিয়ে উঠে বসলো কিশোর। ওর চলে যাওয়া দেখছে রবিন আর মুসা। ডুবুরির পোশাক দিয়ে কি করবে গোয়েন্দাপ্রধান, কিছুই বুঝতে পারছে না দু'জনে।

যেচে এসে রান্নাঘরে মিসেস হারভেকে সাহায্য করলো রবিন। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই মহিলাটি পটিয়ে তাঁর লাইব্রেরি কার্ডটা ধার নিয়ে নিলো। তারপর বেরিয়ে এসে সাইকেল নিয়ে সানতা কারলায় চললো সে আর মুসা।

'দেখো, সাবধানে যেও!' পেছন থেকে ডেকে বললেন মিসেস হারভে।

'মহিলা সত্যি খুব ভালো,' চলতে চলতে বললো মুসা।

'হ্যাঁ,' হাসলো রবিন। 'জোর করে খাবার তুলে দেন তো পাতে...'

'আরে না, সেজন্যে না। আসলেই ভালো...'

কথা বলতে বলতে চলেছে দু'জনে। উপত্যকার ভেতর দিয়ে পাহাড়ের গা ঘেঁষে, কখনও বা দূর দিয়ে ঘুরে গেছে পথ। তিন দিক থেকে ঘিরে রয়েছে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার বাদামী পর্বতের সারি, আরেক ধারে সাগর। কড়া রোদ। সাগরের তীরে বাতাস বেশ ঠাণ্ডা, সরে গেলেই ভীষণ গরম। প্রতিটি পাহাড়ের চূড়া খটখটে শুকনো, আর্দ্রতার লেশমাত্র নেই। সানতা কারলা নদীর ওপরে চওড়া ব্রীজ। নিচে নদীর বুকে শাদা বালি, পানি নেই। গরমে শুকিয়ে গেছে। ভেজা মৌসুমে কিছু কিছু

তৃণলতা জন্মেছিলো, জীবন ধারণের প্রচণ্ড চেষ্টায় সেগুলো এখন ধুঁকছে।

ধীরে ধীরে উঠে চলেছে পথ। স্যান মেটিও গিরিপথে ঢুকলো ওরা। দুর্গম পথ, মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ মোড়। চালানোর চেয়ে সাইকেল ঠেলে নেয়া সহজ। তা-ই করলো দু'জনে। বাঁয়ে পর্বতের খাড়া ঢাল, ডানে হাঁ করে রয়েছে যেন কালো গিরিখাত। মাথার ওপরে গনগনে সূর্য।

অনেকক্ষণ পর ঘামতে ঘামতে গিরিপথের বাইরে বেরিয়ে এলো ওরা।

'খাইছে! দেখো দেখো!' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা।

থমকে দাঁড়ালো রবিন। বিপুল বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো সামনের দিকে।

এ-রকম দৃশ্য খুব কমই দেখেছে ওরা। ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে গেছে পর্বতের ঢাল, ছোট একটা পাহাড়ের গোড়ায় গিয়ে মিশেছে। তার ওপারে ছড়ানো তৃণভূমি, ঘন নীল প্রশান্ত মহাসাগরকে গিয়ে ছুঁয়েছে। এক ধারে সানতা কারলা শহর, ঝলমল করছে রোদে। দূর থেকে ঘরগুলোকে দেখাচ্ছে বিশাল এক সবুজ চাদরের মাঝে দেশলাইয়ের রঙিন বাক্সের মতো। সাগরের পানিতে নানারকম জাহাজ, নৌকা চলাচল করছে। আর, বহুদূরে, পার্বত্য চ্যানেল আইল্যাণ্ডস যেন ভেসে আছে সাগরের ওপর।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে দু'জনে। পেছনে শোনা গেল ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। প্রায় একই সঙ্গে ঘুরলো ওরা। জোরে ছুটে আসছে মস্ত এক কালো ঘোড়া। রূপার কাজ করা লাগাম, 'চ্যারো' জিনটাতেও রূপার কাজ। জিনের ধাতব পোমেল হর্ন-এ রোদ চমকাচ্ছে।

পাথর হয়ে গেছে যেন ছেলেরা। পা নড়াতে পারছে না। ওদের দিকেই ছুটে আসছে ঘোড়াটা। পিঠে আসীন ঘোড়সওয়ারের ছোট্ট শরীর, মাথায় কালো সমব্রেরো হ্যাট, কালো চোখের নিচে নাক-মুখ ঢাকা কালো কাপড়ে, গায়ে কালো খাটো জ্যাকেট, পরনে কালো আঁটো প্যান্টের নিচের ঢোলা অংশ উড়ছে চকচকে বুটের ওপর। হাতের পুরনো পিস্তলটা তাক করে ধরেছে ছেলেদের দিকে।

হেনরি ফিগারো!

নয়

অনেক দেরিতে আতঙ্কিত ছেলেদুটোকে চোখে পড়লো যেন ঘোড়াটার। হঠাৎ ব্রেক কষে থামলো, সামনের দুই পা শূন্যে তুলে তীক্ষ্ণ ডাক ছাড়লো।

ঘোড়াটাকে সামলালো আরোহী। হাতের পিস্তল নাচিয়ে ছেলেদের বললো, 'ভিভা ফিয়েসতা!' একটানে নামিয়ে দিলো মুখের কালো কাপড়। এক কিশোর, দুষ্টুমি ভরা চেহারা। 'ফিয়েসতা দেখতে এসেছো? এসো।' বলেই ঘোড়ার লাগাম

ধরে টানলো। খটাখট করে চললো হাইওয়ে ধরে, সানতা কারলার দিকে।

'কি বললো ব্যাটা?' সেদিকে তাকিয়ে বললো মুসা।

'ভিভা ফিয়েস্তা। ওই তোমরা "ঈদ মোবারক" বলো না, অনেকটা ওরকম। আজ বোধহয় সানতা কারলায় ফিয়েসতা হচ্ছে। ভালোই হলো। অনেক দিন থেকে দেখার শখ।'

'ফিয়েসতার জন্যে ওরকম পোশাক পরেছে!' গুঙিয়ে উঠলো মুসা। তাদেরই বয়েসী একটা ছেলে এভাবে ভয় পাইয়ে দিয়ে গেল, মেনে নিতে পারছে না।

'ফিয়েসতায় গেলে ওরকম অন্তত আরও দশটা হেনরি ফিগারোকে দেখতে পাবে, বাজি ধরে বলতে পারি।'

'থাকুক। কোনো কানাগলিতে ওদের সামনে পড়তে চাই না আমি।'

আবার সাইকেলে চাপলো ওরা। নেমে চললো আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ ধরে। প্যাডাল ঘোরানোর দরকারই পড়লো না। তীব্র গতিতে নেমে চলে এলো শহরের কিনারে। পাহাড় ওখানে শেষ।

প্যাডাল করে চললো ওরা। দু'ধারে বাড়িঘর, গলফ খেলার মাঠ, বড় বড় সপিং সেন্টার।

পথে একটা লোককে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, লাইব্রেরিটা শহরতলীতে। চলে এলো ওরা ওখানে। সাইকেল পার্ক করার নির্দিষ্ট জায়গা আছে। ওখানে রেখে হেঁটে এগোলো সানতা কারলার প্রধান সড়ক ইউনিয়ন স্ট্রীট ধরে। বেশি দূর যেতে পারলো না। ব্যারিয়ার দিয়ে ব্লক করে দিয়েছে পুলিশ, ফিয়েসতা প্যারেডের জন্যে। ব্যারিয়ারের ওধারে ইতিমধ্যেই সারি দিয়ে দাঁড়াতে শুরু করেছে লোকে, প্যারেডে অংশ নিতে এসেছে যারা। বেশির ভাগেরই পরনে পুরনো আমলের স্প্যানিশ পোশাক, চোখ ধাঁধানো রঙ। আনন্দঘন পরিবেশ।

তাড়াতাড়ি কেনাকাটা সেরে নিলো দুই গোয়েন্দা। পথের ধারে ছোট একটা দোকানেই পাওয়া গেল মোম আর খড়ের তৈরি সমব্রেরো হ্যাট। তারপর ছুটে এলো আবার পথের মোড়ে, ব্যারিয়ারের কাছে, প্যারেড দেখার জন্যে।

শুরু হলো প্যারেড। ধিড়িম ধিড়িম বেজে উঠলো ড্রাম, সেই সাথে পাল্লা দিলো যেন ট্রাম্পেটের কড়া, মিষ্টি চিৎকার।

ব্যাণ্ডের পর এলো ফ্লোট। ফুলে ফুলে সাজানো। সুন্দরী মেয়েরা রয়েছে তাতে, আর নানারকম বিচিত্র পোশাক পরা পুরুষ। ক্যালিফোর্নিয়ার ইতিহাসের এক অসাধারণ মুহূর্ত তুলে ধরা হয়েছে ফ্লোটগুলোতে। প্রথম ফ্লোটটা তৈরি হয়েছে ফাদার জুনিপারো সেরা-র সম্মানে। ক্যালিফোর্নিয়া উপকূলে পুরনো যতোগুলো চমৎকার মিশন রয়েছে, তার বেশির ভাগেরই প্রতিষ্ঠাতা এই মহৎ ফ্রানসিসকান মিশনারি। আরেকটাতে দেখানো হয়েছে, মেকসিকানদের কাছ থেকে সানতা

কারলা দখলের পর সেখানে আমেরিকান পতাকা উত্তোলন করছেন জন সি. ফ্রেমন্ট। আরেকটাতে রয়েছে হেনরি ফিগারো (এই রকম চরিত্রের একজন লোক সত্যি ছিলেন। তাঁর নাম জ্যাসপার ওরটেগা জেসাস ডি ডেলগাডো ওয়াই ক্যাবরিলো)। পাঁচজন সেজেছে হেনরি ফিগারোর সাজে, তার মাঝে সেই ছেলেটাকেও দেখতে পেলো দুই গোয়েন্দা, গিরিপথে যে তাদেরকে চমকে দিয়েছিলো।

এলো অশ্বারোহী মাউন্টেড পুলিশ বাহিনী। ঘোড়াগুলো অপূর্ব। ওরকম একটা ঘোড়ার মালিক হতে না পারায় আফসোস হলো মুসার। প্যালোমিনো জাতের, প্রায় সোনালি গায়ের রঙ, যেন তেল চুঁইয়ে পড়ছে শরীর থেকে।

তাদের পেছনে এলো পুরনো আমলের ঘোড়ায়-টানা গাড়ির বহর, ওয়াগন, স্টেজকোচ, এইসব। সব শেষের ফ্লোটটা গোল্ড রাশ (স্বর্ণ-সন্ধান) যুগের প্রতিচ্ছবি।

মুসার হাত খামচে ধরলো রবিন। 'দেখো দেখো।'

পাশের দু'জন লোককে দেখালো সে। একটা খচ্চরের পাশে হাঁটছে। জানোয়ারটার পিঠে চাপিয়েছে খাবার, বেলচা, গাঁইতি, আর খনি খোঁড়ার অন্যান্য সরঞ্জাম। দুজনের একজনকে চেনে ওরাঃ বুড়ো ডিন মারটিন।

'আরেকজন নিশ্চয় তার দোস্ত,' মুসা বললো। 'কার্ল বেইরি।'

এই ফ্লোটটা দেখে বেশ মজা পেলো জনতা। এমনভাবে সেজেছে মারটিন আর বেইরি, একেবারে আসল প্রসপেকটরের মতো দেখাচ্ছে। খনিতে কাজ করার উপযোগী পুরনো পোশাকে বালি লেগে রয়েছে, যেন এই মাত্র বেরিয়ে এসেছে গর্ত থেকে। মাথা উঁচু করে আগে আগে হাঁটছে মারটিন, সামান্য খোঁড়াচ্ছে, বাতাসে উড়ছে তার শাদা লম্বা দাড়ি। পেছনে বেইরি। লম্বা, রোগাটে, বয়স মারটিনের মতোই, তবে দাড়ির বদলে তার রয়েছে শাদা মস্ত গোঁফ।

ব্যাণ্ড বাজছে, ফ্লোট চলেছে শহরের প্রধান সড়ক ধরে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে জনতা। হাসি-আনন্দে মুখর। এতোই তন্ময় হয়ে দেখছে দুই গোয়েন্দা, লাইব্রেরিতে যাওয়ার কথাই ভুলে গেল। একটা লোকের ওপর চোখ পড়তে চমকে উঠলো মুসা। ফিসফিস করে বললো, 'রবিন!'

রবিনও দেখলো। কয়েক ফুট দূরে সেই লোকটা। লম্বা, গালে কাটা দাগ চোখের ওপর পট্টি। প্যারেডে মনোযোগ নেই তার। উসখুস করছে। তারপর যেই একটু ফাঁক পেলো, ইউনিয়ন স্ট্রীট পেরিয়ে দ্রুত চলে গেল ওপাশে।

'এসো,' বলেই তার পেছনে ছুটলো রবিন।

বিশ ফুট দূরে দেখা গেল লোকটাকে। দ্রুতপায়ে হাঁটছে। মাঝে মাঝে থে সামনের কি যেন দেখছে।

'কারও কিছু নিয়েছে,' রবিন বললো।

'কার?'

'দেখছি না। তুমি দেখছো কাউকে?'

চোখের ওপর হাত এনে রোদ আড়াল করে, মাথা উঁচু করে দেখলো মুসা। 'না, কাউকে দেখছি না।'

লাইব্রেরির চত্বরে পৌঁছলো লোকটা। দরজার দিকে এগোলো।

'ওখানে ঢুকছে কেন!' অবাক হলো রবিন।

উঁচু ডাবল ডোর দিয়ে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা। পেছনে ছুটে গেল ছেলেরা। ভেতরে ঢুকেই থেমে গেল। ফিয়েসতার দিনে আজ লাইব্রেরি প্রায় নির্জন। অথচ লোকটাকে চোখে পড়লো না।

বিরাট হলঘর। অসংখ্য বুকশেলফের মাঝে মাঝে হাঁটাচলার জন্যে ফাঁক। ওখানে সেই লোকটা। বাইরে বেরোনোর দুটো দরজা দিয়েই বেরিয়ে দেখলো ওরা। দুটো গলি, কোনোটাতেই দেখা গেল না লোকটাকে।

'পালিয়েছে,' হতাশ হয়ে বললো মুসা।

'আগেই বোঝা উচিত ছিলো আমাদের। তাহলে একজন পেছন দিয়ে যেতে পারতাম, আরেকজন সামনে দিয়ে।'

'চোর গেলে বুদ্ধি বাড়ে। এখন আর ভেবে লাভ নেই। চলো, তোমার রিসার্চ সেরে নাও।'

আবার লাইব্রেরিতে ঢুকলো দু'জনে। লাইব্রেরিয়ানকে জিজ্ঞেস করলো রবিন, লোকাল হিস্টরির বইগুলো কোনখানে পাওয়া যাবে। হলের পাশের ছোট একটা ঘর দেখিয়ে দিলেন মহিলা। জানালেন, ক্যালিফোর্নিয়ার ইতিহাসের ওপর স্পেশাল কিছু বইও আছে ওখানে।

ছোট ঘরটায় সবে ঢুকেছে দু'জনে, একটা হাত পড়লো মুসার কাঁধে। 'বাহ্, আমাদের গোয়েন্দারা দেখছি!'

পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন প্রফেসর হারকসন। ভারি পাওয়ারের কাচের ওপাশে একটা চোখ টিপলেন। 'বিশেষ কিছু জানতে এসেছো?'

'হ্যাঁ, স্যার,' জবাব দিলো মুসা। 'মোনিং ভ্যালি সম্পর্কে।'

'গুড, গুড,' উৎসাহ দিলেন প্রফেসর। 'আমিও সে-জন্যেই এসেছি। সুবিধে হলো না। সত্যিকার ইতিহাস বলতে কিছু নেই, অধিকাংশই উপকথা, রূপকথা কিংবা কিংবদন্তী। ...তারপর, ফিয়েসতায় গিয়েছিলে?'

'গিয়েছিলাম! যা সুন্দর সুন্দর ঘোড়া না!'

অতি চমৎকার একটা উৎসব।...যাই। এখানে বসে থেকে আর লাভ নেই। তা, যাচ্ছো কিভাবে?'

'সাইকেল নিয়ে এসেছি, স্যার,' রবিন জানালো।

'বেশ। দেখা হবে, চলি,' বলে ঘুরলেন প্রফেসর।

'স্যার?' এক মুহূর্ত দ্বিধা করে জিজ্ঞেসই করে ফেললো রবিন, 'একটা লোককে দেখেছেন? চোখে কালো পট্টি?'

মাথা নাড়লেন প্রফেসর। 'না তো। কাল রাতে যাকে দেখেছিলে?'

'হ্যাঁ,' মুসা বললো।

'এখানে, এই শহরে?' চিন্তিত মনে হলো প্রফেসরকে। 'না, দেখিনি।'

প্রফেসর বেরিয়ে গেলে, কাজে বসলো দুই গোয়েন্দা। গোটা চারেক বই পেলো, যেগুলোতে মোনিং ভ্যালির উল্লেখ আছে। তবে নতুন কিছু জানা গেল না। শেষে ছোট আরেকটা বই খুঁজে পেলো রবিন। পাতাগুলো হলদে হয়ে এসেছে, কুঁচকানো। তাতে রয়েছে উপত্যকাটার পুরো ইতিহাস, একেবারে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত। ভুল তাকে ভুল জায়গায় ছিলো বইটা, সে-কারণেই বোধহয় খুঁজে পাননি প্রফেসর।

মিসেস হারভের কার্ড দেখিয়ে বইটা ধার নিলো রবিন। বাইরে বিকেলের রোদ তখনও বেশ চড়া, প্যারেড মাত্র শেষ হয়েছে। এদিক ওদিক চলে যাচ্ছে লোকেরা। মোম, বই আর হ্যাটের প্যাকেট সাইকেলের ক্যারিয়ারে রেখে চড়ে বসলো দুই গোয়েন্দা। র‍্যাঞ্চে ফিরে চললো।

নামার সময় তো আরামেই নেমেছে, ওঠার সময় কষ্ট হলো। শেষে গিরিপথের কাছাকাছি এসে আর পারলো না। সাইকেল থেকে নেমে ঠেলে নিয়ে উঠতে লাগলো।

কিছুদূর উঠে বিশ্রাম নিতে বসলো। তাকালো চ্যানেল আইল্যাণ্ডস-এর দিকে। আলো কম। দূরে এখন আবছা দেখা যাচ্ছে দ্বীপগুলো।

'ইস্, যদি যেতে পারতাম ওখানে!' মুসা বললো।

'শুনেছি, ওখানেও তৃণভূমি আছে। কাউবয়েরা গরু চরায়।'

দ্বীপের কিনারে নোঙর করে আছে নেভির নৌ-বহর।

সানতা কারলার দিক থেকে একটা গাড়ি আসছে। শব্দ কানে এলো ছেলেদের, ফিরলো না, ওরা তাকিয়ে রয়েছে সাগরের দিকে। হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠলো। প্রচণ্ড গতিতে আসছে গাড়িটা।

লাফিয়ে উঠে চরকির মতো পাক খেয়ে ঘুরলো দুজনে। গাড়ির দুই চাকা রাস্তায়, দুই চাকা রাস্তার বাইরে। সোজা তাদের দিকেই আসছে।

এক ধাক্কায় রবিনকে সরিয়ে দিয়ে নিজেও সরে গেল মুসা। ধাঁ করে তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল গাড়িটা, নাক ঘুরিয়ে উঠে পড়লো রাস্তায়। চলে যাচ্ছে।

গা বাঁচাতে গিয়ে বেশি সরে গেছে দু'জনে। ঢালের কিনারে। তাল সামলাতে

পারলো না। পিছলে, গড়িয়ে পড়তে লাগলো ঢাল বেয়ে। নিচে গভীর খাদ।

দশ

গড়িয়ে পড়ছে মুসা। চোখা পাথর আর কাঁটাগাছে লেগে কেটেছিলে যাচ্ছে চামড়া। পাগলের মতো থাবা মারছে, আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছে গাছের গোড়া, পাথর। হাত পিছলে যাচ্ছে। গাছ যেটাও বা ধরতে পারছে, তার ভর রাখার মতো শক্ত নয়, উপড়ে যাচ্ছে। আর ফুট চারেক পরেই ঢাল শেষ, তার পরে শূন্যতা। বাঁকা হয়ে থাকা বড় একটা গাছের ওপর আছড়ে পড়লো সে, সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে ধরলো গাছের কাণ্ড। 'হউফ' করে নিঃশ্বাস ছাড়লো।

দীর্ঘ এক মুহূর্ত গাছ ধরে ঝুলে রইলো সে। জোরে জোরে শ্বাস নিলো। তারপর লক্ষ্য করলো, সে একা। চেঁচিয়ে ডাকলো, 'রবিন!'

সাড়া নেই। নিচে নিঃসীম কালো খাদ হাঁ করে রয়েছে।

'রবিন!' আরও জোরে ডাকলো।

বাঁয়ে মৃদু নড়াচড়া। ঘন ঝোপের ভেতর থেকে উঁকি দিলো রবিনের মুখ। 'আমি…আমি ভালোই আছি।' দুর্বল কণ্ঠস্বর। 'কার্নিশের মতো বেরিয়ে আছে…কিন্তু পা নাড়াতে পারছি না!'

'চেষ্টা করো। খুব আস্তে।'

অপেক্ষা করছে মুসা।

নড়ছে ঝোপটা। আবার শোনা গেল রবিনের কণ্ঠ, 'হ্যাঁ, পারছি এবার। ভাঙেনি। গায়ের নিচে বেকায়দা ভাবে চাপা পড়েছিলো। ব্যথা করছে খুব।'

'ক্রল করে উঠতে পারবে?'

'জানি না। ওপর দিকে তাকাতেই ভয় লাগছে, যা খাড়া!'

'পড়লে একেবারে…,' কেঁপে উঠলো মুসার গলা, কথাটা শেষ হলো না।

'চেঁচালে কেমন হয়? কেউ না কেউ শুনতে পাবে।'

'শুরু করো।' কিন্তু চিৎকার বেরোলো না মুসার গলা দিয়ে, শুধু খসখস শব্দ। আসলে চিৎকার করলোই না। সবে মুখ খুলেছে, এই সময় ওপরে ঢালের কিনারে দেখতে পেলো একটা মুখ। নিচে উঁকি মারছে। গালে কাটা দাগ, চোখে পট্টি।

পুরো দশ সেকেণ্ড চোখে চোখে তাকিয়ে রইলো দু'জনে। তারপর সরে গেল মুখটা। দৌড়ে যাওয়া পদশব্দ, গাড়ির এঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার আওয়াজ, মেটাল বাঁধানো পথে টায়ারের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। চলে গেল গাড়িটা।

ওটার এঞ্জিনের আওয়াজ মিলাতে না মিলাতেই অন্য গাড়ির শব্দ শোনা গেল।

'চেঁচাও!' বলেই গলা ফাটিয়ে চিৎকার শুরু করলো মুসা।

পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হলো দু'জনের চিৎকার। ওপরে ব্রেক কষার শব্দ হলো। ভারি জুতোর আওয়াজ। দুটো মুখ উঁকি দিলো ঢালের কিনারে।

খানিক পরেই নেমে এলো মোটা দড়ি। কোমরে কয়েক প্যাঁচ দিয়ে মাথাটা শক্ত করে ধরে রাখলো মুসা। টেনে ওপরে তুলে নেয়া হলো তাকে।

রবিনও উঠে এলো। ভাঙা পা-টা দেখলো ভালো করে। মনে হলো, চমকেছে। দড়ি ফেলেছে যে লোকটা, সে ট্রাক ড্রাইভার। জানালো, হারভে র‍্যাঞ্চের দিকেই যাচ্ছে। ছেলেরা কোথায় যাবে শুনে নিজে থেকেই লিফট দেয়ার কথা বললো। মিনিট পনেরো পরে সাইকেল সহ র‍্যাঞ্চের গেটে নামিয়ে দিয়ে গেল তাদেরকে। ড্রাইভারকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে, হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে ভেতরে ঢুকলো ওরা।

ঘর থেকে বেরিয়ে দু'জনকে দেখে থমকে গেলেন মিসেস হারভে। 'সর্বনাশ! কি হয়েছে? এরকম অবস্থা কেন?'

বলতে গিয়ে পায়ে রবিনের আলতো লাথি খেয়ে চুপ হয়ে গেল মুসা।

'বেশি তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে সাইকেল থেকে পড়েছি,' রবিন বললো। 'ঢালে গড়িয়ে পড়লাম, গিরিপথের কাছে। পায়ে ব্যথা পেয়েছি। একজন ট্রাক ড্রাইভার তুলে এনে নামিয়ে দিয়ে গেল।'

'দেখি, পা-টা?' এগিয়ে এলেন মিসেস হারভে।

র‍্যাঞ্চের মহিলারা সাধারণত নার্সিঙের কাজে ওস্তাদ, এসব শিখতে হয় তাদের। মিসেস হারভেও ব্যতিক্রম নন। টিপেটুপে দেখে বললেন, সামান্য মচকেছে। ডাক্তার কিংবা ওষুধ লাগবে না, তবে অনেকক্ষণ বিশ্রাম নিতে হবে রবিনকে। বারান্দায় একটা চেয়ারে তাকে বসিয়ে দিয়ে গিয়ে লেমোনেড নিয়ে এলেন।

'মুসা আমান, তুমি কাজ করতে যাও,' বললেন তিনি। 'মিস্টার হারভে এখনও ফেরেননি। সামনের কোরালের ঘোড়াগুলোকে খড় খাওয়াও গিয়ে।'

'যাচ্ছি।'

চেয়ারে পা তুলে দিয়ে, আরাম করে ছায়ায় বসে লেমোনেড খেতে খেতে মুসার দিকে চেয়ে হাসছে রবিন। রোদের মধ্যে কাজ করে ঘেমে সারা হচ্ছে গোয়েন্দাসহকারী। রবিনের হাসি দেখলো, কিন্তু মন খারাপ করলো না। কাজ করতে ভালোই লাগছে তার। পেশীতে জোর বাড়ছে।

সাপারের আগে পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডের পুরনো ট্রাকটা এসে থামলো র‍্যাঞ্চ হাউসের বাইরে। ড্রাইভিং সীটে বোরিস, পাশে বসে আছে কিশোর। নামলো সে। মালপত্র নামাতে তাকে সাহায্য করলো মুসা। স্কুবা ইক্যুইপমেন্টগুলো ছাড়াও ছোট আরেকটা রহস্যময় প্যাকেট রয়েছে, ভেতরে কি বঝতে পারলো না সে।

গোলাঘরে রাখা হলো মালগুলো।

বোরিস না খেয়ে যেতে পারবে না, বলে দিলেন মিসেস হারভে।

বিশালদেহী ব্যাভারিয়ান লোকটার চওড়া কাঁধ আর হাতের পেশীর দিকে মুগ্ধ চোখে তাকালেন মিস্টার হারভে। ভাবলেন, এরকম একজন লোক র‍্যাঞ্চে থাকলে খুব সাহায্য হতো।

'র‍্যাঞ্চে কাজ করতে আপনার কেমন লাগে, বোরিস?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'আপনাকে পেলে দশজনকে ছেড়ে দিতে পারতাম।'

'আপনাদের লোক দরকার, কিশোর গিয়ে বলেছে,' জানালো বোরিস। 'কয়েক হপ্তার জন্যে আমাকে, আর আমার ভাই রোভারকে এখানে কাজ করতে দিতে রাজি আছেন মিস্টার রাশেদ পাশা।'

তাকে ধন্যবাদ দিয়ে মিস্টার হারভে বললেন, 'তার বোধহয় দরকার হবে না। গোলমালটা সাময়িক, শীঘ্রি সব ঠিক হয়ে যাবে। পেদ্রো বলেছে সে ভয় পায়নি। হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে শ্রমিকদের বোঝাবে বলে দিয়েছে।'

'তাই বলেছে বুঝি? খুব ভালো,' বললেন মিসেস হারভে।

মুখ কালো করে ফেললেন মিস্টার হারভে। 'কিন্তু ওর ফিরতে সময় লাগবে। আর এর মাঝে আবার কোনো অঘটন ঘটে গেলে কাউকে রাখা যাবে না। শেরিফও কিছু করতে পারেনি। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, হেনরি ফিগারোর কোনো ছেলেটেলে ছিলো না। পট্টিওয়ালা লোকটা কে, তা-ও জানতে পারেনি।'

'এতো উতলা হচ্ছো কেন?' সান্ত্বনা দিলেন প্রফেসর। 'ব্যাখ্যা একটা নিশ্চয় পাওয়া যাবে। আসল কারণটা জেনে ওদেরকে জানাতে পারলেই ভয় দূর হয়ে যাবে। টাইম লাগবে আরকি, এই যা।'

'জানা যে যাবে, এ-ব্যাপারে শিওর হতে পারলেও হতো,' বললেন মিস্টার হারভে।

আলোচনা চললো।

খাওয়া শেষ করে বিদায় নিয়ে ট্রাকে গিয়ে উঠলো বোরিস।

প্রফেসরও বেরোলেন। ইউনিভারসিটিতে যাবেন, একটা ক্লাস নিতে হবে। মিস্টার হারভের অনেক কাজ জমে রয়েছে র‍্যাঞ্চে। তিনিও গেলেন।

তিন গোয়েন্দা চলে এলো নিজেদের বেডরুমে।

দরজা বন্ধ করলো রবিন।

'এখন কি করা?' কিশোরকে জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'পাথরটা কি হীরা?' জানতে চাইলো রবিন।

হাসলো কিশোর। 'হীরাই। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডায়মণ্ড। দাম খুবই কম। কোথায় পেয়েছি শুনে চোখ কপালে তুললো লস অ্যাঞ্জেলেসের এক ডায়মণ্ড এক্সপার্ট।

বিশ্বাসই করতে চায় না। ওর ধারণা, ওটা আফ্রিকান পাথর। কয়েকটা টেস্ট করবে। রেখে দিয়েছে পাথরটা। বলেছে, টেস্ট সেরেই এখানে ফোন করবে।'

'খাইছে!'

'মোম আর হ্যাট এনেছো?'

'এনেছি,' বললো মুসা।

'আর মোনিং ভ্যালির ওপরে লেখা একটা বই,' রবিন বললো।

সানতা ক্লারলায় যাওয়ার শুরু থেকে সমস্ত ঘটনা কিশোরকে জানালো দু'জনে।

'গাড়িটার নম্বর দেখেছো?'

'সময় পেলাম কোথায়?' মুসা বললো। 'তবে নম্বর প্লেটটা দেখেছি এক পলক, নীল আর শাদা।'

'হুমম। মনে হচ্ছে নেভাডার রেজিস্ট্রেশন। গাল-কাটা লোকটা এসে তাকিয়েছিলো তোমার দিকে, না?'

'আমরা মরেছি কিনা দেখতে এসেছিলো হারামজাদা,' রেগে গেল মুসা। 'মেরে ফেলতো। অন্যান্য গাড়ি আসতে দেখে পালিয়েছে।'

'হয়তো,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর। 'শহরে প্রফেসরের সঙ্গেও দেখা হয়েছে, না?'

'ডিন মারটিন আর কার্ল বেইরির সঙ্গেও। তিনজনই গিয়েছিলো,' রবিন মনে করিয়ে দিলো।

'গিরিপথটা এখান থেকে দূরে নয়,' যুক্তি দেখালো কিশোর। 'র‍্যাঞ্চের কেউ গাড়ি নিয়ে চলে যেতে পারে, তাতে কয়েক মিনিটের বেশি লাগবে না।'

'তা ঠিক।'

'তবু, নেভাডার লাইসেন্স প্লেট,' আরেকবার ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর। 'এখানে কারও গাড়ি···সবারই ক্যালিফোর্নিয়ার রেজিস্ট্রেশন।'

'আমাদের অচেনা কারও কথা বলছো?' মুসার প্রশ্ন।

'হতেও পারে,' বললো রবিন। 'পট্টিওয়ালাকেই তো আমরা চিনি না।'

'হুঁ,' মাথা দোলালো কিশোর। 'চলো, কাজ শুরু করি। আমি চট করে বইটা উল্টে নিই। তোমরা গিয়ে স্কুবা ইক্যুইপমেন্টগুলো চেক করো। ট্যাংকগুলো কোনো কিছুতেই জড়িয়ে নেবে, যাতে দেখে কেউ চিনতে না পারে। সাইকেলের ক্যারিয়ারে তুলে নিও। মোমের প্যাকেট, হ্যাট, আর আমি যে পোঁটলাটা এনেছি, ওটাও নিও।'

'তোমার উদ্দেশ্যটা কি?'

'যেতে যেতে বলবো।' হাতঘড়ি দেখলো কিশোর। 'জলদি করতে হবে।

নইলে সূর্য ডোবার আগে মোনিং ভ্যালিতে পৌছুতে পারবো না। আজ রাতেই হয়তো রহস্যের সমাধান করে ফেলতে পারবো।'

আধঘন্টা পর গোলাঘরে ঢুকলো কিশোর। হাতের বইটা নাড়লো। 'জবাব বোধহয় পেয়েছি,' ঘোষণা করলো সে। 'এতে বলছে, পঞ্চাশ বছর আগে ডেভিল মাউনটেইনে খনির বেশির ভাগ শ্যাফট বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সোনাদানা কিচ্ছু পায়নি, তাই বন্ধ করেছে। সেই সময়ই বন্ধ হয়ে যায় গোঙানি।'

'তারমানে ওগুলোর কোনোটা নতুন করে খোলা হয়েছে?' রবিন বললো। 'আর ওটা দিয়ে বাতাস পাস করে বলেই শব্দ হয়।'

'সে-রকমই তো মনে হয়। তবে প্রশ্ন আছে।...যাকগে, তোমরা রেডি?'

'রেডি,' বললো মুসা।

'বেশ। হ্যাট পরো। আমাকে একটা দাও। পরে এখান থেকে বেরোবো।'

চটের বস্তায় ট্যাংকগুলো জড়িয়ে নিয়েছে। হ্যাট পরে মালপত্র নিয়ে বেরোলো তিন গোয়েন্দা। সাইকেলে চাপলো। ক্যারিয়ারে ভারি বোঝা, ঝাঁকুনি লাগলেই মাতালের মতো টলছে, বেশ কায়দা করে ব্যালান্স রাখতে হচ্ছে। সাবধানে হ্যাণ্ডেল ধরে রেখে প্যাডাল ঘোরালো ওরা।

ব্যথায় 'আঁউক' করে উঠলো রবিন।

'কি হলো? পায়ে খুব লাগছে?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

মাথা ঝাঁকালো রবিন। 'কিশোর, তোমরা যাও। আমি বোধহয় পারবো না। থেকেই যাই।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে তার দিকে তাকালো কিশোর। 'না, থাকতে হবে না, রবিন। তোমার ওই মচকানো পা সুবিধেই করে দিলো। ফাঁকি দেয়া সহজ হবে।'

'ফাঁকি?' ভুরু কোঁচকালো মুসা।

'ওই যে মিলিটারি ক্লাসিক পদ্ধতিঃ ক্যাম্পের আগুন আর গাছের কাণ্ড, দেখতে লাগে কামানের মতো,' খুব সহজ ব্যাখ্যা দিলো কিশোর, যার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলো না মুসা। 'রবিন, তোমার ইক্যুইপমেন্ট খুলে রেখে এসো। বোঝা না থাকলে সাইকেল চালাতে কষ্ট হবে না।'

চেষ্টা করে দেখলো রবিন। চালাতে পারলো। গেটের দিকে এগোলো তিনজনে। বারান্দা থেকে হাত নাড়লেন মিসেস হারভে। 'বেশি দেরি করো না কিন্তু। সাবধান থেকো।'

র‍্যাঞ্চের বাইরে এসেই মুখ ঘোরালো ওরা, মোনিং ভ্যালির দিকে চললো। সেই লোহার গেটটার কাছে পৌছে থামলো। সাইকেল আর মালপত্র লুকানো ঘন ঝোপের ভেতরে।

'শোনো,' কিশোর বললো। 'গুহায় ঢুকবো আমরা। এমনভাবে, যাতে কেউ

দেখে না ফেলে।'

'বুঝলাম,' কান চুলকালো মুসা। 'গোঙানি-ব্যাটাকে অবাক করে দেবো।'

'ঠিক। আমার ধারণা, এই মুহূর্তে তীক্ষ্ণ নজর রাখা হচ্ছে আমাদের ওপর।'

'কি করে ফাঁকি দেবো ওকে?' রবিনের প্রশ্ন।

'পানির নিচ দিয়ে যাবো। ইক্যুইপমেন্টগুলো কেন আনলাম? হিসেব করে দেখেছি, এখন জোয়ার। সৈকত আর গুহামুখটা পানির তলায়।'

'তাতে কি ওরা দেখবে না?'

দাঁত বের করে হাসলো গোয়েন্দাপ্রধান। 'ডিকয় পদ্ধতির নাম শুনেছো? তা-ই ব্যবহার করবো। আর্মিরা ব্যবহার করে। রাতে ক্যাম্পের আগুন জ্বেলে রেখে অন্ধকারে চুপি চুপি কেটে পড়ে।'

'তোমার কথাবার্তা...'

মুসাকে কথা শেষ করতে দিলো না কিশোর। 'ডেভিল মাউনটেইনের চূড়ায় বসে বাঁ-দিকের পথের নিচের অংশ দেখা যায় না, বুঝতে পেরেছি। ওখান দিয়েই নামবো।'

গেট ডিঙালো ওরা। তারপর বাঁয়ের পথ ধরে চললো। চূড়াটা চোখের আড়াল হতেই বললো কিশোর, 'থামো।' কাঁধ থেকে বোঝা নামালো। খুলতে শুরু করলো রহস্যময় পোঁটলাটা।

'আরি! এ-তো দেখি খালি পুরনো কাপড়?' মুসা বললো।

'এরকম কাপড়ই তো পরে আছি আমরা!' রবিনও অবাক।

'সে-জন্যেই তো এনেছি। ভেতরে লতাপাতা ঢুকিয়ে মানুষ বানাবো। নাও, শুরু করো। তারপর শুইয়ে রাখবো।'

দেখতে দেখতে দুটো ড়ামি তৈরি হয়ে গেল। মুসা আর কিশোরের।

'গলার ওপর সমব্রেরো ফেলে রাখলে মনে হবে মাথায় পরেছে!' ধীরে ধীরে বুঝতে পারছে মুসা।'

'হ্যাঁ,' বললো কিশোর। 'দূরে, পাহাড়ের চূড়া থেকে তা-ই মনে হবে। রবিন থাকছে এখানে। মাঝেসাঝে নড়াচড়া করবে। ওখান থেকে যে চোখ রাখছে, সে ভাববে আমরাই। সন্দেহ করবে না।'

ডামিগুলো পথের ওপর রাখা হলো। পাশে বসে রইলো রবিন। পর্বতের চূড়া থেকে যে-ই থাকুক, মনে করবে, তিনিটে ছেলে ঢালের কিনারে হেলান দিয়ে বসে সাগর দেখছে।

ঢালের আড়ালে থেকে সরু পথ বেয়ে নিচের সৈকতে নামতে লাগলো কিশোর আর মুসা। নিচে একটা সুবিধেজনক জায়গায় এসে ডুবুরির পোশাক পরে নিলো। পিঠে বাঁধলো এয়ার-ট্যাংক।

'ঢেউয়ের জোর আজ কম,' বললো কিশোর। 'সাঁতরাতে সুবিধেই হবে আমাদের।'

'পাঁচ মিনিটের বেশি লাগবে না,' বললো দক্ষ সাঁতারু মুসা। ডুবুরির পোশাক পরে পানির তলায় ডুব দেয়া তার ভারি পছন্দ।

'আমার আরেকটু বেশি লাগতে পারে।'

'এখন কথা হলো, নিচ দিয়ে পুরোটা পথ যাওয়া যাবে কিনা।'

'অসুবিধে নেই। ভেসে উঠবো। ডিকয় সাজিয়ে দিয়ে এসেছি। এদিকে নজর রাখার কথা ভাববে না কেউ।'

ব্রীদিং টিউব ঠিক করে, মুখে মাউথপীস এঁটে পানির দিকে চললো ওরা। পানিতে নেমে হারিয়ে গেল ঢেউয়ের তলায়।

এগারো

কব্জিতে বাঁধা কম্পাস দেখে দেখে এগিয়ে চলেছে কিশোর। পেছনে মুসা। শুধু সাঁতরানো ছাড়া আর কিছু করতে হচ্ছে না তাকে, ফলে পাথরের খাঁজে, আশেপাশে সাগর-জীবনের ওপর নজর দিতে পারছে।

ছুটাছুটি করছে নানারকম মাছ। একটা হ্যালিবাট, পাথরের রঙের সঙ্গে মিশে ছিলো। মুসা দেখতে পায়নি। প্রায় হাত দিয়ে ফেলেছে পাথরে, এই সময় ছিটকে উঠলো মাছটা, চমকে দিলো তাকে। তারপর রাজকীয় ভঙ্গিতে সাঁতরে চলে গেল।

মিনিট দুই পর থেমে মুখ ফেরালো কিশোর। ইশারায় হাতঘড়ি দেখিয়ে, গুহার দিকে দেখালো। বুঝলো মুসা। তার মানে এবার গুহার দিকে ফেরার নির্দেশ দিচ্ছে গোয়েন্দাপ্রধান।

আবার আগে চললো কিশোর। তার একেবারে গায়ের কাছে রয়েছে মুসা। তাই, কিশোর যখন হঠাৎ থেমে গেল, তার পায়ের ওপর এসে ধাক্কা খেলো সে।

অবাক হয়েছে মুসা। মাউথপীসের মধ্যেই গুঙিয়ে উঠলো। কেন ওভাবে থেমে গেল কিশোর? ইশারায় বাঁয়ে দেখালো গোয়েন্দাপ্রধান।

কিশোরের হঠাৎ থেমে যাওয়ার কারণ বুঝতে পারলো মুসা। বড় জোর তিরিশ ফুট দূরে কালো কি যেন একটা নড়ছে। বড়, লম্বা, কালো একটা সিগারের মতো দেখতে। হাঙর হতে পারে, কিংবা খুনী তিমি।

ধক করে উঠলো মুসার বুক। তবে ঘাবড়ালো না। স্ক্রাইভিঙের বিশেষ ট্রেনিং রয়েছে ওদের, দক্ষ ওস্তাদের কাছে শিক্ষা নিয়েছে। হাঙর হলে কি করতে হবে জানা আছে। অস্বাভাবিক যে কোনো নড়াচড়া দৃষ্টি আকর্ষণ করে হাঙরের, দেখতে

ছুটে আসে। ছুরি বের করলো দু'জনেই। যতোটা সম্ভব কম নড়াচড়া করে সরে যেতে লাগলো পাথরের কাছে, নিরাপদ কোনো খাঁজ দেখলে তার মধ্যে ঢুকে যাবে।

ছায়াটার ওপর থেকে ক্ষণিকের জন্যে চোখ সরাচ্ছে না মুসা। না, হাঙর বলে তো মনে হচ্ছে না? পেট মোচড়ানি নেই, শরীরের কোথাও সামান্যতম বাঁকা হচ্ছে না, সোজাসুজি এগিয়ে চলেছে। সাধারণ হাঙরের তুলনায় বড়। আবার খুনী তিমির চেয়ে ছোট।

মুসার কাঁধ ছুঁয়ে ইঙ্গিতে হাঙর কিনা জিজ্ঞেস করলো কিশোর। মাথা নাড়লো মুসা। দু'জনেই দেখলো, ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে ছায়াটা, মিলিয়ে গেল গভীর পানির দিকে।

আবার সাঁতরে চললো দু'জনে। পানির নিচে পাথরের ছড়াছড়ি আর ঢেউই বলে দিলো ওদেরকে, পাহাড়ের গোড়ায় পৌঁছে গেছে। সাবধানে ভেসে উঠলো। মাত্র কয়েক ফুট দূরে সুড়ঙ্গমুখটা।

মাউথপীস খুলে আগে জিজ্ঞেস করলো কিশোর, 'কি ছিলো ওটা?'

'বুঝলাম না। হাঙর না, তিমি না, কোনো জীবের মতোই লাগলো না। কিশোর, আমার ভয় লাগছে। গিয়ে বোধহয় শেরিফকে সব জানানো উচিত।'

'ভয় কি? ছায়াটা তো চলেই গেছে। দু'জনেই যখন দেখেছি, চোখের ভুল হতে পারে না। আর চোখের ভুল যখন নয়, ওটা ভূতপ্রেতও কিছু নয়।'

'কিন্তু...,' বলতে দ্বিধা করছে মুসা।

'দেখো,' বোঝালো কিশোর। 'এতোটা এসে ফিরে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। দড়ি বেঁধে নিলো কোমরে। একটা মাথা মুসার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললো, 'ধরে রাখো। আমি ঢুকছি।'

ডুব দিলো আবার কিশোর।

সূর্য ডোবে ডোবে। গোধূলির ছায়া নামছে। দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে রইলো মুসা। দুটো হ্যাঁচকা টান পড়তেই মুখে মাউথপীস লাগিয়ে সে-ও ডুব দিয়ে এগিয়ে গেল কালো মুখটার দিকে।

ঢেউ কম, ফলে ফেনাও কম। স্রোত নেই। ওয়াটারপ্রুফ ফ্ল্যাশলাইট জ্বাললো সে। ঢুকে পড়লো সুড়ঙ্গে। হাত-পায়ে ভর দিয়ে এগোনোর চেয়ে সাঁতরে চলা অনেক সহজ। দ্রুত কমে আসছে পানির গভীরতা। চওড়া জায়গাটায় চলে এলো, যেখান থেকে বাঁকা হয়ে উঠে গেছে সুড়ঙ্গ। কিশোর দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশে চলে এলো মুসা। বড় গুহাটায় ঢুকলো দু'জনে।

গোঙানি শোনা গেল।

হাসি ফুটলো গোয়েন্দাপ্রধানের মুখে। গুহার ভেতরে ঢুকে গেছে ওরা, অথচ

গোঙানি বন্ধ হয়নি।

'খাইছে!' ফিসফিস করে বললো মুসা। 'ফাঁকিটা ঠিকই দিয়ে দিলাম। ঢুকতে দেখেনি আমাদের।'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

দ্রুতহাতে ডুবুরির পোশাক খুলে ফেললো দু'জনে। পানি নিরোধক বাক্স থেকে মোম আর দেশলাই বের করে দুটো মোমবাতি ধরালো কিশোর। একটা দিলো মুসার হাতে। বললো, 'প্রতিটা সুড়ঙ্গের মুখের কাছে ধরবো এগুলো। শিখা যদি কাঁপে, বা কাত হয়ে যায়, বুঝবো বাতাস বইছে। আর না নড়লে বইছে না, তারমানে ওই সুড়ঙ্গ বন্ধ। সেটাতে ঢুকবোই না। অনেক সময় বাঁচবে তাতে।'

'দারুণ বুদ্ধি করেছো!'

একে একে সুড়ঙ্গমুখগুলো পরীক্ষা করতে লাগলো ওরা। একটা মুখের কাছে বাতি ধরতে সামান্য কাঁপলো শিখা। কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারলো না কিশোর। সরে এলো আরেকটা মুখের কাছে।

হঠাৎ একটা মুখের কাছে বাতি ধরতেই টান মেরে যেন শিখাটাকে ভেতরে ঢুকিয়ে নিতে চাইলো অদৃশ্য শক্তি, নিভেই গেল বাতিটা।

'পেয়েছি, কিশোর!' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা।

'আস্তে! কাছেপিঠে কেউ থাকতে পারে।'

কান পতলো দু'জনেই। পুরো আধ মিনিট স্তব্ধ নীরবতা। চেঁচিয়ে উঠেছে বলে মনে মনে নিজেকে বেশ কয়েকটা লাথি মারলো মুসা। তারপর আবার শোনা গেল গোঙানি, মৃদু, কিন্তু স্পষ্ট।

যেটার মুখের কাছে আলো নিভেছে ওই সুড়ঙ্গ দিয়েই আসছে মনে হলো। পকেট থেকে শাদা চক বের করে সুড়ঙ্গমুখের দেয়ালের পাশে একটা আশ্চর্যবোধক চিহ্ন আঁকলো কিশোর। টর্চ বের করে জ্বেলে ঢুকে পড়লো সুড়ঙ্গটায়।

ডামিগুলোর পাশে বসেই রয়েছে রবিন। পশ্চিম দিগন্তে ধীরে ধীরে সাগরের পানিতে তলিয়ে গেল যেন কমলা রঙের সূর্যটা। বেগুনী-লাল গোধূলির রঙ আকাশে, ছায়া পড়েছে সাগরে। আহত পা-টা সাবধানে নাড়লো সে।

আধ ঘন্টা যাবৎ বসে বসে নিজে নিজেই বকবক করছে। তার মনে হচ্ছে, তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কে যেন। অদ্ভুত অনুভূতি। 'স্রেফ কল্পনা' বলে জোর করে তাড়ানোর চেষ্টা করলো অনুভূতিটা, পারলো না।

অন্য দিকে মন সরানোর জন্যে মোনিং ভ্যালির ওপরে লেখা বইটা পড়তে আরম্ভ করলো। মাইন শ্যাফট বন্ধ করে দেয়ার অংশটা পড়তে পড়তে খাড়া হয়ে গেল পিঠ। আনমনে বিড়বিড় করলো, 'সর্বনাশ!'

ডিন মারটিন আর কার্ল বেইরির কথা লেখা রয়েছে। ডেভিল মাউনটেইনের পাশে একটা পাহাড়ের ঢালে বাসা বানিয়ে থাকে দু'জনে। খনির শ্যাফট বন্ধ করে দেয়ার পরে সব শ্রমিকেরা চলে গেলেও ওরা রয়ে গেল। সোনা আর হীরা খোঁজার জন্যে।

ভুরু কোঁচকালো রবিন। তাড়াহুড়ো করে পড়েছে কিশোর, বইয়ের এখান পর্যন্ত আসেনি। তাহলে নিশ্চয় জানতো ঃ ডেভিল মাউনটেইনে হীরা আছে, একথা বিশ্বাস করে মারটিন।

ঘনায়মান অন্ধকারে উদ্বেগ বাড়লো রবিনের। ডিন মারটিন সেদিন মিথ্যে বলেছে তাদের সঙ্গে। বলেছে গুহার বাইরে দিয়ে যাওয়ার সময় ভেতরে আওয়াজ শুনে দেখতে এসেছে। সেটা সম্ভব নয়। দূরত্ব অনেক বেশি ছিলো। আসলে গুহার ভেতরেই কোনো একটা সুড়ঙ্গে বা অন্য কোথাও ছিলো বুড়ো।

দ্রুত মনস্থির করে নিলো রবিন। ঢালের আড়ালে নেমে এসে পড়ে থাকা বাকি কাপড়গুলো দিয়ে আরেকটা ডামি বানালো। ওটা নিয়ে ক্রল করে এগোলো। অন্য দুটোর কাছে এনে বসিয়ে দিলো ওটাকে। আশা করলো, অন্ধকারে কিছু বুঝতে পারবে না যে চোখ রেখেছে ওগুলোরে ওপর। আবার খানিক দূর নেমে ঝোপের আড়ালে আড়ালে পাড়ে উঠলো আরেক জায়গা দিয়ে। পথের অনেক দূর দিয়ে ঘুরে রওনা হলো র‍্যাঞ্চের দিকে। মিস্টার হারভেকে জানাতে হবে সব কথা। ভীষণ বিপদে পড়তে যাচ্ছে কিশোর আর মুসা।

আহত পা নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলেছে রবিন, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব। সাইকেল বের করার ঝুঁকি নেয়নি, তাহলে চূড়ার ওপরের লোকটার চোখে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। একশো গজও যেতে পারলো না, গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ কানে এলো। কাঁচা রাস্তা ধরে গতি কমিয়ে এগিয়ে আসছে গাড়িটা, হেডলাইট নিভানো। একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো রবিন। তার কাছ থেকে পঞ্চাশ ফুট দূরে থামলো গাড়িটা।

একটা লোক নেমে প্রায় ছুটে চললো পর্বতের দিকে। পরনে কালো পোশাক। দেখতে দেখতে হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

গুড়ি মেরে এগিয়ে গাড়ির পেছনে চলে এলো রবিন। দেখলো, নেভাডার নম্বর প্লেট লাগানো।

পর্বতের গভীরে গোঙানি লক্ষ্য করে এগিয়ে চলেছে মুসা আর কিশোর। প্রথম সুড়ঙ্গ পেরিয়ে আরেকটা গুহায় ঢুকলো। আবার মোমবাতি ব্যবহার করলো। এভাবে চলে তৃতীয় গুহাটায় এসে ঢুকলো। যে ক'টা গুহায় ঢুকেছে এ-পর্যন্ত, তার মধ্যে এটা ছোট। এটাতে তিনটা সুড়ঙ্গ পাওয়া গেল, যেগুলো দিয়ে জোরালো

বাতাস বয়। আলাদা আলাদা না গিয়ে একসাথে থাকার সিদ্ধান্ত নিলো কিশোর।

প্রথম সুড়ঙ্গটা বেশ কিছু দূর এগিয়ে হঠাৎ তীক্ষ্ণ মোড় নিলো।

'সাগরের দিকে গেছে,' বললো মুসা। গন্ধ শুঁকছে বাতাসে।

'তাহলে আর এগোনোর দরকার নেই। আমি শিওর, গোঙানিটা আসে উপত্যকার দিক থেকে।' কম্পাস দেখলো। 'পুব, কিংবা উত্তর-পুবে যাওয়া উচিত।'

'এটা তো গেছে দক্ষিণ-পশ্চিমে।'

ফিরে এসে দ্বিতীয় সুড়ঙ্গটায় ঢুকে এগোলো। কিছু দূর এগিয়েই দক্ষিণ-পশ্চিমে মোড় নিলো এটাও। আবার ফিরে আসতে হলো ছোট গুহায়।

অধৈর্য হয়ে উঠেছে মুসা। 'কিশোর, এই গোলক-ধাঁধায় কি কেবল ঘুরেই মরবো?'

'মনে হয়, ঠিক পথেই এগোচ্ছি আমরা। যতোই পুবে সরছি গোঙানি বাড়ছে।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও তৃতীয় সুড়ঙ্গে ঢুকলো মুসা। বাতাস জোরালো, আওয়াজও বাড়ছে। সোজা পুবে এগিয়েছে পথটা। এক জায়গায় এসে থেমে গেল দু'জনেই। বাঁয়ের দেয়ালে মস্ত গোল ফোকর। এই সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে চলে গেছে আরেকটা সুড়ঙ্গ।

'খাইছে! এই প্রথম একটা সাইড টানেল দেখলাম।'

'হ্যাঁ,' আলো ফেলে দেখছে কিশোর। 'এটা মানুষের তৈরি। মাইন শ্যাফট। বন্ধ করা হয়নি। দেখো দেখো!'

বাতাসে বাইরের দিকে কাত হয়ে যাচ্ছে তার হাতের মোমের শিখা। 'এর অর্থ কি?' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে কণ্ঠ। 'সাইড টানেলটা থেকে আরেকটা সুড়ঙ্গ বেরিয়েছে। নিশ্চয় খনিতে ঢোকার পুরনো কোনো পথ নতুন করে খোলা হয়েছে।'

'তাহলে শেরিফ কেন খুঁজে পেলেন না? কিংবা মিস্টার হারভে?'

'বলতে পারবো না, মুসা,' মাথা নাড়লো কিশোর। 'কিন্তু...' হঠাৎ বড় বড় হয়ে গেল চোখ।

শব্দটা মুসার কানেও আসছে। মাটি কোপানো হচ্ছে।

'এসো,' ফিসফিস করে বলে পাশের সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়লো কিশোর।

মুসাও অনুসরণ করতে যাবে, এই সময় পেছনে শুনতে পেলো পায়ের আওয়াজ। 'কিশোর...,' বলেই চুপ হয়ে গেল।

পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে হালকা-পাতলা একজন মানুষ। কালো জ্বলন্ত চোখ। কালো সমব্রেরো, কালো জ্যাকেট, কালো শার্ট, কালো প্যান্ট, কালো জুতো। এই পোশাক পরা ঠিক এই তরুণটির ছবিই সেদিন দেখিয়েছিলেন প্রফেসর হারকসন।

হেনরি ফিগারো! বাঁ হাতে পিস্তল।

বারো

মুসার দিকে পিস্তল উদ্যত রেখে বাঁ হাতে বাতাসে থাবা মারলো যেন ফিগারো।

'চুপ থাকতে বলছে আমাদেরকে,' কাঁপা কণ্ঠে বললো কিশোর।

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানালো লোকটা। ওর তরুণ চেহারায় কোনো ভাবান্তর নেই। পিস্তল নেড়ে ইশারা করলো ওর সঙ্গে যাওয়ার জন্যে, খানিক আগে ওরা যেদিক থেকে এসেছে তার উল্টো দিকে।

উপায় নেই। আদেশ মানতে বাধ্য হলো দুই গোয়েন্দা। আরেকটা গুহায় এসে ঢুকলো। ডানে যাওয়ার ইঙ্গিত করলো ফিগারো।

হাঁটছে তো হাঁটছেই। এই সুড়ঙ্গ থেকে সেই সুড়ঙ্গে, তারপর আরেক সুড়ঙ্গে, মাঝে মাঝে গুহা। মনে হলো যুগ যুগ পেরিয়ে যাচ্ছে, অথচ হাতঘড়িতে দেখলো মুসা, মাত্র পাঁচ মিনিট পেরিয়েছে।

'থামো!' পেছন থেকে বললো ফিগারো। এই প্রথম মুখ খুললো সে। কেমন যেন, ভোঁতা, শূন্য কণ্ঠস্বর। আরেকটা গুহায় ঢুকেছে ওরা।

থামলো ছেলেরা। যতোগুলো গুহায় ঢুকেছে, তার মধ্যে সব চেয়ে ছোট এটা। বাতাস ভ্যাপসা।

'ওদিকে!' দেয়ালের খুব সরু একটা সুড়ঙ্গমুখ দেখিয়ে বললো লোকটা।

বিষণ্ন দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকালো দুই গোয়েন্দা। কিছুই করার নেই। ঢুকলো সুড়ঙ্গে। পেছনে ফিগারো। দশ কদম এগিয়ে দেখলো সামনে পাথর পড়ে পথ রুদ্ধ। ফিরে তাকালো দু'জনে।

পাথরে তৈরি যেন ফিগারোর মুখ, কোনো পরিবর্তন নেই। পিস্তল নেড়ে বাঁয়ের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিলো ওদেরকে। তারপর ঝুঁকে ইস্পাতের একটা ডাণ্ডা তুলে নিয়ে চাড় দিয়ে বড় একটা পাথর ঠেলে সরালো। ডাকলো, 'এসো!'

ফোকরের কাছে এসে ওপাশে উঁকি দিলো মুসা। অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়লো না। টর্চ জ্বালতে যাবে, এই সময় পেছন থেকে প্রচণ্ড এক ধাক্কায় হুমড়ি খেয়ে এসে পড়লো ফোকরের ভেতরে, পাথুরে মেঝেতে। তার গায়ের ওপর এসে পড়লো আরেকটা দেহ। পেছনে পাথর লাগিয়ে আবার বন্ধ করে দেয়া হলো ফোকর। ঘন কালো অন্ধকারে হতভম্ব হয়ে গেল সে।

'মুসা?' পাশ থেকে ডাকলো কিশোর।
'আছি। তবে না থাকলেই খুশি হতাম।'
'কবর দিয়ে গেল আমাদেরকে।'
'দিলো। এখন মরবো, আর কী!'

মোনিং ভ্যালির ধার ঘেঁষে র‍্যাঞ্চের দিকে এগিয়ে চলেছে রবিন। পেছনে, যেন তাকে টিটকারি মারতেই গুঙিয়ে চলেছে গুহাটা।

কিশোরের ফন্দি কাজে লেগেছে, ভাবলো সে। এতোক্ষণে গুহায় ঢুকে গেছে ওরা, অথচ আওয়াজ বন্ধ হয়নি। তবে খুশি হতে পারছে না রবিন। বইটা পড়ার পর থেকেই দুশ্চিন্তা হচ্ছে, সফল হতে পারবে না কিশোর। ওই গোঙানির সঙ্গে মারটিন আর বেইরির কোনো সম্পর্ক থাকলে বিপদে পড়বে কিশোর-মুসা।

তারপর রয়েছে সেই লোকটা, যার গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নেভাডায়। কে সে? লোকটা চলে যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছে রবিন, কিন্তু সে ফেরেনি। কিশোর আর মুসার বিপদের ভাবনা না থাকলে আরও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারতো।

মোনিং ভ্যালিকে অনেক পেছনে ফেলে এসে তারপর পথে ওঠার ঝুঁকি নিলো রবিন। পথ ভালো হওয়ায় চলার গতিও বাড়াতে পারলো। যতোই আগে বাড়ছে, পেছনে কমে আসছে গোঙানি। তারপর কানে এলো এঞ্জিনের শব্দ।

কাছেই একটা ঝোপ দেখে তাড়াতাড়ি গিয়ে ওটার ভেতরে লুকালো রবিন।

সামনে দিয়ে ছুটে চলে গেল গাড়িটা। চালকের মুখ দেখতে পেলো না, স্টিয়ারিং হুইলের ওপর নামিয়ে রেখেছে। তবে মাথার সমব্রেরো চিনতে পারলো। আর গাড়ির নম্বর প্লেট, নেভাডার।

ব্যাপার কি? এতো তাড়াহুড়ো কেন লোকটার? পাহাড়ের ভেতরে কি করে এসেছে? একটা অশুভ চিন্তা বার বার মাথা তুলতে চাইছে, জোর করে দাবিয়ে রাখছে ওটাকে রবিন। ঝোপ থেকে বেরিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতেই দৌড় দিলো র‍্যাঞ্চের দিকে।

লোকটাকে দেখতে পেলো না। পাশ থেকে হঠাৎ করেই এসে দাঁড়িয়েছে পথে। তার গায়ের ওপর দিয়ে পড়লো রবিন। 'আঁউক' করে উঠলো। কঠিন হাত কাঁধ চেপে ধরলো তার।

মুখ তুললো রবিন। সেই লোকটা! গালে কাটা দাগ। চোখের ওপর পট্টি।

অন্ধকারে বসে রয়েছে মুসা আর কিশোর। মাঝে মাঝে এখনও কানে আসছে গোঙানি, দূর থেকে, মৃদু।

'দেখছো কিছু?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'কিচ্ছু না। আমরা পাগল হয়ে যাচ্ছি...,' পাগলের মতোই হা হা করে হেসে উঠলো কিশোর।

'হাসির কি দেখলে?'

'হাসবো না? বদ্ধ জায়গায় বসে আছি, অথচ কেউ শুনে ফেলবে সেই ভয়ে ফিসফিস করে কথা বলছি। সঙ্গে টর্চ রয়েছে, জ্বালছি না। মাথা খারাপ হয়নি তো কি?'

টর্চ জ্বেলে একে অন্যের দিকে চেয়ে হাসলো। কেমন বোকা বোকা দেখালো দু'জনের হাসিই। তারপর দেয়ালে আলো ফেললো মুসা।

'বেরোবে কিভাবে?' প্রশ্ন করলো সে।

'ঠেলেঠুলে দেখবো প্রথমে পাথরটা সরানো যায় কিনা,' সহজে হাল ছাড়ে না কিশোর। 'ফিগারোকে দেখে তো মনে হলো না তার গায়ে তেমন জোর আছে। অথচ সহজেই সরালো।'

ঠেলা দিয়ে দেখলো মুসা। নড়লো না পাথর। কিশোরও হাত লাগালো। গায়ের জোরে ঠেলা দিলো দু'জনে। নড়লো না পাথরটা। হাঁপাতে হাঁপাতে সরে এলো ওরা।

'বাইরে থেকে কিছু দিয়ে আটকে দিয়েছে,' কিশোর বললো। 'ঠেলে লাভ হবে না।'

'তাহলে আর কি? দারুণ একখান কর্ম করে গেছে! ব্যাটা কি আসলেই হেনরি ফিগারো? প্রফেসর হারকসনের তো ধারণা, ফিগারো বেঁচে আছে।'

'হয়তো আছে। তবে দেখে ওকে ফিগারোর মতো লাগলো না। ভুলে যাচ্ছো, ওর বয়স এখন প্রায় একশো হওয়ার কথা। অথচ যে আমাদেরকে আটকে গেল, সে একেবারে তরুণ, যেন সেই উনিশ শো আট সালের ফিগারো।'

'তাই তো!'

'তাছাড়া, লক্ষ্য করেছো, তার চেহারার কোনো রকম পরিবর্তন হয়নি? কথা বলার সময় মুখ নড়ে না, কাঁপে না, এরকম মানুষ দেখেছো কখনও?'

'দেখিনি। কিন্তু...'

'ব্যাটা মুখোশ পরে এসেছিলো। রবারের ওরকম মুখোশ কিনতে পাওয়া যায়, পরলে আসলের মতোই দেখায়। কথাও বলেছে সে খুব কম। হয়তো ভয়, গলা চিনে ফেলবো আমরা।'

'আমি চিনতে পারিনি। তুমি?'

'আমিও না। তবে একটা ব্যাপার শিওর, আমাদের ক্ষতি করার ইচ্ছে ছিলো না। তাহলে এখানে আটকে রেখে যেতো না।'

'নেই মানে কি বলছো? জ্যান্ত কবর দিয়ে রেখে গেছে, এরচে বেশি আর কি করবে?'

'আরও অনেক কিছুই করতে পারতো। এখানে আমরা মরবো না। আগে হোক পরে হোক, আমাদেরকে খুঁজে বের করা হবেই। এবং এটা সে জানে। বাতাস আছে এখানে। দম বন্ধ হয়ে মরছি না। কোনো কারণে কিছুক্ষণের জন্যে আটকে দিয়েছে আমাদেরকে, যাতে কাজ সারতে পারে। কাজেই খুব তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে আমাদেরকে।'

'পারবো? তার চেয়ে চুপ করে বসেই থাকি। কেউ এসে খুঁজে বের করুক।'

'রহস্যের সামাধান করতে চাইলে আজ রাতের মধ্যেই করতে হবে। বসে থাকলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। যেদিক দিয়ে ঢুকেছি সেদিক দিয়ে বেরোতে পারবো না, অন্য দিক দিয়েই চেষ্টা করে দেখি। এসো।'

সরু পথে কিশোরকে অনুসরণ করলো মুসা। চলেছে তো চলেছেই, সুড়ঙ্গ আর শেষ হয় না। অন্য কোনো সুড়ঙ্গও বেরোয়নি ওটা থেকে। ওদের মনে হলো মাইলের পর মাইল পেরিয়ে এসেছে। হঠাৎ, থমকে দাঁড়ালো ওরা। সামনেও পথ রুদ্ধ, পাথর পড়ে।

'খাইছে! এবার? এবার কি করবো?'

'এরকম ভাবে আটকা পড়বো ভাবিনি,' এই প্রথম সামান্য উদ্বিগ্ন মনে হলো গোয়েন্দাপ্রধানকে।' ঝুঁকে পাথরগুলো ভালো করে দেখলো সে। উত্তেজিত হয়ে উঠলো। 'মুসা, এই বড় পাথরটা সরানো হয়েছিলো!'

ঝুঁকে মুসাও দেখলো। দেয়ালে ঘষার দাগ রয়েছে। একমত হলো কিশোরের সঙ্গে। দু'জনে মিলে আবার পাথরটা সরানোর চেষ্টা করলো। পারলো না। গর্তের মুখে এমনভাবে বসানো, হাত দিয়ে চেপে ধরার উপায় নেই, জোর পাওয়া যায় না, ফলে টেনে বের করা যায় না।

'এই সুড়ঙ্গ নিশ্চয় লোকটার চেনা,' চারপাশে আলো ফেলে দেখছে কিশোর। 'ঢোকে, বেরোয়। নিশ্চয় কোনো ডাণ্ডা-টাণ্ডা দিয়ে চাড় দিয়ে···ওই যে, ডাণ্ডাটা। ওই তো, দেয়ালের ধারে।'

তুলে আনলো মুসা। ডাণ্ডার মাথাটা চ্যাপ্টা, অনেকটা শাবলের মতো। গর্তের মুখে বসানো পাথরের ফাঁকে সহজেই ঢুকে গেল চ্যাপ্টা মাথাটা। জোরে চাড় দিতেই খুলে এলো পাথর। বেরিয়ে পড়লো কালো ফোকর। হাঁটু গেড়ে বসে ওপাশে আলো ফেললো কিশোর। 'আরেকটা গুহা মনে হচ্ছে।'

হামাগুড়ি দিয়ে গুহাটায় ঢুকে পড়লো দু'জনে। সামনের দিকে আলো ফেলেই স্থির হয়ে গেল।

গুহার মাঝখানে বিরাট এক খাঁড়ি!

তেরো

টর্চের আলোয় চিকচিক করছে খাঁড়ির কালো পানি।

ঢোক গিললো মুসা। 'এখানেই তো বাস করেন বুড়ো মানুষটা!'

তার কথা যেন কানেই ঢুকলো না কিশোরের। 'তাহলে পুকুর একটা সত্যিই আছে। ইণ্ডিয়ানদের কথাই ঠিক।'

'চলো, ভাগি!'

'খাঁড়ি আছে বলেই যে বুড়ো মানুষটাও থাকবে, এমন কোনো কথা নেই।'

'একটা কথা যখন সত্যি হয়েছে, আরেকটাও হতে পারে। কে জানে, অনেক দিন ধরে হয়তো আটকা পড়ে আছেন জনাব বুড়ো মানুষটা। হয়তো সাংঘাতিক খিদে পেয়েছে তাঁর। ধরতে পারলে কোঁৎ করে গিলে ফেলবেন আমাদেরকে।'

গুহার দেয়ালে আরেকবার আলো ফেলে দেখলো কিশোর। অনেকগুলো সুড়ঙ্গমুখ রয়েছে। 'দেখি, বেরোনোর পথ মেলে কিনা। মোম জ্বালো।'

দুটো মুখ পরীক্ষা করা হলো। আরেকটা মুখ দেখতে এগোচ্ছে মুসা, কিশোরের ডাকে চমকে ফিরে তাকালো। প্রথমে কিছুই চোখে পড়লো না।

'ওই যে দেখো...,' ফিসফিস করে বললো কিশোর। 'ওই যে...'

মুসাও দেখলো। খানিক আগে দ্বিতীয় যে সুড়ঙ্গটা পরীক্ষা করেছে, তার ভেতরে একটা খাঁজের মধ্যে বসে রয়েছে একটা ছোট্ট মানুষ। কালো পোশাক। কালো সমব্রেরো। কালো বুট। হাতে পুরনো আমলের একটা পিস্তল। তাদের দিকে তাকিয়ে যেন হাসছে।

পিস্তল ধরে রাখা হাতটা জীবন্ত নয়, আঙুলের পাঁচটা হাড় শুধু, তাতে মাংস নেই। কঙ্কাল!

'আল্লাহরে!' বলে চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। ঘুরে দিলো দৌড়। যে সুড়ঙ্গ দিয়ে গুহায় ঢুকেছে, আবার গিয়ে ঢুকলো ওটাতে।

কিশোরও ছুটলো তাঁর পেছনে। ডাকলো, 'আরে থামো থামো, শোনো! কোথায় যাচ্ছো?'

থামলো মুসা। মাথায় হাত দিয়ে ধপ করে বসে পড়লো মেঝেতে।

কিশোরও বসলো তার পাশে। 'বেশি আতঙ্কিত হলে মাথার ঠিক থাকে না, ঠিকমতো কাজ করতে পারে না ব্রেন। এ-ধরনের পরিবেশে এই পরিস্থিতিতে এরকম হওয়াটাই অবশ্য স্বাভাবিক। স্নায়ুকে উত্তেজিত করে নার্ভাস করে দেয়

মানুষকে। অথচ, ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো, ওটা অতি সাধারণ একটা কঙ্কাল...'

'দূর!' অধৈর্য হয়ে হাত নাড়লো মুসা। 'তোমার লেকচার থামাবে দয়া করে?'

'ওই কঙ্কালটা পরীক্ষা করে দেখা দরকার।'

'পারলে করোগে তুমি। আমি যাচ্ছি না।' বললো বটে মুসা, কিন্তু কিশোর রওনা হতেই উঠে সুড়সুড় করে চললো তার পেছনে, যেন দেহের সঙ্গে ছায়া।

দ্বিতীয় সুড়ঙ্গে ঢুকলো দু'জনে।

সমব্রেরোটায় আঙুল ছোঁয়ালো কিশোর, ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়লো ওটা।

'খাইছে!' সাহস বাড়লো মুসার। কালো জ্যাকেটটা ধরতে গেল। পোড়া কাগজের ছাইয়ের মতো কাপড়ের ওই অংশটা ঝরে পড়ে গেল কঙ্কালের শরীর থেকে। পিস্তল ধরা আঙুলগুলোতে হাত বোলাতে গেল সে। খসে পড়লো হাড়, খটাং করে পাথুরে মেঝেতে পড়লো পিস্তলটা। দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে অস্বাভাবিক শব্দ হলো। চমকে, লাফিয়ে সরে এলো মুসা।

ঝুঁকে দেখছে কিশোর। 'অনেক পুরনো কঙ্কাল...ওই পিস্তলটাও...মুসা, আর কোনো সন্দেহ নেই।'

'কিসের সন্দেহ?'

'কঙ্কালটা হেনরি ফিগারোর। আসলে ফিগারো,' তার কথা বিচিত্র প্রতিধ্বনি তুললো গুহার উঁচু ছাতে বাড়ি খেয়ে। যেন বহু দূর থেকে আসা কোনো ভূতুড়ে কণ্ঠস্বর।

'আসল ফিগারো? তারমানে এতোগুলো বছর এখানেই ছিলো সে, অথচ কেউ দেখেনি?'

'তাই তো মনে হয়। যে রাতে এই গুহায় ঢুকেছিলো, হয়তো সে-রাতেই মারা গিয়েছিলো হতভাগ্য মানুষটা,' বিষণ্ন শোনালো কিশোরের কণ্ঠ। 'কেউ ভাবতেই পারেনি তার আঘাতটা ছিলো মারাত্মক। তবে, সেকালে এমন সব আঘাত, এমন সব রোগে মানুষ মারা যেতো, যেগুলোকে আজকাল কেয়ারই করি না আমরা। মেডিক্যাল সাইন্সের অসাধারণ উ...'

'সে-রাতেই মারা গেছে কি করে বুঝলে?' বাধা দিয়ে বললো মুসা। 'এমনও হতে পারে, অনেক দিন বেঁচে ছিলো ফিগারো। এখানেই বাস করেছে। তারপর একদিন মারা গেছে।

মাথা নাড়লো কিশোর। 'না, আমার তা মনে হয় না। দেখো, কঙ্কালটার ধারেকাছে কোনো খাবারের চিহ্ন নেই। পানিও খেতে পারেনি বেচারা। গিয়ে টেস্ট করে দেখতে পারো, পুকুরের পানি নোনা।'

'অন্য কোথাও বসে খেয়েছে হয়তো।'

'হয়তো। কিন্তু তাহলে কি কারণে মারা গেল? কেউ হামলা চালিয়ে মেরে

রেখে গেলে তারও চিহ্ন থাকতো। ধস্তাধস্তি কিংবা অন্য কিছু···অন্তত আরও দু'য়েকটা কঙ্কাল পড়ে থাকতো।'

'হ্যাঁ, তোমার কথায় যুক্তি আছে।'

'আরেকটা ব্যাপার, কঙ্কালটার অবস্থান দেখো। মৃত্যুর আগে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসেছিলো। হাতে পিস্তল, তারমানে আশঙ্কা করছিলো আক্রমণ আসতে পারে। শত্রুকে পাল্টা আঘাত হানার জন্যে তৈরি হয়েছিলো। দেখি, পিস্তলটা তোলো তো।'

তুলে দেখলো মুসা। 'ভরা ম্যাগাজিন। একটা গুলিও খরচ হয়নি।'

'তারমানে শত্রু আসেনি। কেউ তাকে খুঁজে পায়নি। আর ওই আঘাতের কারণেই মারা গেছে বেচারা। একটা ব্যাপার পরিষ্কার হলো, শেরিফ আর তার লোকদের চেয়ে এসব গুহাসুড়ঙ্গ অনেক বেশি চিনতো ফিগারো।'

'না চিনলেই বোধহয় ভালো হতো। ধরা পড়তো, তার জখমের চিকিৎসা হতো।'

'কি হতো তাতে? চিকিৎসা করে ভালো করে নিয়ে গিয়ে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিতো। তার চেয়ে এই তো ভালো হলো। কিংবদন্তী হয়ে গেল হেনরি ফিগারো, তার অনুসারীদের কাছে হিরো হয়ে গেল।'

'তা হলো···'

'আর ওই কিংবদন্তী এখন কাজে লাগাচ্ছে কেউ একজন। ভয় দেখায়। যাতে গুহার কাছে কেউ না আসে। প্রশ্ন হলো, কেন?'

'হয়তো র‍্যাঞ্চ থেকে ভাগাতে চায় মিস্টার হারভেকে।'

'মনে হয় না। অন্য কোনো কারণ আছে। ভেবে দেখো, মিস্টার হারভেকে তাড়াতে চাইলে তিনি আসার পর পরই ভয় দেখাতো। অথচ গোঙানিটা শুরু হয়েছে মাত্র এক মাস আগে, তিনি আসার অনেক পরে।

'ঠিক বলেছো। আরেকটা ব্যাপার, কিশোর,' উত্তেজিত হয়ে উঠলো মুসা। 'আজকের আগে আর কেউ কেন হেনরি ফিগারোকে দেখলো না? মানে জ্যান্ত ফিগারোকে, আমরা যাকে দেখেছি? শেরিফ আর মিস্টার হারভে যখন ঢুকলেন, তখন দেখা দিলো না কেন?'

'জানি না। তবে আজই প্রথম লোক ঢোকার পরে থামলো না গোঙানি। আজ রাতে ফাঁকি দিয়ে ঢুকে পড়েছি আমরা, গোঙানি থামেনি, ফিগারোও দেখা দিয়েছে। অবশ্যই নকল ফিগারো। তারমানে এই দাঁড়াচ্ছে, তাকে দেখতে পেয়েছিই গোঙানি থামেনি বলে।'

'মানে?'

'বলতে পারবো না, মুসা। তবে শিওর হলাম, শুধু প্রাকৃতিক কারণে গোঙায়

না গুহাটা, আরও কোনো ব্যাপার আছে। কিছুক্ষণ আগে খোঁড়ার শব্দ শুনেছিলাম না? কে কি খুঁড়ছিলো দেখা দরকার।'

'তাই তো! ভুলেই গিয়েছিলাম। তোমার কি মনে হয়? সত্যি সত্যি হীরার খনি আছে এখানে?'

'খুঁড়ছে যখন, কোনো একটা ব্যাপার নিশ্চয় আছে,' ঘুরিয়ে জবাব দিলো কিশোর।

'চলো, মিস্টার হারভেকে গিয়ে জানাই।'

ভ্রূকুটি করলো কিশোর। রহস্যের সামাধান নিজে করতে না পেরে অন্য কারও সাহায্য চাওয়ার পক্ষপাতি নয় গোয়েন্দাপ্রধান। তবু কিছু কিছু বিশেষ সময়ে যখন তিন গোয়েন্দার জন্যে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে কাজ করা, সাহায্য নিতেই হয়। 'কথাটা বলেছো ঠিকই। বেশ, চলো পিস্তলটা হাতে রাখো। দেখি, বেরোনোর পথ পাই কিনা?'

আবার মোম জ্বেলে সুড়ঙ্গমুখ পরীক্ষা করতে লাগলো ওরা।

হঠাৎ পানিতে মৃদু আলোড়ন হলো, ঢেউ উঠলো। ভেসে উঠছে কি যেন!

পাঁই করে ঘুরে আলো ফেললো কিশোর। ধক করে উঠলো বুক। কালো চকচকে একটা দেহ ভেসে উঠেছে।

হাঁ হয়ে গেল দুই গোয়েন্দা।

চকচকে কালো জীবটা উঠে আসছে খাঁড়ির পাড়ে। পানি ঝড়ছে পিচ্ছিল চামড়া থেকে।

চোদ্দ

'তোমরা এখানে কি করছো?' জিজ্ঞেস করলো জীবটা।

মানুষ! পরনে কালো রবারের ওয়েট-স্যুট, পায়ে সুইম ফিন, পিঠে বাঁধা ডাবল এয়ার-ট্যাংক।

ফোঁস করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো মুসা।

বদলে গেল কিশোরের চেহারা। গম্ভীর কণ্ঠে অনেকটা বড়দের মতো করে পাল্টা প্রশ্ন করলো, 'আপনি এখানে কি করছেন, স্যার? আমরা অনুমতি নিয়েই এসেছি, র‍্যাঞ্চের মালিকের কাছ থেকে। আপনি এসেছেন পানির তলা দিয়ে, কোনো গোপন পথে। অনধিকার প্রবেশ করেছেন।'

মুখোশ খুললো লোকটা। সুন্দর চেহারা। সোনালি চুল। হাসলো কিশোরের দিকে তাকিয়ে। তারপর পিঠের এয়ার-ট্যাংক খুলে নামিয়ে রাখলো মাটিতে।

'খোকা, এমনভাবে কথা বলছো যেন নেভির অ্যাডমিরাল। অনুমতি নিয়ে এসেছো কিনা সেকথা জিজ্ঞেস করিনি। আমি অবাক হচ্ছি, এই রাত দুপুরে হেনরি ফিগারোর গুহায় কি-জন্যে ঢুকেছো?'

'অ্যাডমিরাল?' লোকটার কথার জবাব দিলো না কিশোর। 'নিশ্চয়ই! আপনি ফ্রগম্যান, না? নেভির লোক। চ্যানেল আইল্যাণ্ডস-এ নোঙর করেছে আপনাদের নৌ-বহর।'

'হ্যাঁ। একটা গোপন মিশনে এসেছি আমরা এখানে। আশা করি আমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার কথাটা গোপনই রাখবে। অস্বাভাবিক কিছু দেখেছো এদিককার পানিতে?'

'না,' জবাব দিলো মুসা।

না বলতে গিয়েও থেমে গেল কিশোর। মনে পড়ে গেল পানিতে দেখা সেই অদ্ভুত জীবটার কথা। 'দেখেছি, স্যার। তিমিও না, হাঙরও না...'

'হ্যাঁ হ্যাঁ,' মুসারও মনে পড়লো। 'আকারটা অনেকটা সিগারের মতো। সাগরের দিকে চলে গেল।'

'সাবমেরিন, মুসা!' চেঁচিয়ে উঠলো কিশোর। 'এখন বুঝতে পারছি। ওটা একটা মিজেট সাবমেরিন, বামন ডুবোজাহাজ। সে-জন্যেই শক্ত হয়ে ছিলো, চলার সময় শরীর বাঁকেনি। কিন্তু এঞ্জিনের শব্দ শুনলাম না কেন? পানির নিচে তো শব্দ অনেক দূর পর্যন্ত ছড়ায়।'

কালো হয়ে গেল ফ্রগম্যানের মুখ। 'ব্যাপারটা খুব সিরিয়াস, বুঝেছো? টপ সিক্রেট, ওই যে এঞ্জিনের শব্দ হয় না। তোমাদেরকে বোধহয় আটকাতেই হচ্ছে।'

'আটকাবেন?' প্রতিধ্বনি করলো যেন মুসা।

'নীরবে চলে,' আনমনে বিড়বিড় করলো কিশোর। 'তারমানে সোনার সিসটেম ধরতে পারে না ওটার অস্তিত্ব। মুসা, টপ সিক্রেট তো হবেই।' ফ্রগম্যানের দিকে ফিরে বললো, 'আমাদের আটকানোর দরকার নেই, মিস্টার...'

'ক্রুগার,' নাম বললো লোকটা। 'কমাণ্ডার ক্রুগার। সরি, আটকাতেই হচ্ছে। অ্যাডমিরালকে জানাবো। ছেড়ে দিলে কোনো অসুবিধে হবে না বুঝলে, তিনি ছেড়ে দেবেন।'

বোদ্ধা মানুষের মতো মাথা ঝোঁকালো কিশোর। যেন কমাণ্ডারের কথা মেনে নিলো। 'আমার নাম কিশোর পাশা। ও আমার বন্ধু মুসা আমান।' ড্রাইভিং বেল্টে ঝোলানো একটা পানিরোধক পাত্রের মুখ খুলে তাতে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনলো একটা খাম। তার ভেতর থেকে বের করলো একটা কার্ড আর একটা সার্টিফিকেট। বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'পড়ে দেখুন। বুঝতে পারবেন।'

কার্ডটা তিন গোয়েন্দার। আর সার্টিফিকেটটা লস অ্যাঞ্জেলেসের পুলিশ চীফ

ইয়ান ফ্লেচারের।

পড়লো ক্রুগার।

'একটা জরুরী কেসে জড়িয়ে পড়েছি আমরা,' জানালো কিশোর। 'এই গুহায় ঢুকেছি সে-জন্যেই। আমি শিওর, কমাণ্ডার সাহেব, আপনার অ্যাডমিরাল আমাদেরকে সাহায্য করার কথাই বলবেন আপনাকে।'

দ্বিধা করছে ক্রুগার। ছেলেটাকে মিথ্যুক মনে হচ্ছে না। কথাবার্তায় ওজন আছে, আর অপূর্ব সুন্দর কালো চোখ দুটোর পেছনে নিশ্চয় কাজ করছে ক্ষুরধার একটা ব্রেন। 'সার্টিফিকেটটা আসলই মনে হচ্ছে।

'এক কাজ করুন না,' পরামর্শ দিলো কিশোর। 'আপনার জাহাজের সঙ্গে যোগাযোগ করে বলুন, চীফ ইয়ান ফ্লেচারকে একটা ফোন করতে। জিজ্ঞেস করতে বলুন তিন গোয়েন্দার কথা। আর কোনো সন্দেহ থাকবে না আপনার।'

'কিশোর, এখান থেকে উনি কি করে যোগাযোগ করবেন?'

'এটাও জানো না। জাহাজের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকে ফ্রগম্যানদের সঙ্গে লং রেঞ্জ রেডিও থাকে।'

হাসলো কমাণ্ডার। 'সাংঘাতিক চালাক ছেলে তুমি। বেশ, বসো এখানে। আমি আসছি। বসে থাকো চুপ করে।'

গুহার অন্ধকার কোণে চলে গেল ক্রুগার। কৌতূহলী চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইলো ছেলেরা, তবে দেখতে পেলো না কমাণ্ডার কি করছে।

অবশেষে হাসিমুখে ফিরে এলো কমাণ্ডার। 'সিকিউরিটি খোঁজ নিয়েছে। তোমাদেরকে আটকাতে হবে না।'

'এতো তাড়াতাড়ি জেনে ফেললেন?' মুসা অবাক।

'দরকারের সময় এর চেয়ে তাড়াতাড়ি করতে হয় আমাদেরকে।'

'মিস্টার কমাণ্ডার,' কিশোর বললো। 'আমাদের ব্যাপারে তো অনেক খোঁজ-খবর নিলেন। এবার আমি আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?'

'আমাকে?' হেসে মাথা নাড়লো কমাণ্ডার। 'সরি, ইয়াংম্যান। জবাব দিতে পারবো না। টপ সিক্রেট...'

'আপনার কাজের কথা জিজ্ঞেস করবো না, স্যার। আমি এই গুহার ব্যাপারে কিছু তথ্য জানতে চাই। কাল রাতে আপনিই কি এসেছিলেন? যাকে দেখে ফেলেছিলো আমার এই বন্ধুটি?'

'আমি না। আমার এক কলিগ গিয়ে রিপোর্ট করেছে, তাকে নাকি কে দেখে ফেলেছে।'

'যাক,' বললো মুসা। 'একটা রহস্যের সমাধান হলো।'

'আরেকটা কথা,' আঙুল তুললো কিশোর। 'আপমারা কি গুহার ভেতরে কিছু

পরিবর্তন করেছেন? মানে, কোনো সুড়ঙ্গের মুখ খুলেছেন, কিংবা নতুন কোনো গুহা খুঁড়েছেন?'

'না।'

'এমন কিছু করেছেন, যাতে গোঙানো শুরু করেছে একটা গুহা?'

'মোটেই না। ওই গোঙানি শুনে আমরাও অবাক হয়েছি। এই এলাকায় নতুন এসেছি আমরা, আর এই গুহায়ও ঢুকেছি মাত্র কয়েকবার। ভেবেছি, সব সময়ই বুঝি ওরকম গোঙায় গুহাটা।'

'আর, নিশ্চয় আপনাদের ওপর আদেশ রয়েছে, অলক্ষ্যে কাজ করার? আই মীন, কেউ যেন আপনাদের দেখে না ফেলে?'

'নিশ্চয়ই। তবে তোমরা ছাড়া এখানে আর কেউ দেখেনি আমাদের।'

'আপনারা দেখেছেন আর কাউকে, এ গুহায়?'

মাথা নাড়লো কমাণ্ডার। 'না। বললামই তো, কেউ যাতে না দেখে ফেলে সেভাবেই থাকি আমরা।'

'বুঝেছি,' হতাশ মনে হলো কিশোরকে।

সেটা বুঝতে পারলো ক্রুগার। আর কোনো প্রশ্নের জবাব যাতে না দিতে হয় সে-জন্যে তাড়াতাড়ি বললো, 'তোমরা কি পথ হারিয়েছো? সাহায্য লাগবে?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলো মুসা। 'বেরোনোর চেষ্টাই করছিলাম। এই সময় আপনি এলেন।'

'চলো, পথ দেখিয়ে দিই। মনে রাখবে, আমাদেরকে যে দেখেছো, সাবমেরিন দেখেছো, কথাটা কাউকে বলবে না। মুখ একেবারে বন্ধ। ও কে?'

'ও কে,' বললো মুসা।

'বলবো না, স্যার, বিশ্বাস করতে পারেন,' কিশোর বললো।

'এসো আমার সাথে।'

একটা সুড়ঙ্গ ধরে আগে আগে চললো কমাণ্ডার। পেছনে দুই গোয়েন্দা। কয়েকটা গুহা, সুড়ঙ্গ, শাখাসুড়ঙ্গ পার হয়ে এসে ঢুকলো একটা বড় গুহায়। এটা সেই গুহা, যেখানে আগের রাতে আরেকজন ফ্রগম্যানকে দেখেছিলো মুসা।

'আশা করি এবার বেরোতে পারবে?'

'পারবো, স্যার। থ্যাংক ইউ,' বললো কিশোর।

হাসলো ক্রুগার। 'গুড লাক।' বলে একটা সুড়ঙ্গে ঢুকে হারিয়ে গেল।

বেরোনোর জন্যে পা বাড়ালো মুসা।

কিশোর নড়লো না। তার চোখের দিকে চেয়ে গুঙিয়ে উঠলো মুসা, 'না না, বলো না। আর পারবো না...'

'মুসা, এখন আমি আরও শিওর হয়েছি, রহস্যের সমাধান আজ রাতের মধ্যেই

করতে হবে। নকল ফিগা রা জানে, আমরা বেরিয়ে যেতে পারবোই। তার মানে সে তাড়াহুড়ো করবে। আসলে, আমাদেরকে কয়েক ঘন্টা আটকে রাখতে চেয়েছে, যাতে কাজ সেরে নিরাপদে পালিয়ে যেতে পারে।'

'আমি ওর পথের কাঁটা হতে চাই না।'

'এই আমাদের সুযোগ, মুসা,' বোঝানোর চেষ্টা করলো কিশোর। 'লোকটা আমাদের আটকে রেখে ভাবছে, আর কোনো বাধা নেই। ফলে তেমন সাবধান হবে না। আমাদের জানতেই হবে কে কি খুঁড়ছিলো, আর কেন গোঙায় গুহাটা?'

'বেশ, মানবো। চলো, গিয়ে মিস্টার হারভেকে বলে লোকজন নিয়ে আসি।'

'গুহা থেকে বেরোলেই দেখে ফেলবে আমাদেরকে। হয়তো আর যেতেই দেবে না। তাছাড়া হাতে সময়ও নেই। যা করার জলদি করতে হবে।'

'কি করবো? কোনদিকে কোথায় ঢুকবো তাই তো জানি না।'

'পথ বের করে নেবো। আমরা এখন জানি ওই খোঁড়ার সঙ্গে গোঙানির সম্পর্ক আছে।'

'কিভাবে বুঝলে?'

'শেরিফ, মিস্টার হারভে, কিংবা খবরের কাগজে কোথাও কোনো রকম খোঁড়াখুঁড়ির উল্লেখ নেই। তারমানে যে খুঁড়ছে, ব্যাপারটা গোপন রেখেছে। কোনো একটা চালাকি করে। যখনই খুঁড়তে আসে, গোঙানিটা শুরু হয়। তারমানে দুটো ব্যাপারের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে।'

'বেশ, তা নাহয় হলো। এখন আমরা কি করছি?'

'এখন তোমার অসাধারণ ক্ষমতাটা ব্যবহার করো। অন্ধকারেও যেভাবে পথ খুঁজে পাও। ওটা ব্যবহার করে সাইড টানেলটা খুঁজে বের করো।'

মাথা ঝোঁকালো মুসা। গভীর ভাবে ভাবলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো, 'কিশোর, মনে হয় উত্তর-পশ্চিমে যেতে হবে আমাদের।'

কম্পাস দেখলো কিশোর। বাঁয়ে হাত তুলে বললো, 'ওদিকে।'

'চলো।'

আবার মোম জ্বালানো হলো। মুসার অনুমান ঠিক। সুড়ঙ্গমুখে মোম ধরতেই কাত হয়ে গেল শিখা।

উত্তর-পশ্চিমে এগিয়ে চলেছে দু'জনে। শোনা গেল আওয়াজটা।

'গোঙানি!' ফিসফিস করে বললো মুসা।

'বন্ধ হয়নি।'

'কাছে এসে গেছি।'

একটা সাইড টানেলের মুখ দেখা গেল। ওটার কাছে মোম ধরতেই প্রায় নিভে যাওয়ার উপক্রম হলো বাতি, গোঙানিও জোরালো। ঢুকে পড়লো ওরা ওটাতে।

ছোট সড়ঙ্গ। বেরিয়ে এলো একটা ছোট গুহায়।

'কিশোর, কোথায় এসেছি জানি।'

'মোম নিভাও,' ফিসফিস করে বললো কিশোর। 'টর্চ জ্বালবো।'

টর্চের মুখে হাত চাপা দিলো দু'জনেই, ফলে খুব সামান্য আলো বেরোলো, মৃদু একটা আভা ছড়িয়ে পড়লো মাত্র। ওই আলোতেই পথ দেখে দেখে সেই সুড়ঙ্গে ঢুকলো মুসা, যেটা থেকে তাদের ধরে নিয়ে গিয়েছিলো নকল ফিগারো।

জোরালো হচ্ছে গোঙানির আওয়াজ।

চলে এলো আরেকটা সাইড টানেলের মুখে, আরেকবার এসেছিলো ওখানে। শোনা গেল খোঁড়ার শব্দ।

'আছে!' ফিসফিসিয়ে বললো মুসা।

'এসো!'

নিঃশব্দে শাখা-সুড়ঙ্গ ধরে এগোলো দু'জনে। লম্বা, সোজাসুজি এগিয়েছে পথ। কিছুদূর এগিয়ে আলো দেখতে পেলো। থামতে ইশারা করলো কিশোর।

সুড়ঙ্গের পাশের দেয়ালে একটা মাইন শ্যাফটের ভেতর দিয়ে আলো আসছে। মুখের কাছে স্তূপ হয়ে আছে মাটি আর পাথর. খোঁড়ার শব্দ আসছে ওই গর্তের ভেতর থেকেই।

খুব সাবধানে এগিয়ে ভেতরে উঁকি দিলো ছেলেরা। উজ্জ্বল আলো চোখ ধাঁধিয়ে দিলো তাদের। থেমে থেমে হয় গোঙানির শব্দ। থেমে গিয়েছিলো, হঠাৎ এসে যেন কানে ঝাপটা মারলো, এতো জোরে, মনে হলো কানের পর্দা ফেটে যাবে। প্রতিধ্বনি তুলতে তুলতে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল আবার।

কানে হাত চাপা দিয়ে রেখেছে মুসা।

ওর হাত ধরে টানলো কিশোর, 'দেখো!'

চোখে সয়ে এসেছে আলো। দেখলো, ঝুঁকে রয়েছে একটা লোক। হাতে বেলচা।

ঢোক গিললো মুসা।

সোজা হলো মূর্তিটা। বেলচা ফেলে দিয়ে একটা গাঁইতি তুলে নিলো। স্পষ্ট দেখা গেল তার চেহারা। শাদা চুল, শাদা দাড়ি।

বুড়ো ডিন মারটিন!

পনেরো

চুপচাপ দাঁড়িয়ে বুড়োর কাজ দেখছে দুই গোয়েন্দা। কয়েক মিনিট পর পরই কানে আঙুল দিতে হচ্ছে, গোঙানির আওয়াজের জন্যে। কিন্তু শব্দটা যেন শুনতেই পাচ্ছে

না বুড়ো। একমনে গাঁইতি চালিয়ে যাচ্ছে। গর্ত করছে একটা দেয়ালের গোড়ায়।

'মনে হয় আরেকটা পাথর ধস?' কিশোর বললো।

'বড় ধস।'

'ধসটা নতুন।'

কুপিয়ে চলেছে বুড়ো। তার শক্তি দেখে অবাক হতে হয়। এই বয়েসের একজন মানুষের এতো ক্ষমতা! কিছুক্ষণ কুপিয়ে গাঁইতি ফেলে আবার বেলচা তুলে নিলো সে।

'কিশোর! ওর চোখ দেখলে?'

দেখেছে কিশোরও। কেমন যেন বুনো দৃষ্টি। আগের রাতে 'বুড়ো মানুষটা'র কথা বলার সময়ও ওর চোখ ওরকম হয়ে গিয়েছিলো।

'স্বর্ণ-জ্বর!'

'কি বললে?' বুঝতে পারলো না মুসা।

'গোল্ড ফিভার। কিংবা এক্ষেত্রে বলতে পারো ডায়মণ্ড ফিভার। বইয়ে পড়েছি, প্রসপেক্টররা ওরকমই হয়ে যায় মাঝে মাঝে, যখন মনে করে কাছেই রয়েছে মূল্যবান ধাতু কিংবা পাথর। ওই সময় কোনো বাধাকেই বাধা মনে করে না ওরা।

'খাইছে!'

বেলচা দিয়ে খোঁড়া পাথর আর মাটি সরিয়ে কোপানোর জন্যে আবার গাঁইতি তুলে নিলো মারটিন। তারপর আবার বেলচা, আবার গাঁইতি। মাঝেসাঝে থেমে কি যেন দেখছে, হেসে উঠছে আপনমনে। কেমন যেন বন্য হাসি। বাইরে বেরিয়ে লোকের সামনে ওরকম করে হাসলে ধরে নিয়ে গিয়ে সোজা পাগলা গারদে ভরে দেবে।

বেলচা থামিয়ে বসে পড়লো আবার মারটিন। আলগা পাথর আর মাটিতে আঙুল চালালো। শক্ত হয়ে গেল শরীর। কি যেন একটা হাতে নিয়ে দেখলো লণ্ঠনের আলোয়। চকচক করে উঠলো চোখ। মাটিতে ফেলে রাখা একটা চামড়ার ব্যাগ তুলে নিয়ে তাতে ভরে ফেললো জিনিসটা।

'হীরা?' মুসা বললো।

'মনে হয়।'

ফিসফিসিয়ে কথা বলছে দু'জনে। এতই ব্যস্ত বুড়ো, ওদের কথা কানেই যাচ্ছে না।

'হীরার খনি পেলো শেষতক?'

পাথরের ধসটার দিকে চেয়ে রয়েছে কিশোর। ভাবছে। 'দেখে তো সে-রকমই লাগছে। কিন্তু…'

'আর কোনো কিন্তু নেই। হীরার খনিই পেয়েছে। আইনতঃ ওগুলোর মালিক

এখন মিস্টার হারভে। তাই চুরি করে ঢোকে বুড়ো। রাতে আসে, কাউকে জানাতে চায় না। ভয় দেখিয়ে দূরে রাখে সবাইকে।'

'হয়তো। এখন আমি জানতে চাই, গুহাটা গোঙায় কেন?'

'হ্যাঁ। এবং কেন বন্ধ হয়ে যায়।'

'মিস্টার হারভে আর শেরিফ নিশ্চয় এই শ্যাফট দেখেছেন। শুধু দেখেননি বুড়ো মারটিনকে মাটি খুঁড়তে।'

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলতে যাবে মুসা এই সময় গুহার ভেতরে ঘন্টা বাজতে শুরু করলো।

বিদ্যুৎ খেলে যেন মারটিনের শরীরে। হাত থেকে বেলচা ফেলে লাফ দিয়ে লণ্ঠনটার কাছে চলে এলো। বাতির পাশে ছোট একটা বাক্স। ঝুঁকে কি যেন করলো সে। বন্ধ হয়ে গেল ঘন্টাধ্বনি। তারপর লণ্ঠন আর চামড়ার ব্যাগটা তুলে নিয়ে ছুটে এলো শ্যাফট দিয়ে।

'কুইক!. পালাও!' বলে উঠলো কিশোর।

শ্যাফটের গোড়ায় জমে থাকা মাটি আর পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো ওরা। বাইরে বেরোলো মারটিন। সুড়ঙ্গমুখের কাছে লণ্ঠন আর ব্যাগটা নামিয়ে রাখলো।

আবার শুরু হলো গোঙানি।

তবে শেষ হতে পারলো না। মাঝপথেই বন্ধ হয়ে গেল। বিশাল একটা পাথর গড়িয়ে এনে শ্যাফটের মুখে ফেললো মারটিন। দেখে মনে হবে এখন, বহুদিন ধরে পাথরটা ওখানে ওভাবেই রয়েছে। ওটা সুড়ঙ্গমুখে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল গোঙানি।

'পাথর দিয়েই…' ফিসফিস করলো মুসা।

'হ্যাঁ। গোঙায় বাতাসের কারণে। শ্যাফটের মুখে পাথর চাপা দিলেই বন্ধ হয়ে যায়। আর ঘন্টাটা সঙ্কেত। চূড়ায় বসে যে চোখ রাখছে সে বাজিয়েছে। মনে হয় কেউ গুহায় ঢুকতে আসছে।'

অস্থির ভাবে সুড়ঙ্গে পায়চারি শুরু করলো বুড়ো। বিড়বিড় করছে। ছেলেরা যেখানে লুকিয়ে রয়েছে, সেদিকে চোখ তুলে তাকালো না একবারও। হঠাৎ করেই নিভিয়ে দিলো বাতিটা। মুহূর্তের জন্যে নীরব হয়ে গেল অন্ধকার সুড়ঙ্গ। তারপর শুরু হলো বিড়বিড়ানি। আবার পায়চারি শুরু করেছে মারটিন।

অনেক প্রশ্ন ভিড় করছে মুসার মনে। নকল ফিগারো আসলে কে? এই রহস্যে কোথায় ফিট করছে সে? কিশোর কি তখন…

'মুসা?' কানের কাছে মুখ ঠেকিয়ে বললো কিশোর। 'কে জানি আসছে!'

ভাবনায় ডুবে না থাকলে কিশোরের আগেই শব্দটা কানে আসতো মুসার।

শুনতে পেলো এখন। খানিক পরেই দেখলো নেচে নেচে এগিয়ে আসছে আলো।

'কার্ল?' মারটিন জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ,' জবাব এলো আলোর পেছন থেকে। 'দু'জন আসছে গুহায় ঢুকতে। চলো, ভাগি।'

লণ্ঠন জ্বাললো মারটিন।

স্তূপের আড়ালে গুটিশুটি হয়ে বসে রইলো ছেলেরা। পারলে পাথরের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায়। মাত্র দশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে লোক দু'জন।

'গুহায় ঢুকবে কি ক'রে বুঝলে?' মারটিন বললো।

'ঢুকবে। দু'দিন ধরে গুহাটার কাছে বড় বেশি ঘোরাঘুরি করছে লোকে।'

'আর দু'চার দিন সময় পেলেই হতো। কাজ শেষ করে ফেলতে পারতাম। খুব হুঁশিয়ার থাকতে হবে। তীরে এসে তরী ডোবাতে চাই না। চলো, বেরিয়ে যাই।'

'হ্যাঁ, চলো।'

বোঝা গেল, কার্ল বেইরিই চূড়ায় বসে পাহারা দিচ্ছেলো। ঘন্টা বাজিয়ে সঙ্কেত দিয়ে কোনো গোপন পথে দ্রুত নেমে চলে এসেছে।

সুড়ঙ্গমুখ থেকে পাথর সরিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল দু'জনে, ভেতর থেকে আবার টেনে জায়গামতো লাগিয়ে দিলো পাথরটা। এরপর শুধু স্তব্ধ নীরবতা, আর গাঢ় অন্ধকার।

'গেল কোন দিক দিয়ে?' মুসার প্রশ্ন।

'নিশ্চয় গুহা থেকে কোনো পথ পর্বতের বাইরে বেরিয়েছে। থাকতেই হবে। নইলে বাতাস ঢুকে শব্দ করতে পারতো না। হয়তো পুরনো কোনো শ্যাফট, বন্ধ করে দেয়া হয়েছিলো, নতুন করে খোলা হয়েছে। ওই দুই প্রসপেক্টরের কাজ।'

'তাহলে মিস্টার হারভে আর শেরিফ জানেন না কেন? কেন বুঝতে পারলেন না?'

'তাঁরা যখন ঢোকেন, হয়তো বন্ধ থাকে। পর্বতের চূড়া থেকে নামারও কোনো গোপন পথ আছে, ভেতর দিয়ে। গোপন পথ আরও কতো আছে কে জানে! যাকগে। আমাদের যাওয়ার সময় হলো।'

'চলো।'

টর্চের আলোয় পথ দেখে সেই বড় গুহাটায় ফিরে এলো দু'জনে। আগের রাতে প্রথম যেটাতে ঢুকেছিলো।

সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে। পাশের ছায়া থেকে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো কে যেন। কঠিন থাবায় চেপে ধরলো মুসার হাত। 'ধরেছি!' কর্কশ কণ্ঠস্বর।

ঝট করে মুসার হাতের টর্চ উঠে গেল ওপর দিকে, লোকটার মুখে ফেলেই

চমকে গেল। গালে কাটা দাগ, চোখে পট্টি। চেঁচিয়ে উঠলো, 'কিশোর, পালাও!'
জ্বলে উঠলো আরেকটা টর্চ। আরেকজনের হাতে।

ষোল

'চুপ! একেবারে চুপ!' কড়া গলায় আদেশ দিলো পট্টিওয়ালা। 'নড়লেই মরবে।'
'কিছু করার সাহস হবে না আপনার,' মরিয়া হয়ে বললো কিশোর। 'ভালো চাইলে ছেড়ে দিন। আশপাশে আমাদের লোক আছে।'
হেসে উঠলো পট্টি। 'ধাপ্পা দিতে চাইছো? ভালো। তা এসো না, বসে দুটো কথা বলি।'
'কিচ্ছু বলবে না, কিশোর!' চেঁচিয়ে বললো মুসা।
দ্বিতীয়জন কথা বলে উঠলো। পরিচিত কণ্ঠ। 'অসুবিধে নেই। বলতে পারো। মিস্টার হারলিং একজন ডিটেকটিভ। চমকে দিয়ে একটু মজা করলেন তোমাদের সঙ্গে।'
রবিন! দুই বন্ধুকে অবাক করে দিয়ে হাসিমুখে আলোর সামনে এসে দাঁড়ালো। বই পড়ার পরে কিভাবে সাহায্যের জন্যে ছুটেছে, জানালো সে। শেষে বললো, 'গাড়িটা চলে যেতেই ছুটলাম আবার। গিয়ে পড়লাম মিস্টার হারলিঙের হাতে।'
'ড্যাম হারলিং,' নাম জানালেন ডিটেকটিভ। 'একটা বীমা কোম্পানির হয়ে কাজ করছি। রবিন বললো তোমাদের কথা। সোজা চলে এলাম এখানে। সাহায্য আনার জন্যে র‍্যাঞ্চে গিয়ে আর সময় নষ্ট করতে চাইলাম না।'
'মিস্টার হারলিংও ভেবেছেন, তোমরা বিপদে পড়বে,' রবিন বললো।
'হ্যাঁ। যাদের পিছু নিয়েছো, ওরা ডেঞ্জারাস লোক।'
'তাহলে আপনি মিস্টার হারলিং, গোয়েন্দা,' অবশেষে মুখ খুললো কিশোর। সংক্ষেপে জানালো গুহায় কি কি দেখেছে, কিছু কিছু কথা বাদ দিয়ে।
মাথা ঝাঁকালেন হারলিং। 'বললাম না, আমাদের দেখে ফেলেছে। দেখুক। বেশি দূর যেতে পারবে না। আর ওই ব্যাগের মধ্যে হীরাই রেখেছে, যেগুলোর পেছনে লেগেছি আমি।'
'কিসের হীরা?' মুসা জিজ্ঞেস করলো।
'ওগুলো খুঁজে বের করতেই এসেছি আমি,' বুঝিয়ে বললেন হারলিং। 'ধুরন্ধর এক রত্নচোরের পেছনে লেগেছি আমি। অনেকগুলো হীরা চুরি করেছে সে। ওর আসল নাম কেউ জানে না, বাড়ি কোথায়, তা-ও না। ছদ্মনাম স্যাভ সাইপ্রেস।

সারা ইউরোপের সব দেশের পুলিশ ওকে খুঁজছে। ওর পিছু নিয়ে এক হপ্তা আগে এসে পৌঁছেছি সানতা কারলায়। ওখানেই শুনলাম মোনিং ভ্যালির কথা। চট করে মনে হলো, লুকিয়ে থাকার জন্যে এতো ভালো জায়গা আর হয় না। সাইপ্রেস হয়তো এখানেই লুকিয়েছে। দেখতে চলে এলাম।'

'ওর পিছু নিয়ে এসেছেন মানে? ওকে আসতে দেখেছেন?'

'দেখবো কি? ওর আসল চেহারা দেখতে কেমন তাই তো জানি না। পাঁচ বছর আগে ইউরোপ থেকে পালিয়েছে, পুলিশের তাড়া খেয়ে। ওখানকার পুলিশের ধারণা, আমেরিকায় চলে এসেছে সাইপ্রেস। নতুন কোনো ছদ্মবেশ নিয়েছে। ছদ্মবেশ ধরতে আর অভিনয় করায় ওস্তাদ সে। সে-জন্যেই তাকে ধরা মুশকিল। বোঝাই যায় না কিছু।'

নিচের ঠোঁটে বার দুই চিমটি কাটলো কিশোর। 'নিশ্চয় আপনার কোম্পানির বীমা করা কিছু হীরা চুরি করে পালিয়েছে?'

'হ্যাঁ। বছরখানেক আগে। ইউরোপ থেকে পালিয়ে আসার পর অনেক দিন চুপ করে ছিলো, তারপর ওই প্রথম চুরিটা করলো। চার বছর ওর খোঁজ না পেয়ে পুলিশ ভেবেছিলো চুরি করা ছেড়ে দিয়েছে সাইপ্রেস, কিংবা মারা গেছে। কিন্তু হীরা চুরির আলামত দেখেই ইন্টারপোল বলে দিলো, ওটা সাইপ্রেসের কাজ। ওরা শিওর, ও ছাড়া আর কেউ নয়।'

'দা মোডাস অপার‍্যানডি, মানে, "অপারেশনের পদ্ধতি" খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার,' একমত হলো কিশোর। ওর বলার ধরন রহস্যময় মনে হলো মুসার কাছে। 'বড় বড় অপরাধীদের নিজস্ব কিছু পদ্ধতি আছে, আর সে-কারণেই ধরা পড়ে। পদ্ধতি কিছুতেই বদলাতে পারে না ওরা। বেশি অভিজ্ঞ যারা, তারা খুব সামান্য নড়চড় করতে পারে। পুরোটা পারে না।'

'ঠিকই বলেছো,' বললেন হারলিং। 'চার বছর চুপ করে ছিলো। কারণ নতুন দেশে নতুন বেশে নিজেকে মানিয়ে নিচ্ছিলো। তারপর সুযোগ বুঝে করে বসলো হাত সাফাই।'

'নতুন কি ছদ্মবেশ নিয়েছে, আন্দাজ করতে পেরেছেন?' জিজ্ঞেস করলো রবিন। 'র‍্যাঞ্চের কেউ নয় তো?'

'হতে পারে। আমি জানলাম কিভাবে জানো? দুটো হীরা বিক্রি করেছে সে। প্রথমটা করেছে নেভাডার রিনোতে, আর দ্বিতীয়টা এখানে।'

'নেভাডা!'

'আপনার গাড়িতে তো নেভাডার প্লেট লাগানো। আমাদেরকে ধাক্কা দিয়ে পাহাড়ের ওপর থেকে ফেলে দিতে চেয়েছিলেন,' বললো মুসা।

'না, আমি না। নেভাডার প্লেট লাগানো অন্য কেউ হবে। সানতা কারলা

থেকে মোনিং ভ্যালিতে যাচ্ছিলাম, দেখি পথের ওপর সাইকেল পড়ে রয়েছে। সন্দেহ হলো। তাই নেমে এসে দেখছিলাম। তারপর দেখলাম, আরও লোকজন আসছে। ভাবলাম, ওরা তোমাদের তুলে নিতে পারবে। আমার পরিচয় তখন তোমাদের কাছে ফাঁস করতে চাইনি। তুলে আনলেই তো জিজ্ঞেস করতে, আমি কে? অনেক কষ্টে সাইপ্রেসের চিহ্ন খুঁজে পেয়েছি, সামান্য কারণে সেটা ভণ্ডুল করতে চাইনি। বুঝতেই পারছো, সাইপ্রেসের মতো একজন চালাক লোক নিশ্চয় টের পেয়ে গেছে তার পেছনে চর লেগেছে। হয়তো নেভাডাতে আমাকে দেখেও ফেলেছে সে। তাই আমিও ছদ্মবেশ নিলাম। চোখের ওপর কালো পট্টি লাগালাম, গালে কাটা দাগ বানালাম। তারপর এসেছি সানতা কারলায়। এতো কিছু করেও তাকে ধোঁকা দিতে পেরেছি কিনা কে জানে? বুঝে গিয়ে মনে মনে হয়তো হাসছে সাইপ্রেস।'

'এ-জন্যেই লুকোচুরি খেলছেন? মানে, এরকম একটা…?'

'হ্যাঁ।' রবিন কি বলতে চাইছে বুঝতে পারলেন হারলিং। 'সাইপ্রেসের নজর এড়িয়ে থাকতে চাইছি।'

ওদের কথায় তেমন মন নেই, অন্ধকার গুহার দিকে তাকিয়ে নিচের ঠোঁটে চিমটি কেটে চলেছে গোয়েন্দাপ্রধান। হঠাৎ ঝিক করে উঠলো তার চোখের তারা, কেউ দেখতে পেলো না। ফিরলো। 'হীরাগুলো স্পেশাল কিছু, তাই না, মিস্টার হারলিং?'

অবাক হলেন হারলিং। কি বোঝাতে চাইছে ছেলেটা? বললেন, 'অ্যাঁ! হ্যাঁ। কোনো জুয়েলারি কোম্পানি কিংবা দোকান থেকে চুরি হয়নি। হয়েছে স্যান ফ্রান্সিসকোর একটা মিউজিয়ম থেকে। আর ওগুলো…'

'…রাফ ডায়মণ্ডস!' বাক্যটা শেষ করে দিলো কিশোর। 'আকাটা হীরা। খনি থেকে যে অবস্থায় তোলা হয়েছিলো সেভাবেই রেখে দিয়েছিলো। ঠিক? আর ওগুলো ছিলো ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডায়মণ্ড।'

'তুমি জানলে কিভাবে? সবগুলোই রাফ, তবে সব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল নয়। মিউজিয়মে ডায়মণ্ড শো চলছিলো। দুনিয়ার অনেক দেশ থেকে হীরা এনে রাখা হয়েছিলো মানুষকে দেখানোর জন্যে। কেন জানি না, বোধহয় রাফ ডায়মণ্ড বলেই, আর দেখতে সাধারণ পাথরের মতো বলেই বোধহয় বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি কর্তৃপক্ষ। সাইপ্রেসের চুরি করতে কোনো অসুবিধেই হয়নি, কারণ, পাহারা তেমন কড়াকড়ি ছিলো না। কিন্তু তুমি এতো কথা জানলে কি করে?'

'ওরকম একটা পাথর এখানকার গুহায় পেয়েছি আমি। বাকিগুলো খুঁজে বের করছে মারটিন আর বেইরি। সব বোধহয় পায়নি এখনও। ওদের ব্যাগ থেকেই হয়তো কোনোভাবে শ্যাফটের মুখে পড়ে গিয়েছিলো পাথরটা।'

'তাহলে সত্যি সত্যি গুহায় আছে পাথরগুলো!'

আনমনে মাথা দোলালো কিশোর। 'আমার বিশ্বাস, চুরি করার পরই এনে এখানে পাথরগুলো লুকিয়েছে আপনার সাইপ্রেস। অপেক্ষা করেছে পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হওয়ার জন্যে। তার প্ল্যানমতোই হতো সব, মাঝখান থেকে মারটিন আর বেইরি বাগড়া না দিলে। বহু বছর ধরে এখানে সোনা আর হীরা খুঁজছে ওরা, সাইপ্রেসের পাথরগুলো পেয়ে ভেবেছে বুঝি খনিই পাওয়া গেছে।'

'কিন্তু এই এলাকায় কোনো হীরার খনি নেই!'

'নেই। কিন্তু ওদের দুজনকে বোঝায় কে? তাদের বিশ্বাস, আছে। পাথরগুলো পেয়ে সেই বিশ্বাস আরও জোরালো হলো।'

'তা ঠিক। কিন্তু একই জায়গায় পাথর জড়ো হয়ে পড়ে থাকতে দেখে ওদের সন্দেহ হয়নি? খনিতে ওভাবে পাথর থাকে না।'

'পেলে, হতো। তবে মনে হয় না এক জায়গায় পেয়েছে। ভালো করেই জানেন, স্যান অ্যানড্রিয়াস ফল্টের ওপর রয়েছে এই জায়গা। ফলে ওপরের মাটি খালি সরে যায়, আর ভূমিকম্প হয়। গত কয়েক বছরে বড় ভূমিকম্প অবশ্য হয়নি এখানে, তবে ছোট ছোট প্রায়ই হয়। গুহার ভেতরে ঢুকলেই তার প্রমাণ মেলে। যেখানে সেখানে পাথরের ধস।'

'তাতে কি?' জানতে চাইলো মুসা।

'তাতে? আমার মনে হয়, মাসখানেক আগে ছোট একটা ভূমিকম্প পাথরগুলোর অবস্থান নড়িয়ে দিয়েছিলো। ঝাঁকুনিতে ছড়িয়ে গিয়েছিলো। ফলে এক জায়গায় পায়নি মারটিন। ভেবেছে, খনিই আবিষ্কার করে বসেছে।'

'খাইছে! ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি ছড়ায়, তা কি সম্ভব?'

'সম্ভব,' জবাব দিলেন হারলিং। 'হয় এরকম। আলগা মাটি সরে সরে যায় তো। আমি আরেকটা কথা ভাবছি এখন। হয়তো সাইপ্রেসকে খামোকা দোষ দিচ্ছি। পাথরগুলো হয়তো ও চুরি করেনি, করেছে মারটিন আর বেইরি। এখানে এনে লুকিয়েছিলো, এখন তুলে নিচ্ছে।'

'কিন্তু, মিস্টার হারলিং,' রবিন ধরলো কথাটা। 'ওরা দু'জনে এখানে অনেক বছর ধরে আছে। সবাই চেনে। পাঁচ বছর নয়, আরও অনেক আগে এসেছে ওরা।'

হাসলেন হারলিং। 'আগেই বলেছি, সব রকম-ছদ্মবেশ ধরায় ওস্তাদ সাইপ্রেস। হতে পারে, ওদেরই একজন সে। দুই বুড়োর কোনো একজনকে সরিয়ে দিয়ে নিজে সেই ছদ্মবেশ ধরে এখানে আরামসে লুকিয়ে রয়েছে পাঁচ বছর ধরে।'

'হ্যাঁ, এটা হতে পারে!'

'বোঝার উপায় এখন একটাই। গুহায় ঢুকে খুঁজে বের করতে হবে ওদেরকে। এক কাজ করো। একজন র‍্যাঞ্চে চলে যাও। শেরিফকে গিয়ে নিয়ে এসো।

ইতিমধ্যে আমরা গুহায় ঢুকে মারটিন আর বেইরিকে আটকানোর চেষ্টা করি।'

'মুসা, তুমি যাও,' কিশোর বললো।

ক্ষুব্ধ হলো মুসা। 'এতো কষ্ট করলাম। এখন নাটকের শেষ দৃশ্যে এসে আমাকে তাড়াতে চাইছো?'

'তুমিই যাও, মুসা,' হারলিং বললেন। 'রবিনের পা ভালো না। তাড়াতাড়ি করতে পারবে না। আর কিশোরকে আমার দরকার। টীম ওয়ার্ক করছো তোমরা। যে যেটা ভালো পারবে সেটাই তো করা উচিত।'

আর প্রতিবাদ করলো না মুসা। তবে খুশিও হ ে পারলো না। নীরবে সরে গেল সেখান থেকে।

মারটিন যে গুহাটা খুঁড়ছিলো, ওটার শ্যাফটের মুখের কাছে এসে দাঁড়ালো রবিন, কিশোর আর হারলিং। পাথরটা সরিয়ে ভেতরে আগে ঢুকলেন ডিটেকটিভ।

ছোট গুহাটা শূন্য। ওপাশের দেয়ালে দেখা গেল সুড়ঙ্গমুখ, বোঝা গেল, ওটা দিয়েই পালিয়েছে মারটিন আর বেইরি। মানুষের তৈরি আরেকটা মাইন শ্যাফট, ঢালু হয়ে উঠে গেছে ওপর দিকে। পিস্তল বের করে নিয়ে আগে আগে চললেন হারলিং। পেছনে চক দিয়ে দেয়ালের গায়ে আশ্চর্যবোধক চিহ্ন আঁকতে আঁকতে চললো কিশোর।

'মনে হচ্ছে উত্তরের শৈলশিরার দিকে চলেছি আমরা,' রবিন বললো। 'বইয়ে লেখা আছে, ওদিকেই ছাউনি বানিয়ে থাকে মারটিন আর বেইরি।'

'হবে হয়তো,' বললো কিশোর। 'ছাউনির মেঝে থেকেই হয়তো কোনো সুড়ঙ্গ খুঁড়ে নিয়েছে, কিংবা খোঁড়া ছিলো, সেটা দিয়েই ঢোকে খনিতে। ফলে তাদেরকে ঢুকতে-বেরোতে দেখে না কেউ।'

থেমে গেলেন হারলিং। সামনে পথ বন্ধ। পাথরের স্তূপের গোড়ায় অসংখ্য পায়ের ছাপ। নিচু হয়ে বড় একটা পাথর ছুঁয়ে দেখলেন তিনি। জোরে ঠেলা দিতেই নড়ে উঠলো পাথরটা। সরাতেই বেরিয়ে পড়লো ফোকর। আর দুটো পাথর সরাতে ঢোকার জায়গা হয়ে গেল।

হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গেলেন ডিটেকটিভ। তাঁর পা দুটো অদৃশ্য হয়ে গেলে বসে পড়ে ওপাশে উঁকি দিলো দুই গোয়েন্দা। ওরাও ঢুকে পড়লো ভেতরে। বেরিয়ে এলো বাইরে। খোলা আকাশের নিচে। চারপাশে ঘন ঝোপঝাড়, গাছপালা। রবিনের অনুমান ঠিকই। ডেভিল মাউনটেইনের উত্তরের শৈলশিরাই এটা।

'ঝোপের ভেতরে এই ছোট্ট মুখ কারো নজরে পড়বে না,' হারলিং বললেন। 'এসো, যাই। আমার পেছনে থাকবে তোমরা।'

এক পাশে সাগর, আরেক পাশে উপত্যকা। মাঝখানে এই শৈলশিরা। ওটার ওপর দিয়ে সাবধানে এগোলো তিনজনে। খানিক পরেই ছোট একটা কুঁড়ে চোখে পড়লো, আলো আসছে ভেতর থেকে। পা টিপে টিপে জানালার কাছে এসে উঁকি দিলেন ডিটেকটিভ। রবিন আর কিশোরও মাথা তুললো।

পুরনো একটা টেবিলের দু'পাশে বসে রয়েছে মারটিন আর বেইরি। টেবিলের ওপর পাথরের ছোট একটা স্তূপ।

সতেরো

পিস্তল হাতে ভেতরে ঢুকে পড়লেন হারলিং। 'খবরদার, নড়বে না কেউ!'

প্রায় অর্ধেক উঠে পড়েছিলো বেইরি, ধীরে ধীরে বসে পড়লো আবার চেয়ারে। জ্বলন্ত চোখে তাকালো হারলিঙের দিকে।

ছেলেদের দিকে চেয়ে মারটিন বললো, 'কার্ল, তোমাকে আগেই বলেছিলাম, বিচ্ছুগুলোর ব্যাপারে সাবধান হওয়া দরকার, শোনোনি···'

'ভুলই করেছি,' বিড়বিড় করলো বেইরি।

'কি চাই?' ডিটেকটিভের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলো মারটিন। 'পাথরগুলো? এগুলো আমাদের। খনিটা আমরা আবিষ্কার করেছি···'

'কে করতে বলেছে তোমাদের? অন্যের জায়গায় রাতে চুরি করে যে মাটি খোঁড়ো, সেটাই তো একটা অন্যায়। তার ওপর পাথর রাখতে চাইছো। কতোখানি বেআইনী কাজ করেছো, বুঝতে পারছো সেটা?'

'না, বুঝি না,' গোঁয়ারের মতো বললো মারটিন। 'বুঝি না, বোঝার চেষ্টাও করি না। বিশ বছর ধরে ওই পাহাড়ের তলায় খুঁড়েছি আমরা, মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছি, তার কোনো দাম নেই?'

'থাকতো, যদি সত্যি সত্যি খনি পেতেন আপনারা,' রবিন বললো। 'আর খনি থেকে পাথর তুলে আনতেন। তাহলে মিস্টার হারভে নিশ্চয় একটা ভাগ দিতেন আপনাদেরকে।'

'খনি পাইনি তো কি পেয়েছি? পাথরগুলো এলো কোত্থেকে তাহলে?'

'খনি যে নয়, খুব ভালো করেই জানেন আপনারা, মিস্টার মারটিন,' এই প্রথম কথা বললো কিশোর। এতোক্ষণ ঘরের জিনিসপত্র দেখেছে। একটা ছোট রেডিও, বুককেসে কয়েকটা বই, এক কোণে কয়েকটা পুরনো খবরের কাগজ। একটা কাগজ এখন তার হাতে।

ঝট করে কিশোরের দিকে ফিরলো চারজোড়া চোখ।

'কি বলছো তুমি, কিশোর?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো রবিন। 'কি করে বুঝলে?'

'ওখানে গোটা চারেক বই আছে,' বুককেসটা দেখিয়ে বললো কিশোর। 'নতুন কেনা হয়েছে, হীরার খনির ওপর লেখা। আর এই পত্রিকাটায়,' হাতের কাগজটা নাড়লো, 'স্যান ফ্রানসিসকো মিউজিয়মে হীরা ডাকাতির কথা লেখা আছে। এক বছরের পুরনো এটা। খবরটায় দাগ দিয়ে রেখেছে পেন্সিল দিয়ে।'

মারটিন আর বেইরির দিকে চেয়ে ভুরু নাচালেন হারলিং। 'কী, কিছু বলবে?'

'কি আর বলবো?' দীর্ঘশ্বাস ফেললো মারটিন। 'ঠিকই বলেছে ছেলেটা। জানি, ওটা হীরার খনি নয়। এ-অঞ্চলে কোথাও নেই ওরকম খনি।'

'দুটো পাথর পেয়েছিলাম,' বেইরি জানালো। 'ভাবলাম বুঝি খনিই পেয়েছি। হীরার খনি সম্পর্কে ভালোমতো জানার জন্যে বইগুলো কিনে এনেছে ডিন। বই পড়ে বুঝলাম, পাথরগুলো আফ্রিকান। তখন লাইব্রেরিতে গিয়ে খুঁজে বের করলাম পত্রিকাটা; কোথায় কবে ডাকাতি হয়েছে জানলাম। বুঝে ফেললাম, ডাকাতি করে এনে পাথরগুলো এখানে রেখে যাওয়া হয়েছে।'

বেইরি থামতেই মারটিন বললো, 'যেহেতু চুরির মাল, ভাবলাম, পেয়েছি যখন আমরাই রেখে দেবো। চোরটা বাদে আর কেউ জানছে না এ-খবর। দুটো পাওয়ার পর আরও খুঁড়তে লাগলাম। তারপর আর কি? দেখতেই পাচ্ছো এখানে…'

'তবে খুঁড়তে গিয়ে একটা গণ্ডগোল হয়ে গেল,' মারটিনের কথার খেই ধরলো বেইরি। 'একটা বন্ধ সুড়ঙ্গ খুলে দিলাম, আবার গোঙাতে শুরু করলো গুহাটা। ভেবেছিলাম, ভালোই হলো, ভয়ে কাছে আসবে না কেউ। নিরাপদে কাজ করতে পারবো। কিন্তু মিস্টার হারভে আর শেরিফ দেখতে এলেন। তদন্ত শুরু করলেন। বাধ্য হয়ে ঘন্টার ব্যবস্থা করলাম। ডিন যখন খুঁড়তো, পাহাড়ের চূড়ায় বসে আমি চোখ রাখতাম। কাউকে আসতে দেখলেই ঘন্টা বাজিয়ে সতর্ক করে দিতাম ডিনকে।'

হাসলো মারটিন। 'ভালোই চলছিলো। এই ছেলেগুলোকেও ভয় দেখিয়ে একবার তাড়িয়েছি। কিন্তু আজ যে কিভাবে ঢুকে পড়লো…এই, কিভাবে ঢুকলে? কার্ল দেখলো না কেন?'

জানালো কিশোর।

শুনে মুখ কালো করে ফেললো বেইরি। কিন্তু মারটিন হাসলো। 'চালাক ছেলে!'

গম্ভীর হয়ে হারলিং বললেন, 'এতে হাসির কিছু নেই। চোরাই মাল চুরি করাও সমান অপরাধ।'

'চুরি করেছি কে বললো? খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেছি।'

'অ্যাক্সিডেন্টগুলো করালেন কেন?' গরম হয়ে বললো রবিন। 'পাথর ফেলে

আমাদেরকেও তো মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন।'

'দেখো, প্রায় সবগুলোই অ্যাক্সিডেন্ট ছিলো ওগুলো, ইচ্ছে করে ঘটানো হয়নি,' বললো বেইরি। 'ওরকম পাথর ধসে পড়ে এখানে যখন-তখন। তাছাড়া গোঙানি শুনে নার্ভাস হয়ে যায় লোকে, অসাবধান হয়ে নিজেরাই দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসে। তবে, তোমাদের ওপর যেটা পড়তে যাচ্ছিলো, সেটা আমার দোষ। পাথরটা আলগা হয়ে ছিলো। তোমাদের ওপর চোখ রাখতে রাখতে এগোচ্ছিলাম। হোঁচট খেয়ে পড়লাম ওটার ওপর। ঠেলা লেগে গড়িয়ে পড়লো পাথরটা। বিশ্বাস করো, ইচ্ছে করে ফেলিনি।'

কঠিন হলো হারলিঙের চোখ। 'গাধার মতো কাজ করেছো তোমরা!' বলে, পাথরগুলো নিয়ে আবার চামড়ার ব্যাগে ভরতে শুরু করলেন। চেয়ে রয়েছে দুই বুড়ো। চোখের সামনে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে এতোগুলো দামী পাথর, কিন্তু কিছুই বললো না। হারলিং বলছেন, 'আসল চোরটাকে ধরতে যেতে হবে এখন...'

'মিস্টার হারলিং,' বাধা দিয়ে বললো কিশোর, 'চোরটার কথা ভেবেছি আমি। সে জানে, মিস্টার মারটিন আর বেইরি খুঁড়ে বের করছে পাথরগুলো। ওগুলো নেয়ার জন্যে ফিরে আসবে...'

পেছন থেকে কথা বলে উঠলো একটা চাপা, ভোঁতা কণ্ঠ, 'ঠিকই বলেছো তুমি। আমি এসেছি।'

চমকে ফিরে তাকালো সবাই। দোড়গোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে নকল ফিগারো। মুখে মুখোশ। হাতে পুরনো আমলের পিস্তল।

'নড়ো না কেউ,' ঘরের সবাইকে সাবধান করলেন হারলিং। 'সাইপ্রেস ভয়ানক পাজী লোক।' টেবিলে রাখা তাঁর পিস্তলটার দিকে আড়চোখে তাকালেন।

পিস্তল নাচালো নকল ফিগারো। 'না না, হারলিং, বোকামি করো না। পিস্তলের আশা ছাড়ো। যাও, দেয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়াও সবাই।'

আদেশ পালিত হলো।

'এই যে, তুমি,' রবিনকে বললো নকল ফিগারো। 'ঘরের কোণে দড়ি আছে, দেখো। এনে হারলিংকে বাঁধো শক্ত করে। জলদি!'

রবিনকে দ্বিধা করতে দেখে হারলিং বললেন, 'যা বলছে করো।'

দড়ি এনে হারলিঙের হাত-পা বাঁধলো রবিন। তাকে সরে যাওয়ার ইশারা করে নিজে এসে বাঁধন পরীক্ষা করে দেখলো সাইপ্রেস। সন্তুষ্ট হয়ে পিছিয়ে গেল দুই পা।

'এখন দু'জনে মিলে দুই বুড়োকে বাঁধো।'

মারটিন আর বেইরিকে বাঁধলো দুই গোয়েন্দা। তারপর সাইপ্রেসের আদেশে কিশোরকে বাঁধলো রবিন। রবিনকে বাঁধলো সাইপ্রেস নিজে। বাঁধা শেষ করে

গিয়ে পাথরগুলো তুলে ব্যাগে ভরলো। খসখসে কণ্ঠে বললো, 'তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ। পাথরগুলো রেডি করে রেখেছো আমার জন্যে। ভূমিকম্পে ছড়িয়ে গিয়েছিলো। খুঁড়ে বের করা অনেক কষ্ট। কড়া নজর রেখেছিলাম অবশ্যই। এতো কষ্ট করে চুরি করে এনে হারাতে চায় কেউ?' খিকখিক করে হাসলো চোরটা। 'তবে তোমরা তিন বিচ্ছু বড় জ্বালান জ্বালিয়েছো। স্কুবা ইক্যুইপমেন্টগুলো আনতে দেখেই বুঝেছি, কি করতে যাচ্ছো। তার ওপর পিছে লেগে ছিলো হারলিং। ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। পাথরগুলো না হারাই! চলি। গুড বাই।' বেরিয়ে গেল সে।

গুঙিয়ে উঠলো কিশোর। 'আমি একটা গাধা! আমাদেরকে ধরে যখন সুড়ঙ্গে আটকালো, তখনই বোঝা উচিত ছিলো আমার, খুঁড়ে পাথর বের করার ব্যাপারটা সে জানে। আমাদের যেখান থেকে ধরে এনেছে, স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিলো খোঁড়ার শব্দ। হুঁশিয়ার হওয়া উচিত ছিলো আমার। কেন ভাবলাম না, ব্যাটা আমাদের ওপর চোখ রেখেছে?'

'দুঃখ করো না,' সান্ত্বনা দিলেন হারলিং। 'চমৎকার ভাবে এই রহস্যের সমাধান করেছো। গাধা তো আসলে আমি। কেন বুঝলাম না, মারটিন আর বেইরিকে ব্যবহার করছে সাইপ্রেস?'

'হুঁ,' দীর্ঘশ্বাস ফেললো রবিন। 'কিশোরের অনুমানই ঠিক। চোরটা সত্যি ফিরে এলো।'

কিশোর সন্তুষ্ট হতে পারছে না। 'ভিলেনের চেহারাই যদি দেখা না গেল, রহস্যের এমন কিনারা করে লাভটা কি? পালিয়ে গেল। দেখতে কেমন কোনোদিনই হয়তো জানবো না। মিস্টার হারলিংকেও আবার নতুন করে...' মরা মাছের মতো হাঁ হয়ে গেল হঠাৎ তার মুখ।

'কিশোর?' ডাকলো রবিন।

'কিশোর,' হারলিং জিজ্ঞেস করলেন। 'কি হয়েছে?'

চোখ মিটমিট করলো কিশোর। বহুদূর থেকে ফিরে এলো যেন। 'বাঁধন খুলতে হবে! ছাড়া পেতে হবে আমাদের!' চেঁচিয়ে বললো সে। 'জলদি! নইলে ব্যাটাকে ধরতে পারবো না!'

বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন হারলিং। 'বৃথা চেষ্টা, কিশোর। লাভ হবে না। ও এতোক্ষণে অনেক দূরে চলে গেছে।'

'মনে হয় না...'

বাইরে ঘোড়ার খুরের শব্দ হলো। খানিক পরেই ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। বিশালদেহী একজন লোক ঘরে ঢুকলেন, দুই গোয়েন্দা আগে দেখেনি তাঁকে। ভুরু কুঁচকে তাকালেন পাঁচ বন্দির দিকে। 'কি ব্যাপার?' গমগম করে উঠলো ভারি কণ্ঠস্বর।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো দুই গোয়েন্দা। দুটো পরিচিত চেহারা চোখে পড়লো তাদের। মুসা, আর মিসেস হারভে।

আঠারো

বিশালদেহী মানুষটা সানতা কারলা কাউন্টির শেরিফ। মারাত্মক ঝুঁকি নিয়েছে বলে তিন গোয়েন্দার ওপর রেগে গেলেন। 'এমন একটা ভয়ানক চোরের পেছনে লাগতে কে বলেছে তোমাদেরকে।'

'ওই গুহায় আটকে যদি মেরে ফেলতো!' বললেন মিসেস হারভে। 'ভাগ্যিস, দেয়ালে চিহ্নগুলো দেখতে পেয়েছিলো মুসা। নইলে তো জানাই যেতো না তোমাদেরকে কোথায় বেঁধে রেখেছে।'

চুপ করে রইলো রবিন।

'সরি, স্যার,' শেরিফের দিকে চেয়ে বললো কিশোর। 'আগে আপনাকে জানানোর সুযোগই পাইনি। তাছাড়া মিস্টার হারলিঙের দেখা পেয়ে গেলাম। তিনি অভিজ্ঞ গোয়েন্দা। এলাম সঙ্গে সঙ্গে। চোরটা যে ওভাবে আমাদেরকে চমকে দেবে, ভাবতেই পারিনি।'

'ঠিকই বলেছে ও, শেরিফ,' হারলিং বললেন। 'গুহায় যে ডেঞ্জারাস এক ক্রিমিন্যালও ঢুকতো, জানতো না ওরা। ওরা ঢুকেছিলো নিছক কৌতূহলের বশে, কিসে গোঙায় জানার জন্যে। সেকথা মিস্টার হারভেও জানেন।'

যুতসই কোনো জবাব খুঁজে না পেয়ে আরও রেগে গেলেন শেরিফ। হারলিঙের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে শুধু ঘোঁৎঘোঁৎ করলেন।

'আপনি যা-ই বলুন, শেরিফ,' আবার বললেন হারলিং। 'কাজ দেখিয়েছে বটে ছেলেগুলো। বড়রা যা পারেনি, ওরকম একটা রহস্যের সমাধান করে দিয়েছে।'

হাসলেন মিসেস হারভে। 'বড় হলে অনেক বড় গোয়েন্দা হবে ওরা।'

'তা হবে,' এই প্রথম শেরিফের মুখে হাসি ফুটলো। 'আমরা যা পারিনি…কিন্তু চোরটা যে পালালো! তাকে ধরি কিভাবে?'

'আমার মনে হয় না পালিয়েছে,' বোমা ফাটালো যেন কিশোর। একসঙ্গে তার দিকে ঘুরে গেল সবগুলো চোখ। 'চেষ্টা করলে এখনও ধরা যায়।'

'যায়?'

'অন্য সবাই কোথায়, স্যার?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'অন্য সবাই? র‍্যাঞ্চের লোকদের কথা বলছো তো? তোমাদের খুঁজতে বেরিয়েছে,' জবাব দিলেন শেরিফ। 'কয়েকজনকে নিয়ে হারভে গেছে সৈকতে।

আরও কয়েকজনকে নিয়ে কোহেন আর প্রফেসর গেছেন ডেভিল মাউনটেইনের ওপাশে।'

'ওদের সঙ্গে কোথায় আপনার দেখা হবে?'

'কেন? র‍্যাঞ্চে।'

'জলদি চলুন তাহলে।'

ভ্রূকুটি করলেন শেরিফ। 'যা বলার বলে ফেলো না এখানেই।'

মাথা নাড়লো কিশোর। 'একদম সময় নেই, স্যার। বলতে অনেক সময় লাগবে। জলদি চলুন, চোরটাকে ধরতে চাইলে।'

'ওর কথা শুনুন, শেরিফ,' হারলিং বললেন। 'ওর ওপর ভক্তি এসে গেছে আমার। সত্যি ধরে ফেলবে চোরটাকে। চলুন চলুন।'

'বেশ,' দরজার দিকে এগোলেন শেরিফ।

শেরিফের দু'জন ডেপুটি পাহারায় রয়েছে পাহাড়ের গোড়ায়। তাদের দুটো ঘোড়ায় উঠলো রবিন আর মুসা। আর শেরিফের সঙ্গে কিশোর। রুক্ষ তরাই অঞ্চল, এবড়োখেবড়ো। ঝাঁকুনির চোটে ঘোড়ার পিঠে বসে থাকাই দায়।

র‍্যাঞ্চের কাছে চলে এলো ওরা। কাউকে চোখে পড়লো না।

'এবার বলো,' শেরিফ বললেন। 'কাকে ধরতে হবে?'

ঠোঁট কামড়ালো কিশোর। 'আসবে, স্যার, শিওর আসবে। এলেই ধরতে হবে। আমাদেরকে খোঁজার ভান করে না পেয়ে ফিরে আসবে। ওত পেতে থাকবো আমরা। এলেই ধরবো।'

ঘোড়া থেকে নামলেন শেরিফ। কিশোরকে নামতে সাহায্য করলেন। 'এবার খুলে বলো সব।'

'স্যার,' কিশোর বললো। 'কেবিনে কিছু বেফাঁস কথা বলে ফেলেছে চোরটা...'

র‍্যাঞ্চ হাউসের পাশ থেকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে এলেন প্রফেসর হারকসন। 'এই যে, শেরিফ, খুঁজে পেয়েছেন তাহলে। ভেরি গুড। তোমরা ছেলেরা খুব একচোট দেখিয়েছো। ভুগিয়ে ছেড়েছো।' নার্ভাস ভঙ্গিতে হাসলেন তিনি। 'যা চোখা পাথর। দেখতে পাইনি, কি করে যেন লেগে কেটে গেল। ফিরে এসে ব্যাণ্ডেজ না বেঁধে আর পারলাম না।'

'সময় মতোই এসেছেন, প্রফেসর,' শেরিফ বললেন। 'কিশোর পাশা এখন একটা গল্প শোনাবে আমাদের।'

শান্ত কণ্ঠে কিশোর বললো, 'গল্প শোনানোর আর দরকার নেই, স্যার। প্রফেসরের দেহ তল্লাশি করলেই হীরাগুলো পেয়ে যাবেন। আবার হাতছাড়া করেছে বলে মনে হয় না। ওকে যে সন্দেহ করেছি, কল্পনাও করেনি নিশ্চয়। তাই

না, মিস্টার স্যাড সাইপ্রেস?'

'সাইপ্রেস!' শেরিফ অবাক।

'ছদ্মনাম। ওর ব্যাণ্ডেজ খুলে দেখুন, হীরাগুলো পেয়ে যাবেন।'

ঘুরে দৌড় দিলো প্রফেসর হারকসন, ওরফে স্যাড সাইপ্রেস। কিন্তু পালাবে কোথায়? শেরিফ আর তার দুই সহকারীর কাছে পিস্তল রয়েছে। সহজেই ধরে ফেলা হলো চোরটাকে।

উনিশ

'ব্যাণ্ডেজের ভেতরই পাওয়া গেল তাহলে,' বললেন বিখ্যাত চিত্রপরিচালক মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফার।

'হ্যাঁ, স্যার,' কিশোর বললো। 'দৌড়ে গিয়ে গাড়িতে ওঠার চেষ্টা করেছিলো সাইপ্রেস। নেভাডার লাইসেন্স প্লেট লাগানো ওটাতে। দুটো গাড়ি ছিলো তার। নেভাডার প্লেট লাগানোটা লুকিয়ে রাখতো মোনিং ভ্যালির একটা গিরিপথে, ওদিকে যেতো না কেউ। তাই কারও চোখে পড়েনি গাড়িটা। হেনরি ফিগারোর পোশাক আর মুখোশটা রাখতো গাড়ির মধ্যে।'

'হুঁ,' বিশাল ডেস্কের ওপাশে বসে আস্তে মাথা দোলালেন পরিচালক। 'ভীষণ চালাক। ...যা-ই হোক, দুই বোকা বুড়োর কি খবর? মারটিন আর বেইরি?'

হাসলো রবিন। 'ওরা বার বার কসম খেয়ে বলেছে, হীরাগুলো ফিরিয়ে দিতো। ওদের কথা বিশ্বাস করেননি শেরিফ। র‍্যাঞ্চের লোকদের ভয় দেখিয়েছে বলে নালিশ করতে পারতেন মিস্টার হারভে। করেননি। তিনি মাফ করে দিয়েছেন দুই বুড়োকে। ফলে শেরিফও ছেড়ে দিয়েছেন তাদেরকে।'

'কিশোর,' জানতে চাইলেন পরিচালক। 'কি করে বুঝলে, হেনরি ফিগারো, প্রফেসর হারকসন আর স্যাড সাইপ্রেস একই লোক?'

সামনে ঝুঁকলো কিশোর। 'শুরু থেকেই প্রফেসরের ভাবভঙ্গি ভালো লাগেনি আমার, খটকা লেগেছে। কয়েকবার ভেবেওছি, ও-ই হয়তো নকল হেনরি ফিগারো।'

'কিন্তু শিওর হলে কি করে, ও-ই স্যাড সাইপ্রেস?'

'কেবিনে বন্দি করার পর একটা কথা বলেছিলো, তাতেই...'

দ্রুত আরেকবার রবিনের লেখা ফাইলের পাতা ওল্টালেন পরিচালক। তারপর মুখ তুললেন। 'কই, বিশেষ কিছু তো বলেনি সে?'

'কম বলেছে। তবে যা বলেছে, ধরা পড়ার জন্যে যথেষ্ট। আমাদের স্কুবা ইক্যুই মেন্টগুলো আনতে নাকি দেখেছে। কে দেখে থাকতে পারে? এমন কেউ, যে র‍্যাঞ্চে থাকে। তারপর রয়েছে তার কণ্ঠস্বর। অভিনয় করে অন্যরকম করার চেষ্টা করেছে বটে; কিন্তু গলার স্বর, কথা বলার ধরন বদলালেই বা কতোটা বদলাতে পারে একজন মানুষ? দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে ফেলতে শুরু করলাম,' থামলো কিশোর। গাল চুলকালো। 'সে আরও বললো, হারলিং পিছু লাগাতে ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলো। ওই কথা থেকে দুটো সূত্র পেলাম। এক, নকল ফিগারো জানে হারলিং কে। দুই, হারলিং যে তার খুব কাছাকাছি এসে গেছে, সেটাও জানে।'

'নিশ্চয়ই!' একমত হলেন পরিচালক। 'হারলিং তোমাদেরকে বলেছে, স্যাড সাইপ্রেস তাকে চেনে। অথচ হারলিংকে তোমরা ছাড়া র‍্যাঞ্চের আর কেউ দেখেনি। তোমরা র‍্যাঞ্চের লোকের কাছে তার চেহারার বর্ণনা দিয়েছো। শুনেই হুঁশিয়ার হয়ে গেছে সাইপ্রেস, তোমাদের কথা থেকেই বুঝে গেছে চোখে পট্টি লাগিয়ে হারলিংই ছদ্মবেশ নিয়েছে।'

'ঠিক তাই, স্যার।'

'কিন্তু, তোমাদের কথা তো র‍্যাঞ্চের আরও লোকে শুনেছে। তাদেরকে সন্দেহ না করে শুধু প্রফেসরের ওপর নজর গেল কেন তোমার?'

'ওর পিস্তলটা, স্যার।'

'পিস্তল?' বুঝতে পারছেন না পরিচালক। 'এমন কি বিশেষত্ব আছে ওটার…'

'ওটার কিছু নেই, স্যার,' তাড়াতাড়ি বললো কিশোর। 'ওটাকে যেভাবে ধরা হয়েছে…মানে, আমি বলতে চাইছি, নকল ফিগারো বাঁ হাতে ধরেছিলো পিস্তলটা। হোলস্টার পরেছিলো বাঁ দিকে। অথচ কোনো বইতে উল্লেখ নেই যে আসল হেনরি ফিগারো বাঁইয়া ছিলো। তার ছবিতেও হোলস্টার ডান দিকে ঝোলানো দেখেছি। গুহায় তার কঙ্কাল পেয়েছি, তখনও ডান হাতে ধরা ছিলো পিস্তলটা…'

'এহ্‌হে!' নিজের ওপরই বিরক্ত হলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'এই সহজ কথাটা একবারও ভাবলাম না! বইতে উল্লেখ নেই, ছবিতে রয়েছে হেনরি ফিগারোর ডান পাশে হোলস্টার। শুধু প্রফেসর হারকসনের বক্তব্য, ফিগারো ছিলো বাঁইয়া। নিজের ফাঁদে নিজেই পড়েছে।'

'হ্যাঁ,' হাসলো কিশোর। 'স্যাড সাইপ্রেস কিন্তু আসলেই ইতিহাসের প্রফেসর, স্যার। ইউরোপ থেকে পালিয়ে এসে ক্যালিফোর্নিয়ায় লুকিয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়ার ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেছে, তাই বিন্দুমাত্র সন্দেহ করতে পারেনি কেউ। হেনরি ফিগারোর ওপর একটা বইও লিখতে আরম্ভ করেছিলো, তাতে বলেছে, ফিগারো ছিলো বাঁইয়া। নিজেকে ফিগারো বলে চালিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা ছিলো আগে থেকেই, তাই বাঁইয়ার ব্যাপারটা প্রতিষ্ঠিত করে ফেলতে চেয়েছিলো।'

চেয়ারে হেলান দিলেন পরিচালক। 'খুব জটিল একটা রহস্যের সমাধান করেছো এবার। অথচ সূত্র বলতে প্রায় কিছুই ছিলো না তোমাদের হাতে। শুধু বাঁইয়ার ব্যাপারটা দিয়েই···নাহ্, ইউ আর অ্যা জিনিয়াস, ইয়াং ম্যান!'

মিস্টার ক্রিস্টোফারের মতো মানুষের প্রশংসা পাওয়া যা-তা কথা নয়। গর্বে ফুলে উঠলো গোয়েন্দাদের বুক। মুসার দিকে চেয়ে ইশারা করলো কিশোর।

বাক্সটা এতোক্ষণ কোলের ওপর রেখে দিয়েছিলো মুসা। তুলে টেবিলের ওপর দিয়ে ঠেলে দিলো। 'নিন, স্যার। আপনাকে প্রেজেন্ট করলাম।'

'কী?'

'খুলেই দেখুন।'

বাক্সটা খুলে ভেতরের জিনিসটা বের করলেন পরিচালক। দীর্ঘ এক মুহূর্ত স্থির তাকিয়ে রইলেন ওটার দিকে। আনমনে বিড়বিড় করলেন, 'হেনরি ফিগারোর পিস্তল!'

'হ্যাঁ, স্যার। মিস্টার হারভে আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন, আমরা দিলাম আপনাকে,' রবিন বললো। 'আপনার ব্যক্তিগত জাদুঘরে রেখে দেবেন। আর মোনিং ভ্যালির ওপরে ছবি করলে, তাতেও ব্যবহার করতে পারবেন।'

'থ্যাংক ইউ, মাই বয়েজ! থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ!'

পিস্তলটা উল্টেপাল্টে দেখে টেবিলে রেখে দিলেন পরিচালক। সরাসরি তাকালেন কিশোরের চোখের দিকে। মিটিমিটি হাসছেন। 'আচ্ছা, ওই "বুড়ো মানুষটার" ব্যাপারে কি মনে হয় তোমার? ওটাই কি হেনরি ফিগারোকে মেরেছিলো?'

পলকে বদলে গেল কিশোরের চেহারা। দৃষ্টি চলে গেল যেন বহুদূরে। 'আপনি তো জানেন, স্যার, কিংবদন্তী শুধু শুধু তৈরি হয় না। পেছনে কোনো না কোনো কারণ থাকেই। হয়তো ওরকম কোনো কিছু একটা ছিলো গুহার ভেতরের খাঁড়িতে। হয়তো লক নেস মনস্টারের মতো কোনো দানব। ভাবছি, সময় করতে পারলে গিয়ে আরেকবার ঢুকবো গুহাটায়। দানব-রহস্যের সমাধান করার চেষ্টা করবো।'

'খাইছে!' তাড়াতাড়ি দুই হাত নাড়লো মুসা। 'গেলে তুমি যাও। আমি বাবা ওর মধ্যে নেই।'

হেসে উঠলো সবাই।

ঃশেষঃ